গল্পে গল্পে কৃষ্ণ কথা

শ্রী রামানন্দ সরস্বতী

গল্পে গল্পে কৃষ্ণ কথা
শ্রী রামানন্দ সরস্বতী

গল্পে গল্পে কৃষ্ণকথা

শ্রীরামানন্দ সরস্বতী

২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

A collection of short stories on the life of
LORD SHREE KRISHNA from different Puranas
by Shree Ramananda Saraswati.

প্রথম সংস্করণ
কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারি, ২০০৭

প্রকাশক
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১-৫৪৬৮

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীসঞ্জয় মাইতি

বর্ণ সংস্থাপন
লেজার বাইট
৭ কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

মুদ্রক
নিউ প্রিন্টার্স
কলকাতা-৭০০ ০১০

প্রাপ্তিস্থান
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

শিবানন্দ যোগাকিওর এ্যাণ্ড এডুকেশন সেন্টার
কাছারীপাড়া, মুচীপুকুরপাড়
কাটোয়া, বর্ধমান

শিবানন্দ যোগাকিওর এ্যাণ্ড এডুকেশন সেন্টার
সি-১১-৬০বি, নিউ অশোক নগর
দিল্লী-১১০ ০৯৬

উৎসর্গ
প্রয়াত বড়দা ব্রহ্মানন্দ দে'র উদ্দেশ্যে

লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

১। উমাচলের মহাযোগী
২। রোগারোগ্যে প্রাণায়াম-মুদ্রা-ধ্যান
৩। দাম্পত্যজীবনের পূর্ণতায় যোগদর্শন
৪। রোগ নিবারণে যোগদর্পণ
৫। গল্পে গল্পে সত্যের আলোকে
৬। ধ্যান, সমাধি ও যোগসাধনা
৭। নিত্যপূজা ও স্তোত্রগীতি

কথামুখ

রাসে গোপীরা বলেছিলেন—''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ।।''

—ভাগবত দশমস্কন্ধ।

অর্থাৎ তোমার কথারূপ অমৃত সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ জীবের মহাকল্যাণ স্বরূপ ও পাপনাশক। তোমার কথামৃত শ্রবণে জীবের সার্বিক মঙ্গল হয়। তাই ব্রহ্মাদি তত্বদর্শীরা তোমার কথাকে সংসারের সারসর্বস্ব বলে বর্ণনা করেছেন। ধরায় যাঁরা তোমার কথা কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। পূর্বজন্মে তাঁরা বহু দান-ধ্যান করেছিলেন বলেই তোমার কথা কীর্তনে তাঁদের রুচি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবও বলেছেন, ''পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্।'' 'গল্পে গল্পে কৃষ্ণকথা'র অধিকাংশ গল্পই মদীয় আচার্যদেব বিশ্ববন্দিত শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের শ্রীমুখে শোনা। কতিপয় গল্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধুসন্তের মুখে শুনেছি। গল্পগুলির সূত্র শুধু ভাগবত বা মহাভারতই নয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গর্গসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থেও কৃষ্ণলীলাকথা বর্ণিত আছে। ভারত বিখ্যাত মহান সন্ত শ্রীসুদর্শন সিংহ, যিনি গীতা প্রেস প্রকাশিত 'কল্যাণ' পত্রিকায় 'চক্রনামে' লিখতেন, তাঁর রচিত কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকেও সাহায্য গ্রহণ করেছি। সন্তের ঋণ চির অপরিশোধ্য। তাই ঋণ স্বীকার করে সন্তমহিমা ছোট করতে চাই না। বরং সকল সন্তের কৃপারূপ ছত্রছায়ায় থেকে নিজের অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করে, কৃতকৃতার্থ হতে চাই। কৃষ্ণকথা ছড়িয়ে আছে—নানা পুরাণে, উপপুরাণে, বেদে, সাহিত্যে—এককথায় ভারতের বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র। অনুভবী সাধুসন্তের মুখে কৃষ্ণকথা বিশেষ তাৎপর্য্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। শুনতে শুনতে মনে হয় এত রস, এত আনন্দ কৃষ্ণকথায়! উপরে উদ্ধৃত ভাগবত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে সন্তরা বলেন—''সংসারে যখন কৃষ্ণ বা ভগবানকে সামনে রেখে আমরা কথা বলি, তখন সেই কথা হয় অমৃত—তাই 'কথামৃতং'। আবার কৃষ্ণকে দূরে সরিয়ে রেখে যখন অন্য-কথা বা বিষয়-প্রসঙ্গ আলোচনা করি তখন কথা হয়—'মৃতং' অর্থাৎ মৃতের সমান। ভারতীয় হিন্দুচেতনায় কৃষ্ণের স্থান আত্মা বা প্রাণবায়ুর মত। জনৈক সন্তের ভাষায়—'Krishna is the soul and seed of the whole universe'. ভক্ত অর্জুনের ভাষায়—''পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।।''...(একাদশ অধ্যায়, গীতা) অর্থাৎ হে অমিত প্রভাব, আপনি চরাচর জগতের স্রষ্টা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতার দশম অধ্যায়ের বিংশতিতম শ্লোকে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

''অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।''

অর্থাৎ হে জিতনিদ্র অর্জুন, আমিই সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা। আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান। গীতামুখে ভগবান নিজের তাত্বিক পরিচয় ও তত্বজ্ঞান প্রদান করেছেন। নিজের লীলাজীবনের কথা কিছুই বলেননি। বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকায় কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর জীবনের দিনগুলি, সে প্রসঙ্গে তিনি নীরব থেকেছেন। ভক্তের সম্মুখে নিজের জীবনের কথা বলতে হয়তো তিনি সঙ্কোচ অনুভব করেছিলেন। পিতা যেমন পুত্রের কাছে অনেক সময় তাঁর নিজের জীবনের সবকথা বলতে পারেন না—ভক্তের সম্মুখেও তিনি অনেকটা সেই নিয়ম বা বিধিই অনুসরণ করেছেন—লীলার দৃষ্টিতে, লীলার মাধুর্য্য সম্পাদনের জন্য। তাছাড়া নিজের জীবনের কথা নিজের মুখে ততখানি মানায় না-যতখানি মানায় বা শোভা

পায় অন্যের মুখে। পিতার পিতৃত্ব, পিতা অপেক্ষা পুত্র বেশি আস্বাদন করেন। তদ্রূপ ভগবানের ভগবত্তা ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বেশী আস্বাদন করেন। পিতার পিতৃত্ব আস্বাদন করে, পিতাকে নিয়ে গল্প বলতে পুত্রের যেমন সঙ্কোচন হয় না বরং তার পিতৃত্বের মাধুর্য্য পুত্রমুখেই সমধিক প্রকাশ হয় তদ্রূপ, ভগবানের ভগবত্তার মাধুর্য্য ভক্তমুখেই মানায়। তাই নানা পুরাণে উপাখ্যানে ব্যাস-শুকদেবাদি ঋষি মুনি ভক্তগণ ভগবানের বা জগৎপিতার লীলাজীবনের কথা বলেছেন। এরূপ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হয়ে ভগবৎ লীলাকথা 'অমৃতদ্রবসংযুতম্' হয়। তত্ত্বজ্ঞান বিতরণে ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু ভগবৎ লীলাকথা পরিবেশনে ভক্ত ভগবানকেও ছাড়িয়ে যান। তাই ভক্তের মুখেই ভগবানের কথা শোভাবর্ধন করে। সন্তকবি তুলসীদাস বলেছেন—''হরি অনন্ত, হরিকথা অনন্তা।' শুধু পুরাণসাহিত্যের মধ্যেই অনন্তের লীলাকাহিনী সীমিত নয়। অনন্ত ভক্তের হৃদয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজিত হয়ে—অনন্ত করেন অন্তহীন লীলা। পুরাণগ্রন্থাদির সাধ্য কি তাঁকে ধরে রাখবে? বর্তমান গ্রন্থে গল্পের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের লীলাজীবনের যে সব কাহিনী বিবৃত হয়েছেন তাঁর অধিকাংশই আমাদের অজানা। প্রচলিত জানা কাহিনী বা ঘটনার গণ্ডী ভেঙ্গে অজানা কাহিনীর রসে কৃষ্ণপ্রেমী পাঠক-পাঠিকাদের মজিয়ে দেওয়াই গ্রন্থটির সবিশেষ উদ্দেশ্য।

তাই তত্ত্বকথা নয়, নয় জটিল রহস্যের আবরণ ভেদ করার অনর্থক প্রয়াস। মদীয় আচার্যদেব ব্রজবাসী সন্ত ও অন্যান্যদের মুখে যা শুনেছি, তাই যতটা সম্ভব সহজ, সরল ভাষায় নিজের অনুভব দিয়ে পাঠক-পাঠিকার দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দু'চারটি গল্প পাঠক-পাঠিকাদের জানা থাকলেও, সেই জানার মধ্যে পাবেন অজানার আনন্দ নতুন দৃষ্টিকোণ। গ্রন্থের বেশীর ভাগ গল্পই সাধারণের অজানা। অজানাকে জানার আনন্দও তাই বাড়তি প্রাপ্তি। তত্ত্ব-তথ্য-রহস্য গল্পের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। অন্তর্মুখী পাঠক-পাঠিকা নিজেই তা খুঁজে বের করে নেবেন। কথামুখের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে ভগবৎকথা বা কৃষ্ণকথা জীবের পক্ষে মঙ্গলময় ও অমৃতপ্রদ। আজকের কর্মমুখর যান্ত্রিক ব্যস্ততার যুগে মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। অমৃতকথা শোনার সময় কোথায় তাদের? কৃষ্ণকথা বলার ও শোনার লোক বর্তমান সংসারে দুর্লভ বললেই চলে। সংসার চালাতে গিয়ে সব হিমসিম খাচ্ছে—পুরাণ-বেদ পড়বে কখন? কখন-ই বা শুনবে কৃষ্ণকথা?

কুরুক্ষেত্রের কোলাহলমুখর সংগ্রামময় পরিবেশের মধ্যেই কৃষ্ণ বলেছিলেন গীতা—শুনেছিলেন জীবরূপী অর্জুন। আমরাও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে যখন হাটে বা বাজারে যাই, তখন সেখানে নানা গোলমাল-কলরবের মধ্যেই বস্তু বা দ্রব্য সংগ্রহ করি। হাটের গোলমাল শুনে থলে হাতে নিয়ে যদি ভাবি গোলমাল থামুক, তারপর হাটে গিয়ে দ্রব্য সংগ্রহ করবো, তারপর একসময় গোলমাল থেমে যাওয়ার পর হাটে প্রবেশ করলে দেখবো হাট শূন্য; পণ্য, পণ্যব্যবসায়ী ও গ্রাহকরা সব কেনাবেচা সেরে আপন আপন ঘরে ফিরে গেছেন। ফলে শূন্য থলে হাতে নিয়ে ফিরে আসতে হবে। ভবের হাটে বা বাজারেও তদ্রূপ চিত্তরূপ থলেতে কৃষ্ণকথারূপ দ্রব্য গোলমাল বা ব্যস্ততার মধ্যেই সংগ্রহ করতে হবে—অন্যথায় জীবন হবে শূন্য মরুময়। কৃষ্ণকথাই কথা—সংসারের বাকী কথা শুধুই ব্যথা। অন্তর্মুখী নর বা নারী যখন এই সত্য অনুভব করে তখন সে কৃষ্ণকথা বা ভগবৎকথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু পিছন ফিরে দেখে জীবনের অনেকখানি বেলা সে পেরিয়ে এসেছে। তাই বলে হতাশ হওয়ার কারণ নাই—গীতামুখে ভগবান আমাদের অভয়বাণী শুনিয়েছেন—

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' [গীতা ২য় অধ্যায়, ৪০ সংখ্যক শ্লোক]

অল্প সৎকর্ম বা ধর্মের অনুষ্ঠান জীবকে সংসারের মহাভয় হতে পরিত্রাণ করে। 'গল্পে গল্পে কৃষ্ণকথা' ভগবানের অভয়বাণীকে সার্থক করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। ভাগবতের ভাষায়—

''যস্যাং বৈ শ্রূয় মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।। [১ম স্কন্ধ, ভাগবত]

ভগবতকথা শুনলে জীবের শোক মোহ ভয় দূর হয়ে যায়। বিভিন্ন বয়সের নর-নারী গল্পের মাধ্যমে কৃষ্ণকে জানুক, বুঝুক। কৃষ্ণকথার রসে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণময় হোক সকলের জীবন।

গ্রন্থটি রচনার সময় আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী চন্দনা দে আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। নিরলস শ্রম ও উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে যোগ-সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা। ভগবানের কাছে এদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। এছাড়া নানা পরামর্শ দিয়ে, বিশেষভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে ধন্য করেছেন গিরিজা লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও তাঁর কর্মীবৃন্দ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাঠক-পাঠিকার দরবারে এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। কৃষ্ণপ্রেমী এঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন কাটোয়া কাছাড়ীপাড়ার বাসিন্দা শ্রীমতী গায়ত্রী চন্দ্র ও বলাগড় নিবাসী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শঙ্কর সাধুখাঁ। শ্রীকৃষ্ণচরণে এঁদের মঙ্গলকামনা করি। জয় রাধা গোবিন্দ!

কিমধিকমিতি—

রামানন্দ

'গল্পে গল্পে কৃষ্ণকথা' লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলাজীবনের দু'চারটি মুক্তকণা যা, পড়তে পড়তে ছোট বড় সকলের হৃদয় আশাকরি আনন্দে ভরে উঠবে। হৃদয় হবে রসসিক্ত। লীলাময়ের লীলাজীবনের অনেক অজানা কাহিনী-কুসুমে গ্রন্থটি মালার ন্যায় গ্রথিত। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'কানু ছাড়া গীত নেই।' প্রবাদটি শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র ভারতের অন্তর্জীবনের মূল সুরটি 'কানুর গীতে' মুখরিত। সে গীত বর্ষিত হয়েছে কখনও শঙ্খের নাদে, কখনওবা মুরলীর মূর্চ্ছনায়। ভক্তের ভাষায় দুটি গান গেয়েছিলেন কৃষ্ণ। একটি গান গেয়েছিলেন শঙ্খ হাতে নিয়ে। অন্যটি মুরলী অধরে রেখে। একটি গানের কথা ধরা আছে 'শ্রীমদভগবদ গীতায়'। অপরটির সুরে ভরে আছে ভাগবতাদি পুরাণের প্রতিটি পৃষ্ঠা। মুরলী নিয়ে গান করতে করতে আনন্দে তিনি করেছিলেন নৃত্য। সে ছবি ধরা আছে ভক্তের হৃদয়ে। এই গ্রন্থে যেন শঙ্খ-মুরলী-নূপুর সহ আনন্দময়েরই ক্ষণিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণলীলার জয় হোক।

সূচীপত্র

যশোদার অঙ্গনে

জগৎ চায় কৃষ্ণকৃপা, কৃষ্ণ চান...

গিরিরাজের পদপ্রান্তে

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং..."

জগতে দুঃখ কেন?

ব্রজের ব্রজনাথ, পুরীধামে জগন্নাথ

বাঁশীর সুরে অশ্রু ঝরে

বিচিত্র বরদান

যুদ্ধের অবসরে

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে। সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ বন্ধ থাকে। যুদ্ধ শেষে উভয় পক্ষ আপন আপন শিবিরে বসে আগামী দিনের যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করে। কখনও বা উভয়পক্ষের যোদ্ধারা উভয় পক্ষের শিবিরে গমন করে সৌজন্য বিনিময় করে।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন সবে দিবাবসানে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত যোদ্ধারা বিশ্রামার্থে শিবির অভ্যন্তরে গমনোদ্যত—এমন সময়ে দেখা গেল, শ্বেত অশ্বযুক্ত একখানি রথ কুরুক্ষেত্রের অদূরে যমুনা নদীর দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। রথ যখন যমুনাতটে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-রাত্রির গাঢ় অন্ধকার যমুনার বুকে নেমে এলেও যমুনার জলকে সেই অন্ধকারের ঘনত্ব আচ্ছন্ন করতে পারেনি। আঁধারের মাঝেই খদ্যোত মালা শোভিত নীলাকাশ তার বুকে প্রতিবিম্বিত—আঁধারের বক্ষ বিদীর্ণ করে রূপালি আলোর তরঙ্গে কলকল নাদে বয়ে চলেছে আপন লক্ষ্যের দিকে।

শ্বেতাশ্ব যুক্ত রথ থেকে নামলেন সারথি—তাঁর শ্রীপাদস্পর্শে যমুনার তট পুলকিত—তাঁর দৃষ্টিপাতে যমুনার অশান্ত বীচিমালা রোমাঞ্চিত। সারথি যমুনার তটে অবতরণপূর্বক অশ্বগুলিকে রথের রশি হতে মুক্ত করলেন—তারপর তাদের সারা গায়ে শ্রীকরকমল স্পর্শ করে—তাদের প্রত্যেকের মুখ ও শিরদেশ চুম্বন করে তাদের নিয়েই যমুনার জলে অবতরণ করলেন। অশ্বগুলি যমুনার জল পান করছে। তিনি অঞ্জলি দ্বারা জল সিঞ্চন করে প্রাণীগুলির গাত্রমার্জনে মনোনিবেশ করলেন, গাত্রমার্জন সমাপন হলে প্রাণীগুলিকে যমুনার তটে কোমল তৃণভোজনে নিযুক্ত করলেন। অশ্বগুলি তৃণ খায় আর মাঝে মাঝে সারথির দিকে তাকায়। সারাদিন আরোহীসহ যুদ্ধের রথ টেনে বহন করা বড় কষ্টকর—ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় শরীরে বড় ক্লেশ অনুভূত হয় তাদের। তাই সারথি প্রতিদিন যুদ্ধের শেষে যমুনায় এসে তাদের অঙ্গ মার্জনা করে ক্লান্তি দূর করেন—কচি তৃণ খাইয়ে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। এমন দরজী প্রভুকে তাই তারা নয়নের ভাষা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। কখনও তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে দূরে বিচরণ করতে যায় না। অশ্বগুলি তৃণ খেতে শুরু করেছে দেখে—সারথি পুনরায় রথের কাছে এসে রথটিকে টানতে টানতে রথসহ যমুনার জলে অবতরণ করলেন। রথখানিকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিরীক্ষণ পূর্বক ধৌত করতে থাকেন। রথগাত্র হতে ধূলি-ময়লা-রক্তচিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলে পুনঃ রথখানিকে যমুনার তটে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং আপনি যমুনা-সলিলে অবগাহনার্থে অবতরণ করলেন—তাঁর কোমলাঙ্গের জায়গায় জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছে বিপক্ষ যোদ্ধাদের শরাঘাতে। কোথাও রক্ত ঝরতে ঝরতে একসময় জমাট হয়ে জমে উঠেছে—কোথাও বা রক্ত তখনও ঝরে চলেছে। যমুনার জলস্পর্শে ক্ষতস্থানগুলিতে দহনজ্বালা শুরু হল। যন্ত্রণায় সারথির শ্রীমুখ হতে নির্গত হল 'ব্যথাকাতর ধ্বনি-'আঃ!' অদূরে বিচরণগত অশ্বগুলি সে ধ্বনি শুনে ছুটে আসে তাদের প্রিয় প্রভুর কাছে। সারথি স্বীয় অঙ্গ ধৌত করে বসনাঞ্চল দ্বারা সিক্ত কলেবর আলতোভাবে মর্দন করেন—তারপর জল থেকে উঠে এসে অশ্বগুলিকে বললেন,—''কিরে তোরা তৃণভক্ষণ না করে চলে এলি যে?'' যাকে কেন্দ্র করে সকল বাক স্ফুরিত হয়, সেই পরমপ্রিয় প্রভুর দিকে চেয়ে নির্বাক অশ্বগুলি বাকমুখর হয়ে উঠল—তারা সমস্বরে বলে ওঠে—''প্রভু, তোমার অঙ্গের যন্ত্রণায় আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে—সারাদিন তুমি কিছু খাওনি, শরীরের উপর দিয়ে কত ধকল গেছে—তার উপর এই ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা—তোমার এই কষ্ট দেখে আমরা কোন মুখে তৃণ আহার করবো প্রভু'? অশ্বদের কথায় সারথির অধঃপুটে মৃদু হাসির ঝিলিক যমুনাতটের গাঢ় অন্ধকারকে ম্লান করে আলোয় ভরিয়ে দিল। তিনি অশ্বগুলিকে আদর করে বলতে থাকেন,—''না রে! আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না। তোরা আমার জন্য না ভেবে তৃণ ভক্ষণ করগে যা, রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে তোদের আবার রথ টানতে হবে। অদূরে ঐ যে গুল্মের ঝোপ রয়েছে আমি ওখান থেকে কিছু ওষধিলতা সংগ্রহ করে, তার রস ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেই সব নিরাময় হয়ে যাবে। আমার জন্য ভাবিস না,"—এই বলে সারথি গুল্ম ঝোপের দিকে অগ্রসর হলেন। অশ্বগুলি প্রভুর দিকে চেয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে। সারথি কিয়ৎক্ষণ পর ক্ষতস্থানে ভেষজ রসের প্রলেপ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন রথের কাছে। অশ্বগুলি বিচরণ করতে করতে একসময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল। সারথি রথের অভ্যন্তরে স্থিত বসন নিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করলেন। তারপর যমুনার তটে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সবুজ তৃণের উপর একখানি উত্তরীয় বিছিয়ে তার উপর উপবেশন করে ধ্যানে ডুবে গেলেন।

মধ্যযাম! অশ্বগুলি নিদ্রান্তে পুনঃবিচরণরত। যমুনার দুই তটে প্রচুর বৃক্ষরাজি ও ছোট ছোট তৃণগুল্মের জঙ্গল। সেখান থেকে কখনও কখনও দু-একটা নিশাচর পাখির ডাক ভেসে আসে। এমন সময় একজন দিব্যাঙ্গী তরুণী যমুনার গর্ভ হতে উত্থিত হয়ে সারথি যেখানে ধ্যানাসীন সেখানে মৃদু পদ সঞ্চালনে উপনীতা হলেন। অপলক নয়নে দেখতে থাকেন ধ্যানাবিষ্ট সারথির রূপমাধুরী। সারথির ধ্যানমগ্ন রূপ দেখতে দেখতে তন্বীর মানসপটে ভেসে ওঠে অতীতের স্মৃতি—সে স্মৃতি আঁকা আছে বৃন্দাবনের যমুনার হৃদয় পটে। বৃন্দাবনে যমুনার কালীদহে বাস করতো কালিয় নাগ। তার নিঃশ্বাসে কালীদহের জল ছিল বিষাক্ত অপেয়। সেই জল পান করে বৃন্দাবনের গোপ রাজের ছোটলালার খেলার সঙ্গীরা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সংবাদ পেয়ে ছোটলালা ছুটে যায় সেখানে—দাদা বলরাম সেদিন সঙ্গে ছিল না—তাই বিনা বাধায় সেখানে উপনীত হয়ে কালীদহের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নন্দরাজের ছোটলালা। শব্দ শুনে ছুটে আসে কালীনাগ। বিষাক্ত ছোবল বসায় ছোটলালার কোমল অঙ্গে। বিষের যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে ছোটলালা—চোখে নেমে আসে ঘন অন্ধকার—এমন সময় সেখানে এই দিব্যাঙ্গী তরুণী আবির্ভূতা হয়ে লালাকে করস্পর্শে সুস্থ করে তোলে, তারপর লালাকে দাঁড় করিয়ে দেয় কালীনাগের ফণার মাথায়। সেখানে লালা নৃত্য করে। যমুনার তট হতে ব্রজবাসীরা সবাই দেখে সে দৃশ্য। কালীনাগের পতন হয় ; সে কালীদহ ত্যাগ করে। দিব্যাঙ্গী তরুণীর অঙ্গলাবণ্য মাধুরী মিশ্রিত জল লালা ছিটিয়ে দেয় মৃত সাথীদের মুখে—তারা বেঁচে ওঠে। আজ ধ্যানাবিষ্ট সারথির দিকে চেয়ে দিব্যাঙ্গী তরুণীর সেই লালার মুখটি মনে পড়ে—যে ছিল ব্রজের প্রাণ। সবার নয়নের মণি। ইতিমধ্যে সারথির ধ্যান সমাপন হয়। তিনি আঁখিপদ্ম উন্মীলন করতেই দেখতে পান এক সুবেশা ও সুকেশা দিব্যাঙ্গী তরুণীকে। দিব্যাঙ্গী তরুণী সারথির দিকে চেয়ে বলে,—"আমাকে চিনতে পারছো প্রিয়তম?" 'প্রিয়তম' ডাকে চমকে উঠেন সারথি—সারা অঙ্গে এক অপূর্ব শিহরণ খেলে যায়। সারথি শিহরিত ভাব গোপন করে দিব্যাঙ্গীর দিকে চেয়ে বলে—"চিনেছি, তুমি যমুনা, আমার প্রিয়া। তুমি এসেছ আমাকে তোমার লাবণ্য মাধুরী পান করিয়ে—আমার তৃষ্ণা দূর করতে।"

সারথির কথায় দিব্যাঙ্গীর পরিচয় পেলাম,—তিনি যমুনা। যমুনা সারথির কাছে এসে তাঁর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেন এবং বলেন,—"প্রিয়, এখনও রাত শেষ হতে দেরী আছে। আমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নাও। সকাল হলেই আবার তোমাকে রথের লাগাম ধরতে হবে। কত অস্ত্রের আঘাতের যন্ত্রণা এই অঙ্গে সহ্য করতে হবে—ভাবতেও বুকটা বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। একদা যশোদা মা যে মুখে ননী দিত—যে অঙ্গ নন্দমহারাজের গৃহে কুসুম কোমল শয্যায় শয়ন করত এবং বালুকঙ্করের আঘাতে পদতল রক্তাভ হয়ে উঠবে বলে ব্রজবাসীরা ব্রজের পথঘাট বালুকঙ্কর মুক্ত করে রাখতো—আজ সেই পদতলে দারুনির্মিত কঠিন রথবেদী, না জানি প্রিয় তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!" সারথি যমুনার কোলে মাথা রেখে বলেন—"ও কথা বল না যমুনে, রথ শুনলে কষ্ট পাবে।" একি কথা বলছো প্রিয়—রথ কষ্ট পাবে কি করে? রথের কি তোমার মত প্রাণ আছে?—"আছে গো, রথেরও আমার মত প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, সব আছে। তাই তো নির্জনে এসে রথের গা ধুয়ে দিই, রথকে পরিষ্কার করি—ওযে আমার জন্য কত পরিশ্রম করে, কষ্ট করে—ওকে না দেখলে হয়?"—"তুমি জানো না শুধু রথ কেন—এ বিশ্বে যা কিছু আছে, সে তুমি জড়ই বল, আর

চেতন বল সবার প্রাণ আছে। আমার গুরু সন্দীপনী মহারাজ আমাকে ও দাদাকে নিজের মুখে কতবার বলেছেন—''ইদং সর্বম চেতনাবৃতম''—এই জগতের সমস্ত কিছু চেতনা দ্বারা আবৃত। প্রাণের দ্বারা ধৃত।''

তাই বুঝি? যমুনার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা।—প্রিয়া আমার চুলে একটু বিলি কেটে দাও না। ওঃ কতদিন হল মা যশোদার কাছে যখন শুতাম—তখন মা চুলে বিলি কাটতো, গান শোনাতো—আর সেই গান শুনতে শুনতে মাকে জড়িয়ে ধরে একসময় ঘুমিয়ে যেতাম। সারথির কথায় যমুনার আঁখিদ্বয় অশ্রুতে ভরে ওঠে। সারথির কুঞ্চিত কেশদাম শোভিত মস্তকখানিতে যমুনা করাঙ্গুলি মৃদু সঞ্চালিত করে বিলি কাটতে থাকে। সারথি যমুনার মুখকমলে আপনার মুখকোমল নিবদ্ধ করে গাঢ় তন্দ্রায় ঢলে পড়ে। যমুনা সারথির মাথা হতে সারা অঙ্গে হাত বুলায়—ক্লান্তি দূর করে। অশ্বগুলি পেট ভরে তৃণ খেয়ে এসে যমুনা ও সারথিকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে থাকে। যমুনা অশ্বগুলির দিকে চেয়ে বলে—তোদের স্কন্ধেই আমার প্রিয় সারাদিন থাকে। দেখিস তাঁর যেন কষ্ট না হয়। অশ্বগুলি বলে—মা, তোমার প্রিয়তমের কথা কী বলবো। উনি নিজের কষ্টের দিকে লক্ষ্যই রাখেন না। এই দেখ না—প্রতিদিনের যুদ্ধ শেষে আমাদের এখানে নিয়ে এসে স্নান করানো, তৃণ খাওয়ানো না হওয়া অবধি তোমার প্রিয়ের শান্তি নাই—এমনকি রথটিকেও আপনার মতো করে ভালোবাসে, আদর করে, কত কথা বলে। যমুনা আবার অবাক হয়, জিজ্ঞাসা করে—''প্রিয় রথের সঙ্গে কথা বলে? কি বলছিস তোরা?' হ্যাঁগো-একদিন রথ পরিষ্কার করতে গিয়ে তোমার প্রিয়র হাতের আঙুল কেটে যায়-রক্ত ঝরতে থাকে—তা দেখে রথ বলে—প্রভু আমার জন্যে আর কত কষ্ট করবে—তোমার আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে আর আমি এমনই অসহায় যে তোমার একটু সেবা করতে পারছি না।—আমরা অশ্বরা তবুও বিশ্রাম পাই প্রভুর কৃপায়—কিন্তু আমাদের সেবা করতে গিয়ে প্রভু একটুও বিশ্রাম পায় না। বহুদিন পর তোমার কোলে মাথা রেখে প্রভু আমাদের একটু বিশ্রাম পেল। তুমি মা, তাই সবার ব্যথা বোঝ—বলতে বলতে অশ্বগুলির চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে সারথির ঘুম ভেঙে যায়। আস্তে আস্তে আঁখিপল্লব বিস্তার করেন—যমুনারকোল থেকে উত্থিত হয়ে অশ্বগুলিকে আদর করে বলেন—ওরে, তোরা আছিস বলেই না আমার কাজ কত সহজ হয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। তোরা মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করিস বলেই না আমার যোদ্ধার যুদ্ধ করা সহজ হয়ে ওঠে। তোদের কাছে কি আমার ঋণ কম!

—ওকথা বলো না প্রভু—আমরা তোমার সেবক। প্রভুর সেবা করাই তো সেবকদের ধর্ম। অশ্বগুলির কথায় সারথির মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন—চল তোদের এবার রথের সঙ্গে যুক্ত করে দি, সূর্যোদয় হতে আর দেরী নাই। আয় সব রথের কাছে চলে আয়—অশ্বগুলি প্রভুকে অনুসরণ করল। সারথি অশ্বগুলিকে রথে যুক্ত করে যমুনার দিকে চেয়ে বলেন—যমুনে, তোমার কোলে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে আমি বড় তৃপ্ত। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। যমুনা বলে—প্রিয়, বৃন্দাবন থেকে আজ অবধি তোমার বিগলিত অঙ্গ সৌরভ বক্ষে ধারণ করে আমি ধন্য। আমার নারী জন্ম সার্থক-তোমার মুখে প্রিয়তমা ডাক শুনে। আমি যখন তোমার প্রিয়া তখন কিছু চাওয়ার থাকে না। প্রভু তুমি, তাই তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে তো আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে বল—আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করবো। সারথি বললেন বেশ, তবে তাই হোক, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা সারাদিন যখন এই অশ্বগুলিকে নিয়ে আমি যুদ্ধভূমিতে রথ চালনা করবো তখন অশ্বগুলির কণ্ঠে তুমি অধিষ্ঠান করে ওদের সারাদিনের পিপাসার কষ্ট থেকে রক্ষা করো।

যমুনা বললেন—তথাস্তু! কিন্তু তোমার তৃষ্ণা নিবারণ কেমন করে হবে? সারথি বললেন,—আমি যুদ্ধের অবসরক্ষণে এমনি করে এসে তোমার বক্ষে নেমে অবগাহন করে—অঞ্জলিভরে তোমার বক্ষামৃত পান করে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করবো—জান তো প্রিয়ার বক্ষামৃতে আমার বড় লোভ! কথাগুলি বলে সারথি মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

যমুনা বলেন—বক্ষামৃতে তোমার যে লোভ তা আমার অজানা নয়।

গোকুল বৃন্দাবনে এরজন্য তুমি যশোদাকে কম জ্বালাও নি?

—যমুনে, যুদ্ধ যতদিন চলবে—সে জ্বালায় তোমাকেও জ্বলতে হবে-সেটা যেন মনে থাকে?

—প্রিয়তমের জ্বালায় রমনীর রমনীত্ব জ্বলে ওঠে। কাজেই ঐ ভয়ে আমি ভীতা নই—বরং গর্বিত-আনন্দিত নারীত্বের সার্থক বিকাশে।

—এখন তবে আসি প্রিয়ে। যুদ্ধের সময় আগত প্রায়।

—প্রার্থনা করি—জয়ী হও তুমি।

—জয় আমি চাই না, জয় হোক ধর্মের। জয় হোক সত্যের।

—বেশ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

সারথি যমুনার কাছে বিদায় নিয়ে রথে আরোহন করলেন। ধীরে ধীরে রথ প্রভাতের আলো ফোটার আগেই-যমুনার দৃষ্টি পথ হতে একসময় মিলিয়ে গেল। যমুনা আপনার গন্তব্য স্থলাভিমুখে রওনা হলেন পুলকিত চিত্তে।

পাঠক আশা করি সারথি কে—তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। যারা বুঝতে পারেননি—আসুন বুঝিয়ে দি—এই সারথি আর কেউ নন—ইনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অর্জুনের রথের সারথি—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে ইনি ছিলেন গোপালক—এখানে অশ্বচালক ও অশ্বপালক।

ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারতের মহাসমর আরম্ভ হতে তখনও দুদিন বাকী। দুপক্ষই [পাণ্ডব ও কৌরব] কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধ পূর্ব প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। যুদ্ধে যোগদানের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে রাজা মহারাজরা এসে কুরুক্ষেত্রে আপন আপন পক্ষের শিবিরে প্রবেশ করছেন। উভয়পক্ষের শিবিরে আপন আপন চিহ্ন শোভিত পতাকা পতপত করে উড়ছে। জনকোলাহলে যুদ্ধভূমির পরিবেশ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। পাণ্ডবদের সখা ও হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকা ছেড়ে রণভূমিতে উপনীত হয়ে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসার কিছুক্ষণ পর দেবরাজ ইন্দ্রও এসে পাণ্ডবশিবিরে যোগদান করলেন। সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়, দ্বারকা থেকে সুদীর্ঘ পথ হস্তিনার কুরুক্ষেত্র। এতখানি পথ ভ্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণ বড় ক্লান্ত—ইন্দ্রের অবস্থাও তাই। তার ভ্রমণের পথ আরও দীর্গ। কেন না তাকে স্বর্গ থেকে মর্তের কুরুক্ষেত্রে আসতে হয়েছে। সুতরাং পরিশ্রম তো হবেই। ক্লান্ত ইন্দ্রের শরীরের দিকে চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"চলো দেবরাজ বাইরে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।" ইন্দ্র সম্মতি জানালেন। কৃষ্ণসখা অর্জুনও সঙ্গী হলেন। শুরু হল তিনমনের প্রাক সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ। ঘুরতে ঘুরতে তিনজনে একসময় এক নিবিড় অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করলেন। চলতে চলতে তিনজনেই অনুভব করলেন—তাঁদের প্রচণ্ড জল পিপাসা পেয়েছে। তাই তিনজনে একসঙ্গে জলের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। হঠাৎ বনের মধ্যে দেখা গেল—এক জায়গায় আলো জ্বলছে। আলো লক্ষ্য করে তিনজনে এগিয়ে চললেন। কিছু দূর গিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন পাতায় ছাওয়া একখানি কুটীর। ইন্দ্র বললেন, —"যদুপতি মনে হচ্ছে কুটীরে একজন রয়েছেন"। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—চল ভিতরে গিয়ে দেখা যাক। তিনজনে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন একজন বৃদ্ধা কুটীরের দাওয়ায় বসে জলন্ত চুল্লীতে রাতের আহার পাক করছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বুড়ীমা কি রান্না করছো, খুব সুন্দর সুগন্ধ আসছে। বৃদ্ধা ইঙ্গিতে তিনজনকে ভিতরে আসার আহ্বান জানিয়ে বললেন—আর কি রাঁধবো বাবা, রাতের জন্য একটু খিচুড়ি পাক করছি। তোমরা খাবে? যদি বল তাহলে না হয় আর একটু চাল-ডাল মিশিয়ে দি, কেমন? তিনজনে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে এবং বলে,—"বুড়ীমা খিচুড়ি না হয় খাওয়া যাবে—তার আগে আমাদের জল দাও, বড় পিপাসা পেয়েছে। বৃদ্ধা বললেন—'আহা, বাছাদের আমার জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তোমরা একটু চুলোটা দেখ, আমি পরিমাণমতো চাল, ডাল মিশিয়ে দিলাম। আমি জল নিয়ে এখুনি আসছি।'

বৃদ্ধা কলসী কাঁখে জল আনার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছুক্ষণের মধ্যে জল এনে তিনজনকে কলসী থেকে ঢেলে দেন। তিনজনে অঞ্জলিভরে জলপান করে পিপাসা নিবারণ করেন। বৃদ্ধা অত্যন্ত দরিদ্র। তার কাছে কোন জল দেওয়ার পাত্র নাই। তাই অতিথি তিনজনকে অঞ্জলি হস্তে জলপান করতে হয়।

ইতিমধ্যে বুড়ীমার রান্না শেষ হয়। বাসনের অভাবে বুড়ীমা কলাপাতা এনে অতিথি তিনজনকে গরম গরম খিচুড়ি পরিবেশন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র কলাপাতায় খেতে অস্বস্তি বোধ করেন। হাজার হোক দেবরাজ বলে কথা। রানী শচীদেবী স্বর্গে সোনার থালায় না জানি কতরকমের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে দেবরাজের মুখে তুলে ধরেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার চিত্তে প্রসন্ন মুখে খিচুড়ি খেতে থাকেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করেন। দু'জনার নির্বিকার ভাব দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও চুপচাপ খেতে থাকেন।

অতঃপর তিনজনার ক্ষুধা, পিপাসার নিবৃত্তি হল। তিনজনই বৃদ্ধাকে শ্রদ্ধাসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে—কুরুক্ষেত্রাভিমুখে রওনা দেন। পথের মধ্যে দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে টিপ্পনী কেটে বলেন—"আপনাকে লোকে বলে দীনবন্ধু—তা এই বৃদ্ধার প্রতি আপনার কৃপা কৈ। আপনি এমনই দীনের বন্ধু যে বৃদ্ধা স্নেহময়ী

মহিলাকে খাবার বাসনটুকু পর্যন্ত দেন নাই। আপনার যত দয়া ধনীদের উপর। ধনীকে আপনি আরও ধনী করেন। আর এটাই হচ্ছে আপনার ন্যায় বিচার।

দেবরাজের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বললেন দেবরাজ, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? এই পৃথিবীতো মানুষের কর্মভূমি। এইজন্য আমি এখানে বিশেষ হস্তক্ষেপ করি না। তবু জেনে রাখ, সমগ্র সৃষ্টি আমাতেই সমাহিত। সৃষ্টির সব প্রাণীই আমার অংশ। সৃষ্টির যদি কোন প্রাণীর কষ্ট বা বেদনা হয় তবে তার প্রভাব আমার উপরেই পড়ে। যাক—একসময় তোমার ক্ষোভের বা দুঃখের জবাব আমি দেব—কিন্তু এখন নয়। চল এখন শিবিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। শ্রীকৃষ্ণের কথায় ইন্দ্র মনে মনে রুষ্ট হলেন।

পরের দিন প্রভাত কর্ম সমাপন করে তিনজনে পুনরায় ঘুরতে বেরোলেন। যুদ্ধ কাছেই, তাই অর্জুনের মনটা আজ তেমন ভালো নেই। চলতে চলতে পথের মাঝে একজায়গায় বসে পড়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—সখা, আমাকে ক্ষমা করো। আমার আজ হাঁটতে একেবারেই ভালো লাগছে না। তোমরা বরং ঘুরে এসো। আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় এখানেই অপেক্ষা করছি।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ঠিক আছে, আজ এখানেই বসা যাক। কিন্তু বেলা তো অনেকখানি হলো। মধ্যাহ্ন সময় আগত প্রায়। ক্ষুধাও পেয়েছে। আজ তোমাকে এবং ইন্দ্রকে পায়েস রান্না করে খাওয়াবো এবং তোমাদের পথশ্রমজনিত ক্লান্তিও দূর করে দেব। দেবরাজের দিকে চেয়ে বললেন—ইন্দ্র, তুমি এক কাজ করো। দেবরাজ বললেন—কি কাজ? কয়েকখণ্ড প্রস্তর সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। আমি ঐগুলো দিয়ে চুলা তৈরি করে তোমাদের জন্য চমৎকার পায়েস রান্না করে খাওয়াবো। দেবরাজ বললেন—ঠিক আছে, আমি এখনই পাথর সংগ্রহ করে আনছি। দেবরাজ চলে যেতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—অর্জুন, তুমি কিছু শুকনো কাঠ ও একটু আগুন সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। অর্জুন ঐসব দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরে যেতেই শ্রীকৃষ্ণ একা নির্জনে যোগশক্তি প্রভাবে সুগন্ধি চাল, শর্করা ও দুধ তৈরি করলেন। ইতিমধ্যে অর্জুন কাঠ আগুন এবং ইন্দ্র কয়েকখণ্ড পাথর সংগ্রহ করে এনেছেন। পাথর বহন করে আনতে হয়েছে তাই দেবরাজ কিছুটা ঘেমে উঠেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। দেবরাজ তা লক্ষ্য করে বলেন—একটা কূয়ো থেকে বড় কষ্ট করে ওগুলো ভেঙে এনেছি। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর না দিয়ে রান্নায় মনোনিবেশ করলেন। পায়েস প্রস্তুত হলে তিনজন তৃপ্তি সহকারে ভোজনপর্ব সমাধা করলেন। ইন্দ্র বললেন—পরমান্ন খুব স্বাদিষ্ট হয়েছে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর বিশ্রাম নিয়ে তিনজন গাত্রোত্থান করলেন। ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেইস্থানে উপনীত হলেন যেখান থেকে কূয়ো ভেঙে ইন্দ্র পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এসে ইন্দ্রকে বললেন—দেবরাজ এখানে তো দেখছি দুটো কূপ রয়েছে। একটা কাঁচা গাঁথা হয়েছে আর একটা বেশ পুরনো গাঁথুনিও পাকা। তুমি পাকা কূয়ো ভেঙে পাথর সংগ্রহ না করে কাঁচা কূয়ো ভেঙে পাথর বের করে নিয়ে গেলে কেন? ইন্দ্র লজ্জায় শির অবনত করলেন। মনে হল তিনি যেন গতদিনের ক্ষোভ মিশ্রিত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। লজ্জিত বদনে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—''দেবরাজ এই কর্মভূমিতে সকলেই আপন আপন কর্মানুযায়ী ফলভোগ করে কিন্তু পরুষার্থ সহকারে যে কর্ম করে সে সুখী হয়। তাছাড়া যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের আমি নিধন করতেই ভালোবাসি, কিন্তু কেন জানো? কেন? দেবরাজ জিজ্ঞাসা করেন। উদাত্ত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—''যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ শনৈঃ'' যাকে আমি কৃপা করি—তার কাছে আমি ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ থাকে না। তার সমস্ত ধন তাই আমি হরণ করি। দেবরাজ বলেন-ওগো কৃপাময়-হরণকার্যে দক্ষ বলেই না তুমি শ্রীহরি। চলো আর কথা নয় এবার শিবিরে ফেরা যাক।

যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অর্জুনের মন বড় বিষণ্ণ। কেননা, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, স্নেহশীল পিতামহ ভীষ্ম এবং আরও অনেক প্রিয়জনদের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। বিষণ্ণ বেদনা ভারাক্রান্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও। যুধিষ্ঠিরের ভাবনা—এই যুদ্ধে অনেক প্রাণ নিহত হবে। সেইসঙ্গে যদি তাঁর কোন ভাই হত হয়ে যায় তাহলে সে লোকসমাজে এবং মাতা কুন্তীর কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? সবাই তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলবে, যুধিষ্ঠির রাজ্য সম্পদের লোভে ভাইদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়ে মৃত্যুর কোলে সঁপে দিল। জ্যেষ্ঠ হয়ে কনিষ্ঠ ভাইদের রক্ষা করতে পারল না। এই ভাবনায় যুধিষ্ঠির ম্রিয়মান। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবদের বিষণ্ণতা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার? তোমরা এত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন? যুধিষ্ঠির বললেন—যাদের হত্যা করে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না—তাদের যুদ্ধে হত করতে হবে ভেবে আমাদের মন বিষণ্ণ। হে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে মেরে আমাদের কী আনন্দ হবে? বরং ওদের হত্যা করলে আমাদের পাপই বৃদ্ধি পাবে। আমাদের জ্ঞাতি ভাইদের হত্যা করে আমরা কি সুখ পাব? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দেখ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, প্রত্যেক যুদ্ধের আগেই যোদ্ধাদের মনে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব আসে। তোমাদেরও এসেছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তোমার ধর্মজনিত মোহ তোমার চিত্তকে দূর্বল করেছে কিন্তু দুর্যোধনের শক্তিবাদ বা অসুরবাদের কাছে ঐ ধর্মীয় আবেগের কোন স্থান নাই। তোমার ধর্মীয় ভাববাদিতার সুযোগ নিয়ে দুর্যোধন শক্তিশালী হতে সমর্থ হয়েছে। তোমার এই ধর্মীয় মোহের কথা জ্ঞাত আছেন ধৃতরাষ্ট্রও—তিনি ভাবেন তুমি ধর্মীয় মোহবশতই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবে এবং পুত্ররা বিনাযুদ্ধে জয় হাসিল করে রাজ্য ভোগ করবে। তোমার ধর্মীয় দুর্বলতার জন্যই পাণ্ডবদের আজ এই অবস্থা তুমি যদি পাশা না খেলতে তাহলে তোমার ভাইদের আজ এই অবস্থা হত না।

যুধিষ্ঠির নিরুত্তর হয়ে নত শিরে ভূমি অবলোকন করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ তুলে বলেন—যদি এ যুদ্ধে তোমার প্রিয়সখা অর্জুনের কোনো বিপদ হয়—কিংবা ধর যদি সে হত হয়—তাহলে আমাদের সকলকে রক্ষা করবে কে? শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, "রক্ষাকর্তা স্বয়ং ধর্ম, তবে সে ধর্ম দুর্বলতা নয়। সে ধর্মের ভিত্তি সততা-ন্যায়, বীর্যবত্তা ও সাহসিকতা। তোমার ধর্ম্মমোহ, অর্জুনের স্বজন বধজনিত মোহ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যর অন্নগ্রহণ মোহযুদ্ধের পরিবেশকে জটিল করে তুলবে—দুর্বলতা পরিহার কর। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমি চাই ন্যায়ের দণ্ড তোমাদের হাতে থাকুক। দুর্যোধন ন্যায়দণ্ডের অধিকারী হলে তার উগ্রভোগবাদ ভারতের আরও মহাসর্বনাশ ডেকে আনবে।

—কৃষ্ণ, তুমি যা বললে তা সবই ঠিক তবু মনকে বোঝাতে পারছি না। বিশেষ করে অর্জুনের কথা বারবার মনে হচ্ছে। কৌরবপক্ষের সবার লক্ষ্য অর্জুনের প্রাণ।

—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, তুমি বারবার অর্জুনের কথাই বলছো—তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি অর্জুনের জন্য বড়ই চিন্তিত—তুমি ছাড়া আর বুঝি অর্জুনের হিত কেউ চিন্তা করে না, বলতো অর্জুন তোমার কে?

—আমার ভাই।

—তোমার শুধু ভাই। আমার কে হয় জান?

—কে?

—আত্মার আত্মীয়। বন্ধু-শিষ্য ও ভক্ত, ভগ্নিপতি। যুদ্ধে অর্জুন নিহত হলে তুমি হারাবে শুধু ভাই পার্থকে আর আমি হারাব আত্মীয়, বন্ধু, ভগ্নিপতি ও শিষ্য ভক্তকে। তুমি হারাবে একজনকে আর আমি হারাবো একসঙ্গে চারজনকে। এবার বল জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব চিন্তা কার বেশি তোমার না আমার।

যুধিষ্ঠির নিরুত্তর।

শান্তির দূত শ্রীকৃষ্ণ

কার্তিক মাস। হেমন্ত কাল। এই সময় দ্বারকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। হেমন্তের পূর্ণিমা রাতে সমুদ্রের ঢেউগুলির তটে আছড়ে পড়া বিগত শরৎ প্রকৃতির প্রান্তরে কাশফুলের দোলাকে মনে করিয়ে দেয়। সমগ্র দ্বারকা নগরী সমুদ্রতরঙ্গমালার বেষ্টনে সুরক্ষিত। দ্বারকার প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে চেয়ে তরঙ্গের গর্জন শুনছেন ও সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করছেন। সহসা স্কন্ধ দেশে নরম করাঙ্গুলীর স্পর্শে চমকে উঠলেন—গ্রীবা সঞ্চালন করে দেখলেন—প্রধানা মহিষী রুক্মিনী দাঁড়িয়ে পাশে। কৃষ্ণ বললেন—প্রিয়া তুমি এখনও ঘুমাও নি?

—আপনাকে অতন্দ্র রেখে আমি কি তন্দ্রা যেতে পারি? আসুন বিশ্রাম নেবেন। আমি আপনার জন্য শয্যা প্রস্তুত করে রেখেছি।

—বিশ্রাম। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। আমার বিশ্রাম নেই প্রিয়ে। কাল প্রভাতেই আমাকে হস্তিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে।

—কেন হস্তিনায় কি হয়েছে প্রভু? পাণ্ডবদের সব কুশল তো?

—এখনও পর্যন্ত তারা কুশলেই আছে কিন্তু দুর্যোধনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাদেরকে কুশলে থাকতে দেবে না। মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই সেখানে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে।

যুদ্ধের আগুন যাতে না জ্বলে তার জন্য আপনি কিছু একটা করুন প্রভু।

—আমার চেষ্টার বিরাম নাই—আমি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের পাঁচখানি গ্রাম দেওয়ার জন্য কত অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু দুর্যোধন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের গর্বে বধির—তাই আমার শান্তির প্রস্তাবের সংগীত সুর তার কর্ণে প্রবেশ করল না। ভাবছি আগামী প্রভাতে হস্তিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে আর একবার শেষ চেষ্টা করবো—যাতে অন্তত যুদ্ধ না হয়।

—শুনেছি দুর্যোধন বড়ই দুর্মতি। আপন মাতুল কুচক্রী শকুনি তার পরামর্শদাতা।

সে কি কথা শুনবে?

—মহাত্মা বিদুরও আমাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন দুর্যোধনের কাছে শান্তি প্রস্তাবের জন্য কিছু না বলাই ভালো।

—মহাত্মা বিদুরের এমন মন্তব্যের কারণ?—বিদুর ছোট থেকেই দুর্যোধনকে কাছে থেকে দেখেছেন। লালন-পালন করেছেন—তাই তাঁর পক্ষে দুর্যোধন চরিত্রের খুঁটিনাটি সবই জানা সম্ভব। তিনি হয়তো বুঝেছেন, যে দুর্যোধন আমার কথা অনুযায়ী শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে এবং এর ফলে আমার মর্যাদা হানি হবে তাই তিনি আমাকে একসময়ে নিভৃতে পেয়ে বললেন—কৃষ্ণ, গায়ক যেমন বধিরের কাছে গান করে না, তেমনি যেখানে সদুপদেশ এবং অসদুপদেশ দুইই সমান সেখানে কিছু না বলাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

—যুদ্ধ আসন্ন ভেবে আপনি কি বিচলিত বোধ করছেন?

—হ্যাঁ প্রিয়ে, যুদ্ধের পরিণতির কথা ভেবে আমি বিচলিত। আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি লক্ষ লক্ষ মা সন্তান হারিয়ে বুকফাটা আর্তনাদ করছে। অভিশাপ দিচ্ছে যুদ্ধের নায়কদের উদ্দেশ্য করে। কত গৃহবধূ তাদের প্রাণবল্লভকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। গৃহবধূদের দীর্ঘশ্বাস, মায়েদের সন্তান হারানোর আর্তনাদ যেন আমার হৃদয়কে দলিত, মথিত করে দিচ্ছে, তাই আমি বিচলিত। পাঁচখানি গ্রামের উপর স্বত্ব ত্যাগ করলে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়—তবে দুর্যোধন কেন সে ত্যাগটুকু করতে অস্বীকার করে—বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণের দুই আঁখি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি রুক্মিনীর কাঁধে মাথা রেখে শিশুর মতো

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। রুক্মিনী শ্রীকৃষ্ণের অশ্রু মুছিয়ে বললেন—থাক প্রিয় ওসব কথা, এখন চলুন শয্যায় বিশ্রাম নেবেন। তিনি কৃষ্ণকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাকে কক্ষের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান সমাপন করে সূর্য-অগ্নির পূজা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর ঋষি ও গুরুজনদের প্রণাম করে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে সাত্যকির সঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত একটি দ্বিচক্ররথে উপবেশন করে শান্তির দূত হিসাবে তিনি রওনা দিলেন হস্তিনার উদ্দেশ্যে। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে চারটি অশ্ব সেই রথ টানতে শুরু করল। মহারথ-মহারথী-পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী ও শত শত সেবক নানাবিধ ভোজ্য নিয়ে কৃষ্ণের অনুগমন করল। শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রথ থামিয়ে অশ্বগুলিকে বিশ্রাম দেন ও আহার করান। বেশ কিছু দূর চলার পর দেখতে পেলেন কতকগুলি যোগী ঋষি চলেছেন হস্তিনার পথে। কৃষ্ণ রথ থামিয়ে যোগীঋষিদের প্রণাম জানালেন, যথাযোগ্য ভোজ্য অর্ঘ্য প্রদান করে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কোথায় চলেছেন মহাত্মাগণ।

যোগীঋষিরা বললেন, আমরা পূর্বেই সংবাদ পেয়েছি, আপনি আজ হস্তিনায় আসছেন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে—তাই আমরাও চলেছি আপনার শ্রীমুখ থেকে শান্তির প্রস্তাবসহ ধর্মের মর্মস্পর্শী বাণী শুনবো বলে। আপনার গন্তব্যস্থলই আমাদের লক্ষ্যস্থল।

—ছোটদের বড় করে দেখাই আপনাদের মহত্ব। তাই আপনারা মহাত্মন্।

—নিজেকে লুকিয়ে রাখাও আপনার বড় চাতুরী। তাই লোকে আপনাকে চতুর চূড়ামণি বলে। এখন বলুন তো আপনার শান্তির দৌত্য কি সার্থক হবে।

—ফলাফল ভেবে আমি কোনও কার্য করি না। আমি পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষের জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। যে ব্যক্তি আত্মীয় অথবা জ্ঞাতিদের পরস্পর বিরোধে বা ভেদে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে, শাস্ত্র বলে—সে মিত্র বা আত্মীয় নয়। পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষই আমার আত্মীয়। উভয়পক্ষের যাতে শান্তি হয় আমি সেই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে উভয়পক্ষকে আমার মত জানিয়েছি। শুনেছি দুর্যোধন আমার মত অগ্রাহ্য করেছে—তাই আজ আবার চলেছি শান্তির দূত হয়ে। ঋষিরা বললেন,—'শুনেছি দুর্যোধন লোভী, ক্রূরমতি সে কি আপনার কথা শুনবে?'

আমার শান্তির বার্তা যদি সে শোনে তবে উত্তম—যদি না শোনে তবে সে দৈবের বশীভূত হবে। উভয়পক্ষের ন্যায্য স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে যদি সর্বনাশা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি, তাহলে আমার আচরণ হবে লোকমতে পুণ্যজনক এবং কুরুবংশ ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। শান্তির দূত হিসাবে এটা করাই আমার কর্তব্য। মহাত্মাগণ এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানতে পারি কি?

—ধর্মের জয় হোক। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হোক, অধর্ম নাশ হোক।

—আপনারা শুদ্ধ ব্রতধারী মহাত্মন। আপনাদের হৃদয়েই ঈশ্বরের নিবাস। আপনাদের ইচ্ছাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কথায় কথায় অনেকখানি সময় অতিক্রান্ত। অপরাহ্ন গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে আর দেরী নাই। যোগীঋষিরা বললেন—হস্তিনাপুর এখনও একরাত্রির অধিক পথ। রাতের আঁধারে অশ্বগুলিকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। নিকটেই একটি গ্রাম আছে—আসুন আজ রাত্রে ঐ গ্রামে আমরা সবাই একসঙ্গে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

কৃষ্ণ বললেন—তাই হোক। সাত্যকি রথ ঘোরাও। সেই রাত্রে যোগীঋষিদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রামটিতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন—সেই গ্রামটির নাম বৃকস্থল। গ্রামটির অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল সচ্চরিত্র, তপঃপরায়ন এবং অতিথি বৎসল। গ্রামবাসীরা সকলে কৃষ্ণসহ যোগীঋষিদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। রাত্রে যথাযোগ্য ভোজ্য পেয় দিয়ে সকলকে তৃপ্ত করলেন। ভোজনান্তে গ্রামবাসীরা অনেকেই কৃষ্ণ ও যোগীঋষিদের কাছে দুর্যোধন ও পারিষদবর্গের নামে নানা অভিযোগ জানালেন। সাধারণ প্রজাদের উপর দুর্যোধনের করভারবৃদ্ধি, সুন্দরী যুবতী কন্যাদের প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি, জোর করে পিতামাতার সামনে তাদের মর্যাদা হানির চেষ্টা ইত্যাদি নানা অভিযোগের কথা গ্রামবাসীরা যোগীঋষিদের সম্মুখেই কৃষ্ণকে জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ সবকথা মন

দিয়ে শুনে বললেন—তোমাদের কুলকামিনীদের দীর্ঘশ্বাসই স্বৈরাচারী শাসকের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এখন যাও তোমরা বিশ্রাম কর, সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে তোমরা বড় ক্লান্ত—আমিও সারাদিন পথভ্রমণে পরিশ্রান্ত। গ্রামবাসীরা আপন আপন আলয়ে চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ও যোগীঋষিরা গ্রামবাসীদের তত্বাবধানে সসম্মানে ঐখানেই রাত্রিবাস করলেন।

পরের দিন তিনি হস্তিনাপুরে ঢুকতেই রাজপথের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষের ভীড় জমে গেল তাঁকে দেখতে। রাজপথে কৃষ্ণকে দেখতে এত অধিক জনসমাবেশ হল যে রথের অশ্ব গেল থেমে। ফলে রথ দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনি ধীরপদে রথ হতে নেমে দেখতে পেলেন একমাত্র দুর্যোধন ছাড়া সব কৌরবই এগিয়ে এসেছেন তাঁকে স্বাগত জানাতে। তিনি তাদের যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন করে কুরুরাজ প্রাসাদে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশমত গেলেন বিদুরভবনে, পরে পিসিমা কুন্তীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুন্তী পুত্রদের বনবাসের ও প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে শোক করলে তিনি পিসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—পিসিমা, তোমার মত বীরজায়া, বীর জননীর সব দুঃখ-সুখ সহ্য করা উচিৎ। তোমার বীরপুত্ররা বীরের মতো সুখে আছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে দুর্যোধনের গৃহে গেলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। কৃষ্ণ তা প্রত্যাখান করলে দুর্যোধন প্রত্যাখানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে কৃষ্ণ বলেন—প্রয়োজন মিটলেই শান্তির দূত আতিথ্য গ্রহণ করে। যখন আমার দৌত্যগিরির প্রয়োজন সম্পূর্ণ হবে তখন অমাত্যদের সঙ্গে আমার আহারের ব্যবস্থা করবেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—আপনাদের সঙ্গে আমার তো কোন বিরোধ নাই, তবে ভোজনে আপত্তি কেন? কৃষ্ণ বললেন—"আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, যুক্তি ও লোভের বশে ধর্মচ্যুত হব না। মানুষ অন্নগ্রহণ করে ভাব ও অভাবের জন্য কিন্তু মহারাজ, আমার বা আমাদের প্রতি আপনার ভাব বা প্রীতি ভালোবাসা নেই আর আমিও অভাবগ্রস্থ নই। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে অকারণে দ্বন্দে লিপ্ত হচ্ছেন। তাদের চাহিদা অনুযায়ী পাঁচখানি গ্রাম দিতেও আপনি অপারগ। তাদের ন্যায্য পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে যে সম্পদ আপনি ভোগ করছেন তা অপবিত্র, অশুচি। যে গৃহী বা রাজার অন্ন সৎ উপায়ে সংগৃহীত নয় তা গ্রহণ করলে গ্রহণকারীর পাপ হয়, ধর্ম নষ্ট হয়। অপরদিকে অসদ উপায়ে সঞ্চিত সম্পদ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। আমার বিবেচনায় আপনি সম্পত্তি অসদ উপায়ে অর্জন করে নিজেকে কলুষিত করেছেন। এমতাবস্থায় আপনার অন্ন গ্রহণ করা উচিৎ নয়। তাই আমি স্থির করেছি এখানে একমাত্র শুদ্ধমতি সদাচারী বিদুরের অন্নই গ্রহণ করবো।" কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরভবনে রওনা দিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য মহাত্মারা ও তাঁর পথ অনুসরণ করলেন। বিদুর কৃষ্ণের সাধ্যমত সেবা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের দেওয়া পবিত্র ও উপাদেয় অন্নসামগ্রী প্রথমে বেদজ্ঞ ঋষিদের, ব্রাহ্মণদের অর্পণ করে, অবশিষ্টাংশ সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নিজে ভাগ করে গ্রহণ করলেন।

নৈশ আহারের পর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করছেন বিদুর আলয়ের একটি ভগ্নপ্রায় অথচ পরিচ্ছন্ন কক্ষে। এমন সময় বিদুর প্রবেশ করে বললেন—কৃষ্ণ। আমার মনে হচ্ছে তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। পাপাত্মা দুর্যোধন অহংকারে উন্মত্ত, সে তোমার কথা শুনবে না। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার এরূপ অনুমানের কারণ? বিদুর বললেন—দুর্যোধন মনে করে সুতপুত্র কর্ণ একাই সব জয় করতে পারে। উপরন্তু ভীস্ম, দ্রোণ, মহাবীর তো রয়েছেই। যুদ্ধের আগেই জয়ী হয়ে গেছি এই ভেবে দুর্যোধন এখন নিশ্চিন্তে আছে। শান্তি স্থাপনের বিষয়ে তার কোন ইচ্ছাই নাই। তাই আমার মনে হয়—এ অবস্থায় তোমার শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হতে উর্দ্ধ অঙ্গ কিঞ্চিত উত্তোলন করে বললেন—মহাত্মাজী, "কর্মন্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। অতঃপর বিদুর একখানি শুভ্র গাত্রাবরণ শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় নামিয়ে রেখে কক্ষ থেকে নির্গত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিদুর গৃহে সুখে নিদ্রাবিষ্ট হলেন।

বহুরূপে বহুরূপী তুমি

সেদিন দ্বারকার রাজপথে বহুলোকের সমাগম হয়েছে। বালক-বৃদ্ধ-যুবা-নারী সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এক বহুরূপীর বিচিত্র সাজ ও নৃত্য দেখে আনন্দ উপভোগ করছে। বহুরূপী কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না কিন্তু সবাই তার নাচ বিচিত্র সাজ এবং কণ্ঠ নির্গত গান উপভোগ করছে—বহুরূপী নৃত্যের তালে গানের ছন্দে বলছে—''বহুরূপে বহুরূপী কৃষ্ণ কানাই, তাঁর কাছে আমা হেন ক্ষুদ্র বহুরূপীর তুলনা হয় না ভাই।'' কৃষ্ণকে বহুরূপী বলায় সমবেত জনতার মধ্যে অনেকেই ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন। এমন সময় সেখানে উপনীত হলেন কৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম। তিনি বহুরূপীর চালচলন কথাবার্তা শুনে বিস্মিত হলেন—বহুরূপীকে বললেন,—'চলো আমাদের রাজসভায়—সেখানে তোমার এই বিচিত্র বহুরূপীর বেশ দেখাবে এবং গান শোনাবে—যদি সবাই তোমার বেশ দেখে , কথা শুনে খুশী হয় তাহলে তুমি আশাতীত পুরস্কার পাবে।' বলরামের কথায় সম্মতি জানিয়ে বহুরূপী চললেন দ্বারকার রাজসভায়, সঙ্গে বলরাম ও দ্বারকার অগণিত নরনারী। রাজসভায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ উগ্রসেন—পাশে অন্যান্য আসনে উপবিষ্ট দ্বারকার বিশিষ্ট মন্ত্রীমণ্ডলী ও নাগরিকবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণও রয়েছেন সেখানে একটি আসন অলংকৃত করে। এমন সময় সেখানে বলরাম-এর সঙ্গে বহুরূপী উপস্থিত হয়ে গান ধরলেন—''বহুরূপে বহুরূপী কৃষ্ণ কানাই—বিশ্বজগৎ এত বড় বহুরূপী কভু দেখে নাই।'' বহুরূপীর মুখে একথা শুনে রাজসভার লোক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন—কে বললেন —''কি অসভ্য এই বহুরূপী, কোন শিষ্টাচার নেই—আমাদের কৃষ্ণকে বলে কিনা বহুরূপী। কেউ বলেন এই অভদ্র বহুরূপীটাকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিৎ। কেউ বলেন ওকে কারাগারে ভরে দাও। বহুরূপীর বেশে ওটা একটা অসভ্য ছাড়া কিছুই নয়।

সভার একপ্রান্তে বসে শ্রীকৃষ্ণ ভালো করে লক্ষ্য করলেন বহুরূপীকে। বহুরূপীকে দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণের অধরে ফুটে উঠলো হাসি। তিনি বহুরূপীকে চিনতে পেরেছেন তাই হাসছেন। অন্যদিকে বহুরূপীও কৃষ্ণের হাসি লক্ষ্য করে কৃষ্ণের হাসির চেয়ে জোরে হেসে উঠলেন। বহুরূপীর জোর হাসিতে সভাসদরা রেগে উঠলেন এবং কিছু সভাসদ বহুরূপীকে কটু বচন শোনাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই—কৃষ্ণ হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন। দাদা বলরামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''দাদা এই বহুরূপীকে তুমি কোথায় পেলে?' বলরাম বললেন, 'দ্বারকার রাজপথে এই বহুরূপী আপন ভাবভঙ্গী দ্বারা অনেক নরনারীকে হাসাচ্ছিল ও আনন্দ প্রদান করছিল। তা দেখে আমি ভাবলাম একে রাজসভায় নিয়ে যাই। রাজসভায় রাজা ও অমাত্যবৃন্দ এর ভাবভঙ্গী দেখে আনন্দ পাবে—বিদূষকবেশী এই বহুরূপীকে দেখে আমিও হাসি সম্বরণ করতে পারি নাই। তাই সবাই যাতে আনন্দ পায় সেইজন্য রাজসভায় একে নিয়ে এলাম।

শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপীর দিকে চেয়ে বললেন ওহে বহুরূপী ভাই, তোমার যা রূপ, ঐ রূপ দেখেই লোকের হাসি পায়, তার উপর তোমার যা ভাবভঙ্গী লোক হাসানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বহুরূপী ভাই তুমি সবার সামনে আমাকে বহুরূপী কেন বললে? বহুরূপী তো তুমিই সেজেছ ভাই—আমাকে আবার দলে টানছো কেন? কৃষ্ণের কথা শুনে বিদূষকবেশী বহুরূপী সঙ্গে সঙ্গে আপন ভাবভঙ্গী পরিবর্তন করে বললেন,—'আজ তো আপনি দ্বারকার সবার হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাজ করছেন। পুরনো দিনের কথা ভুলে গেছেন। মনে মনে একবার আপনার পুরনো রূপের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করুন প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ—''আমি সব সময়ই একরূপ ও একরসে নিবাস করি। তোমার মত ঘন ঘন রূপ বদলিয়ে বহুরূপী সাজা আমার অভ্যেস নেই।''

—আমি যদি আপনার পুরনো রূপরস ধারণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিই তাহলে খারাপ কিছু ভাববেন না তো? শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'না না, খারাপ কিছু ভাববো না—তুমি পারলে স্মরণ করিয়ে দাও

আমি কখন কখন বহুরূপ ও রসের আশ্রয় থেকে তোমার মত বহুরূপী সেজেছিলাম।'

বিদূষকবেশী বহুরূপী তখন বলতে শুরু করলেন শ্রীকৃষ্ণের নবরস সমৃদ্ধ বহুরূপী লীলা নাট্যকথা, 'হে প্রভু, আপনি মৎস্যরূপ ধারণ করে করুণরস প্রদর্শন করেছেন, কূর্মরূপ ধারণ করে অদ্ভুতরসের বিকাশ করেছেন, বরাহরূপে বীভৎরস, বামনরূপে হাস্যরস, নৃসিংহরূপ ধারণ করে ভয়ানকরস, পরশুরাম রূপে রৌদ্ররস, রামরূপে বীররস প্রদর্শন করেছেন। হে দীনবন্ধু দ্বারকাধীশ, আপনি তো ভগবান। অনেক অনেক লীলাও করেছেন। আপনি তো রসরাজ, সমস্ত নবরস আপনি আমার কাছেই রেখেছেন। আমি তো কেবল পেট চালানোর জন্য একটি রস হাস্যরসের আশ্রয় নিয়েছি। অতএব আপনি আমায় দেখে কেন হাসছেন প্রভু?

পরম পবিত্র নবরস তোমার অধীন।
শুধু এক হাস্যরসের আশ্রয় নিয়েছে এ দীন।।

বহুরূপীর বলা শেষ না হতেই কৃষ্ণ বললেন, 'ঠিক আছে; আমি না হয় সমস্ত রস নিয়ে রেখেছি কিন্তু তুমিও তো বহুরূপী সেজে শৃঙ্গাররস চুরি করে নিয়েছো?

একথা শুনতেই বিদূষকবেশী বহুরূপী সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকরূপ বদল করে মনোহর গোপীরূপ ধারণ করে শৃঙ্গার রস প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন। সভাস্থ সব লোক তা দেখে হেসে লুটোপুটি। গোপীরূপী বহুরূপী পালা করে মাখন চুরির কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন। দ্বারকার রাজসভা তা শুনে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলো। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আপন কণ্ঠের বহুমূল্য মোতি রত্নহার বহুরূপীকে দিয়ে দিলেন। বহুরূপী তা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে রত্নমালার প্রতিটি দানা ভেঙে ভেঙে দেখলেন এবং কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন—

মোতি রত্নমালায় নাহি মোর কাম।
আমি চাই তব প্রেম-তব নাম।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি বড় চতুর অভিনেতা, বহুরূপীভাই।' বহুরূপী বললেন—ঠিক আছে প্রভু—আমি তাহলে এখান হতে খালি হাতেই ফিরে যাই। যাওয়ার সময় দ্বারকার রাজপথের অলিতে গলিতে চীৎকার করে বলে যাবো দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধুর হৃদয়ে রত্নভাণ্ডার খালি হয়ে গেছে। আমার মতো দীন দরিদ্র যারা তাদের তিনি আশীর্বাদ করতেও ভুলে যান। বহুরূপীর মুখের কথা শেষ না হতেই শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপীকে কাছে ডাকেন। বহুরূপী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কৃষ্ণের শ্রীচরণ দুটি চেপে ধরেন এবং নয়নের জল দিয়ে ধুয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপীর মাথায় পদ্মহস্ত রেখে আশীর্বাদ করেন, তারপর একসময় শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপীকে চরণ থেকে তুলে বুকে চেপে ধরেন—সারা রাজসভা হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। চমকে ওঠেন সবাই। বলরাম, উদ্ধব এবং অন্যান্য সকলে প্রেমচক্ষে দেখেন ধনুর্ধারী শ্রীরাম আপন ভক্ত হনুমানকে হৃদয়ে চেপে ধরে আছেন। সেদিন থেকে ভক্ত-ভগবানের মিলনকে কেন্দ্র করে দ্বারকাবাসীর মুখে মুখে ঘোষিত হয় দুই লাইনের একটি গান—

ভক্তকে ভালোবেসে পুরস্কার তুমি যা দিলে প্রভু—
জগৎ মাঝারে তাহা, পায় নাই কেহ কভু।।
সেই বহুরূপীরে সবাই ধিক্কার জানায়।
যে কখনও আসেনি কৃষ্ণের দরজায়।।

মুক্তি কাঁদে বৃন্দাবনে

বৃন্দাবনের কোলে মুক্তি কেঁদে গড়াগড়ি যায়।
মুক্তি বলে হে মাধব কি হবে মোর মুক্তির উপায়।।

একবার দেবর্ষি নারদ বৃন্দাবনের ধূলায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে কাঁদছেন। তা দেখে মহাত্মারা জিজ্ঞাসা করছেন, —নারদ তুমি কাঁদছো কেন? তুমি পরম বৈষ্ণব, ভক্ত চূড়ামণি, জ্ঞানী, বিদ্বান, তোমার এভাবে কান্না শোভা পায় না। নারদ বললেন, আমি নিজের জন্য কাঁদি নাই। আমি কাঁদছি সেইসব যোগীঋষি, সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য-যারা ব্রজে না এসে ব্রজের প্রেম আস্বাদন না করে, কৃষ্ণের মোহন মুরলীর ধ্বনি না শুনে সাধন ভজন করছে তাদের জন্য। আমি কাঁদছি, ভাবছি ব্রজরস বিনা, প্রেমাশ্রু বিনা কেমন করে সেইসব যোগীঋষি, সাধুসন্ন্যাসীদের মুক্তি হবে? দিনরাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নয়নে চিরবর্ষার ধারার মত অশ্রু ঝরবে—আর সেই অশ্রুর আবরণে জগৎ অদৃশ্য হয়ে শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেখবে—পরিণামে তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। ''ব্রজগোপী অনুগতি বিনে''—''সাধন ভজন সকলি অসার— গোপী পদে হলে রতি মেলে কৃষ্ণ উপহার।''

মহাত্মারা জিজ্ঞাসা করেন—তুমি যে গোপী অনুগত হয়ে সাধন করতে বলছো সে সাধন কি? নারদ বললেন—তবে শোন এক কাহিনী, যা শুনলে তোমরা সকলেই বুঝতে পারবে গোপী অনুগত হয়ে কৃষ্ণ সাধন কি? এই বলে নারদ শুরু করলেন ব্রজের এক কাহিনী—''একবার কয়েকজন মহাত্মা ব্রজধামে প্রবেশ করে যমুনার তীরে বসে ব্রহ্ম কি? পরমাত্মা কি? জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ব্রহ্মের ঐক্য কোথায়? মোক্ষ কি? ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় সেখানে কয়েকজন গোপী জল নিতে এল এবং তারা কান পেতে শুনলো মহাত্মারা কি আলোচনা করছেন। তারপর জল নিয়ে যখন তারা গৃহ অভিমুখে রওনা দিল তখন পথে এক গোপী অন্য গোপীকে জিজ্ঞাসা করছে সখী, এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা এইসব কি?

উত্তরে অন্য গোপী বলছেন—মনে হয় আমাদের নটখট কানাইয়ের কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয় হবে। সখী এর বেশী আমি কিছু বলতে পারবো না—ওইসব সাধুবাবারা এইসব নিয়ে আলোচনা করছিল-ওরা হয়তো সব জানে। আমরা শুধু জানি কানাই আমাদের প্রাণ—তাঁর সুখেই আমাদের সুখ, তাঁর আনন্দেই আমাদের আনন্দ। তখন আর এক গোপী বলছেন—ওনারা মুক্তি না মোক্ষ কি সব বলছিল সেটা কি জিনিসরে গোপী? উত্তরে তখন সেই গোপী বলছেন আমাদের কানাই-এর মায়ের বাড়ীতে অনেক দাসী কাজ করে তো—মনে হয় তাদেরই একজনের নাম হবে।''

নারদের মুখে ব্রজের কাহিনী শুনে সাধু মহাত্মারা নিরুত্তর। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর সাধু মহাত্মার দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেন—''হে মহাত্মন গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব সেই ভাব সাধনের নাম কি? নারদ বললেন—অকৈতব প্রেম। এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ।'' মহাত্মারা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা যারা জ্ঞানমার্গী সাধক ব্রহ্মের সাথে নিজেকে এক এবং অভিন্ন ভাবি তাদের পক্ষে দ্বৈতভূমিতে নেমে এই প্রেম কি লাভ করা সম্ভব? নারদ বললেন, ''উদ্ধব কৃষ্ণ নির্দেশে মধুরায় এসেছিলেন কৃষ্ণবলরামের কুশল সংবাদ দিতে এবং নন্দ-যশোদার, গোপ-গোপী-গোঠের সখাদের কুশল সংবাদ নিতে। কৃষ্ণ বলরামের বিরহে ব্রজবাসীদের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা হচ্ছে সেই যন্ত্রণাহত হৃদয়ে উদ্ধব যেন কুশল সংবাদদানে একটু শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয় এটাই ছিল কৃষ্ণের বিশেষ নির্দেশ। কিন্তু উদ্ধবের ছিল জ্ঞানের অহংকার। তাই সে জ্ঞানের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্রজে যমুনার তীরে পৌঁছে, যে সমস্ত গোপী যমুনায় জল ভরে ব্রজের দিকে ফিরছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলো —'নন্দবাবার বাড়ী কোনটা? আমি কৃষ্ণের খবর নিয়ে মথুরা থেকে আসছি। গোপীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে

বললো—হে পথিক ক্ষমা করো; তুমি যে ব্রজধামে নবীন আগন্তুক তা আমরা বুঝতে পেরেছি। উদ্ধব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—''কেমন করে আপনারা বুঝলেন আমি ব্রজে নবাগত?''

গোপীরা বললেন, 'ব্রজে যারা বাস করে তারা কেউ নন্দবাবার বাড়ী কোথায় একথা জিজ্ঞাসা করে না।' উদ্ধব লজ্জায় ঘাড় নত করলেন। তা দেখে গোপীরা বললেন, 'হে পথিক তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো—লক্ষ্য করে দেখ তার পাশ দিয়ে এক জলধারা বয়ে যাচ্ছে। ঐ জলধারা ধরে অগ্রসর হয়ে যেতে থাক—যেতে যেতে যেখানে গিয়ে খুঁজে পাবে এই জলধারার উৎপত্তি স্থান—সেটাই আমাদের নন্দ মহারাজার বাড়ী। মনে রাখবে এটা কোন বর্ষার বা নদীর জলধারা নয়—এই জলধারার জন্মস্থান যেখানে সেটাই নন্দমহারাজের বাড়ী। এ জলধারা নন্দ যশোদার অশ্রুধারা এবং তাদের গাভী সকলের অশ্রুধারা। গোঠের সখাদের অশ্রুধারা, ব্রজগোপীদের অশ্রুধারা।'

উদ্ধব গোপীদের মুখে শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন নন্দালয়ের দিকে। মিলিত হলেন সবার সঙ্গে। গোঠের সখাদের সাথে, রাধাসহ ব্রজগোপীদের সাথে, নন্দ যশোদার সাথে। উদ্ধব গিয়েছিলেন জ্ঞানের বোঝা মাথায় নিয়ে, ফিরলেন-প্রেমের দীক্ষা নিয়ে। ভাষা নিয়ে এসেছিলেন, ভাব নিয়ে ফিরে গেলেন। জ্ঞানী বিদ্বান হয়ে এসেছিলেন-প্রেমী হয়ে ফিরে গেলেন। গুরুভাব নিয়ে এসেছিলেন—গোপীদের শিষ্য হয়ে ফিরে গেলেন।

মহাত্মারা নারদের মুখে সব শুনে বললেন, 'এই প্রেম লাভ করার উপায় কি?' নারদ বললেন, 'গোপীচরণ পরশ-ধন্য ব্রজের রজ গায়ে-মাথায় মেখে গোপীদের শরণ নাও। প্রেমেই মুক্তির মুক্ত আনন্দ বিচরণ করে। সে আনন্দ আস্বাদনের জন্য মুক্তি ও এখানে প্রেমে বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। এই বলে নারদ 'জয় গোপী-জয় রাধে-জয় মাধব হরি' বলতে বলতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

মহাত্মারা ও হাগোপী-হাগোপী চরণে স্থান দাও বলে আকুলিত অন্তরে প্রার্থনা শুরু করলেন। তাদের প্রার্থনায় গোপীশ্বরী রাধারাণী প্রকট হয়ে মহাত্মাদের দর্শন দিলেন। বললেন, 'বল কি চাও তোমরা।'

মহাত্মারা বললেন, 'মাগো, একবার গোপীমণ্ডলের মাঝে তুমি শ্যামকে নিয়ে যুগলে দাঁড়াও, আমরা দর্শন করে মানব জন্ম সফল করি।'

রাধারাণী বললেন, 'তোমরা মুক্তি চাও না?' মহাত্মারা বললেন, 'মুক্তি, সে তো গোবিন্দ সেবা থেকে দূরে সরে থাকার এক যুক্তি বা উপায় ছাড়া কিছুই নয়—আমরা তা চাই না। আমরা গোপী অনুগত হয়ে তোমাদের যুগলের সেবা অধিকার পেতে চাই।'

রাধারাণী বললেন, 'বেশ, তবে তাই হোক এখন তোমরা গোপীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত আমাদের যুগলরূপ দর্শন কর।'

রাধারাণীর অঙ্গ হতে অজস্র গোপীদেহ নির্গত হল এবং তারা মণ্ডলাকারে রাধারাণীকে পরিবেষ্টন করতেই শ্যামসুন্দরও রাধার হৃদয় হতে নির্গত হয়ে রাধার দক্ষিণপার্শ্বে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে দাঁড়ালেন।

মহাত্মারা সেই মূর্ত্তি দর্শন করে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। মুক্তির সাধক যুক্তি হারিয়ে ভক্তিতে পড়লেন লুটিয়ে যুগলচরণে।

যশোদার ভাবনা

রোজ রোজ গোপালের নামে নালিশ শুনে মা যশোদার কান ঝালাপালা। 'যশোদা মা তোমার গোপালকে একটু শাসন করো। নইলে আর তো পারি না।'

—কেন কি হয়েছে কি?

—তোমার গোপাল আমাদের ঘরে ঢুকে ননী চুরি করেছে। ভাঁড় ভেঙে দিয়েছে।

—আর কি করেছে আমার গোপাল—বল বল সব বল বাকী রাখিস না কিছু।

—গো দোহনের আগে বাছুর ছেড়ে দেয়। ঘরের ঘুমন্ত ছেলেগুলোকে চিমটি কেটে জাগিয়ে দেয়। গোপালের দৌরাত্ম্য অসহনীয় হয়ে উঠছে আমাদের কাছে—তুমি গোপালকে একটু শাসন করো যশোদা মা, নইলে বড় হলে ও আরও দুষ্টু হয়ে উঠবে?

গোপীরা রোজই সমবেত হয়ে এমনই ভাবে গোপালের নামে নালিশ জানায়।

যশোদা ভাবেন কী করি! কেমন করে আমার গোপালকে শান্ত করা যায়। কী করলে তাঁর এই বদ স্বভাবের পরিবর্তন হবে? একদিন যশোদা থাকতে না পেরে গোপীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোপাল তো আমার একার গোপাল নয়—সে তোদেরও গোপাল, তোরাই বলে দে না গোপালকে কী করে শান্ত করা যায়।' গোপীরা বললেন, 'এক কাজ করো নন্দরাণী, তুমি তোমার গোপালকে পাঠশালায় ভর্তি করে দাও। দেখবে পড়তে পড়তে ওর দুষ্টুমি ভাব চলে যাবে।'

কথাটা মন্দ বলিস নাই, আমিও সে কথা যে ভাবি নাই তা নয়। কিন্তু গোপালটা এমন দুষ্টু সে কি পাঠশালায় পড়তে রাজী হবে?

ইতিমধ্যে গোপাল শয্যাত্যাগ করে ঘুম ঘুম চোখে হাই তুলতে তুলতে এবং চোখ রগড়াতে রগড়াতে মায়ের কাছে এসে হাজির হল। গোপীরা গোপালের ঘুম ঘুম মুখের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে আনন্দ-আপ্লুত চিত্তে আপন আপন বাড়ী ফিরে গেল।

গোপাল এসে মায়ের কোলে বসে। যশোদা গোপালাকে আদর করে বলেন— গোপাল তুমি তো এবার বড় হয়েছো? গোপাল বলে,—'হু—তা কি করতে হবে?' যশোদা বলেন, 'ভাবছি এবার তোমায় পাঠশালায় ভর্তি করে দেব। সেখানে তুমি লেখাপড়া শিখবে।' অবোধ শিশুর মত ভান করে গোপাল মা যশোদাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, পাঠশালা, লেখাপড়া এসব কি জিনিস মা—এখানে বুঝি ভালো ননী, মিছরি পাওয়া যায়?

—শোন ছেলের কথা, ননী-মিছরী ছাড়া তুই কি কিছুই জানিস না বাবা?

—পাঠশালায় শাস্ত্র পড়ানো হয়। তুই পাঠশালায় ভর্তি হয়ে শাস্ত্র পড়বি।

—শাস্ত্র পড়ে কি হবে মা?

—তত্বজ্ঞান হবে।

—কোন তত্বের জ্ঞান হবে মা?

—ভগবান তত্বের জ্ঞান হবে।

—ভগবান কি মা?

—ভগবান সর্বব্যাপী। সবার অন্তর্যামী।

—সর্বব্যাপী সবার অন্তর্যামী ভগবান কে?

—উনি ত্রিভুবন পতি।

—তোমার হাতের মাখন-মিছরী ছেড়ে তাকে জেনে আমার কি লাভ?
—তাঁকে জানলে জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য লাভ হয়।
—তাতে আমার কি লাভ হবে মা?
—তুই তাঁকে জেনে মোক্ষ লাভ করবি।
—আমার ঐ লাভের কোন ইচ্ছাই নেই।
—তবে তোর ইচ্ছাটা কি শুনি?
—আমার তো দই মাখনই খেতে ইচ্ছা করে মা।
—ভালো কথা, কিন্তু আমাদের ঘরে তো দই মাখনের অভাব নেই, নিজের ঘরের দই, মাখন যত খুশি খা-বন্ধুদের খাওয়া, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু লোকের ঘরে চুরি করে খাস কেন? জানিস না এতে তোর স্বভাব দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ব্রজের গোপীরা তোকে চোর বলে—এতে তোর লজ্জা হয় না?
—তোমার ঘরে চুরি করে খেতে যখন লজ্জা হয় না, তখন ওদের ঘরে চুরি করে খেতে কেন লজ্জা হবে মা? তুমি আর গোপীরা কি আলাদা? ওদের ঘর তোমার ঘর কি এক নয় মা?
—মানছি তোর কথা না হয় সত্য—কিন্তু বাবা, তুমি দিন দিন বড় হচ্ছো-এরপর তোমার বিয়ে হবে-এখন থেকে যদি চোর বদনাম রটে যায় তাহলে কেউ কি তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে! চোরকে কেউ জামাই করতে রাজী হবে না—সেটা তো ভাবতে হবে?
—ও নিয়ে তুমি কিচ্ছু ভেব না মা। দেখবে ননী চুরির মতো একদিন তোমার গোপাল মেয়ে চুরি করে এনে তোমার ঘরের বউ করে দেবে।
গোপালের কথা শুনে মা হেসে ফেলেন। আর কিছু বলতে পারেন না।
ইতিমধ্যে গোপালের সখারা যশোদার অঙ্গনে এসে হাজির। হল। গোপাল তাদের সঙ্গে খেলতে চলে গেল। যশোদা ভাবেন, হায় গোপাল আমার বড় হয়ে কবে নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে।

ঘোড়া ঘোড়া খেলা

মা যশোদা উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন—দুধ ঘন হতেই উনুন থেকে দুধ নামিয়ে তাতে মিছরী চূর্ণ করে মিশিয়ে দিলেন। গঙ্গী নামে এক গাভীর দুধ গোপাল খেতে খুব ভালোবাসে। তাই মা সকাল হতেই স্নান করে শুভ্র রেশমী বস্ত্র পরে গঙ্গী-গাভীর দুধ জ্বাল দিয়ে তাতে মিছরী মিশিয়ে তা ঠাণ্ডা করার জন্য একটি শীতল জলের পাত্রে দুধভর্তি বাটিটা ডুবিয়ে রেখে গোপালকে ডাকছেন, গোপাল আয় বাবা দুধটুকু খেয়ে যা।

গোপাল খেলায় মত্ত সাথীদের সঙ্গে। মায়ের কথা কানে তোলেই না। গোপালের অগ্রজ বলরামের মা রোহিনী এবং অন্যান্য গোপীরা গোপাল ও তার সঙ্গীদের খেলা দেখছেন—তাদের নানারকম রঙ্গে গোপীরাও বিভোর—আনন্দরসে অবগাহন করছেন।

গোপাল কখনও ঘোড়া ঘোড়া খেলছে। সখারা কেউ ঘোড়া সেজে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে—আর গোপাল তার পিঠে চড়ে বলছে, 'এই ঘোড়া চল চল আরও জোরে চল।' তার ছোট্ট মুঠিকে চাবুক করে মৃদু মৃদু আঘাত করছে—কখনও বা গোপাল ঘোড়া সেজে সখাদের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে উঠোন জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে—তা দেখে ব্রজগোপীরা হেসে লুটিয়ে পড়ছে। কখনও বা সখাদের পিঠে করে চাপিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গোপাল হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে—তা দেখে সখারা সব বলছে ঘোড়া ভালো নয়। ঘোড়া খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে। এমন সময় মা যশোদা সেখানে উপস্থিত হয়ে ধূলা ঝেড়ে গোপালকে কোলে নিয়ে বলছেন, 'বাবা গোপাল, তোমার দাদা বলরাম তার সাথীদের সঙ্গে যমুনার তীরে খেলতে গেছে-এখুনি এসে পড়বে। তোমার জন্য যে গঙ্গী গাভীর দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছি—তা দাদা এসে খেয়ে নেবে। তাই বলছি দাদা আসার আগে তুমি দুধটুকু খেয়ে নেবে চল। তারপর এসে বন্ধুদের সাথে খেলবে, কেমন?'

গোপাল বলে, 'এখন আমি দুধ খাবো না। আমার এখন দুধ-খিদে পায়নি। এখন আমার খেলা-খিদে পেয়েছে—এখন শুধুই খেলবো।'

—বেটা গোপাল শোন, দুধ খেলে তোমার গায়ে শক্তি হবে। তোমার রঙ তো কালো—দুধ খেলে ফর্সা হয়ে যাবে।

—আর কি হবে মা?

—তোমার মাথার চুলগুলো তো খুব ছোট, দুধ খেলে তোমার চুলগুলো সব বড় হয়ে যাবে। চল দুধটুকু খেয়ে নেবে চল। গোপাল মা যশোদার কথায় ভুলে মায়ের কোলে চেপে দুধ খেতে যায়।

মা গোপালকে দুধ খাওয়ায়। গোপাল এক ঢোঁক করে দুধ খায় আর দেখে তার গায়ের রঙ দাদার মতো গৌরবর্ণ হয়েছে কিনা—আবার এক ঢোঁক খায় আর দেখে মাথার চুল বাড়ছে কিনা—দু-এক ঢোঁক খেয়ে গোপাল মায়ের চালাকি বুঝতে পেরে মায়ের কোল থেকে সহসা লাফিয়ে পড়ে এক দৌড়ে সখাদের কাছে গিয়ে বলে, ''নে শুরু কর—ঘোড়া ঘোড়া খেলা।''

গল্প শোনে গোপাল

সন্ধ্যার আকাশে উঠেছে চাঁদ। মা যশোদা দধি মন্থন করছেন। এমন সময় গোপাল চুপি চুপি এসে পিছন দিক থেকে মায়ের চুলের গোছা টেনে ধরে।—'আরে ও লালা ছাড় ছাড়, মাথায় লাগছে'। মা ঘুরে গোপালকে ধরতে যান গোপাল অন্যদিকে সরে মায়ের চুল টানতেই থাকে। তখন মা পিছু ঘুরে গোপালকে চেপে ধরে কোলে তুলে নেন। গোপালের মুখ চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়ে মা জিজ্ঞাসা করেন—কিরে লালা মাখন খাবি?

গোপাল বলে, 'না'।

—তবে তোর কি চাই? হাতী না ঘোড়া?

গোপাল আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলে, 'মা আমি ঐ চাঁদ-খেলনাটা নেব।

যশোদা বলেন, বেটা ওটা খেলনা নয়।

—ওটা তবে কি মা?

—মাখনের ডেলা। ওটা খাওয়ার জিনিস, খেলনা নয়।

—মা, আমি তাহলে ঐ মাখনের ডেলাটাই খাবো—অন্য খাবার আজ খাবো না। গোপাল কাঁদতে শুরু করে। মায়ের কাপড়ের আঁচল ধরে টানে, কখনও বা চুল ধরে টানে, কখনও কচি কচি দুটি হাত দিয়ে মায়ের মুখটি চেপে ধরে। মা বলেন—ছাড় ছাড় গোপাল।

গোপাল বলে, 'মা আমি ওটাই খাবো।' মা বলেন,—ঐ মাখনটাই খাবি?'

—তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছো ওটা মাখন নয়।

—নারে বেটা ওটা মাখনের ডেলা।

—আচ্ছা মা, কত গাই দুধ দিয়েছে তবে ঐ মাখনের ডেলাটা হয়েছে?

—বেটা গাইয়ের দুধে এ মাখনের ডেলাটা তৈরী হয় নাই।

—তবে কি করে ঐটা মাখনের ডেলা হল?

—ভগবানের যে ক্ষীরসাগর আছে সেই ক্ষীরসাগর থেকে এই মাখনটা তৈরী হয়েছে।

—আচ্ছা মা, দুধের বুঝি সমুদ্র হয়?

—হ্যাঁ বেটা দুধের সমুদ্র হয়।

—আচ্ছা মা, কততো গাই দুধ দিলে তবে দুধের সমুদ্র হয়?

—গাইয়ের দুধে এ সমুদ্র হয় না বাবা। যে ভগবান গাই-এর স্তনে দুধ দিয়েছেন সেই ভগবানই এই ক্ষীর সমুদ্র বা দুধের সমুদ্র তৈরী করেছেন।

—তাহলে তো মা ঐ মাখনটা খেতে খুব মিষ্টি হবে? মা আমি ওটাই খাবো—আমাকে তাড়াতাড়ি ওটা আকাশ থেকে নামিয়ে এনে খাইয়ে দাও।

—না বাবা, ওটা খেতে নেই।

—কেন কেন মা?

—দেখছ না ওই মাখনের ডেলাটার গায়ে কেমন কালো কালো দাগ।

—হ্যাঁ মা—কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে—ঐ গুলো কি মা?

—ওগুলো বিষের দাগ বাবা। ঐ মাখনের ডেলাটার সারা গায়ে বিষের কালো কালো দাগ লেগে আছে-ও মাখন খেতে নেই। ও মাখন কেউ খায় না তুমিও খেতে চেয়ো না, কেমন?

—মা ঐ মাখনের ডেলাটা তো আকাশে গায়ে লেগে আছে, ওতে বিষ কে লাগাল মা।

বাবা শোন তবে সে এক গল্পকথা। আমি যেমন দধিমন্থন করে ননী বের করি। তেমনি একবার দেবতা ও অসুরেরা মিলে সমুদ্র মন্থন করে সেই মন্থন থেকে বিষ বেরিয়ে আসে।

—তারপর?

মা গোপালকে সমুদ্র মন্থনের কাহিনী শোনাতে থাকেন। গোপাল সে কাহিনী শুনতে শুনতে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

কৃষ্ণরূপে শুধুই নিমন্ত্রণ

ব্রজের এক নবীনা গোপবধূ। সবার মুখে শোনে সে কৃষ্ণকথা। তার অন্তরে জাগে কৃষ্ণ দর্শনের ইচ্ছা। কিন্তু বাদসাধে শাশুড়ি। নবীনা বধূকে ডেকে শাশুড়ি বলে, দেখ বউ, ঘরের মধ্যে থেকে যা খুশি করিস, কিন্তু ভুলেও যেন ঘরের বাইরে পা দিয়ে নন্দের বেটাকে নয়ন ভরে দেখিস না। বধূটি জিজ্ঞাসা করে—''নন্দের বেটাকে নয়নভরে দেখলে কি হবে মা?

—কি আর হবে। ঘরের সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। যাই হোক তুমি যেন ভুলেও নন্দের বেটাকে দেখার চেষ্টা করো না। সবে নতুন বধূ হয়ে এসেছে, তাই শাশুড়ির আদেশ সে অমান্য করতে পারে না কিন্তু বাড়ীর মধ্যে সে যেখানেই কানপেতে বসে সেখানেই শুনতে পায় নন্দের বেটাকে নিয়ে আলোচনা।

বৃন্দাবনে যেন কানু ছাড়া গীত নাই। প্রতিটি গোপী, গোপবালকের আলোচনার বস্তু নন্দের বেটা। একদিন বধূটি ভাবছে শাশুড়ি তো আমাকে নন্দের বেটাকে দেখতে নিষেধ করলো কিন্তু আমার অন্তর তাঁকে দেখার জন্য এত ছটফট করছে কেন? শ্যামসুন্দর যখন ধেনু ও বৎস নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে আসে এবং আমাদের বাড়ীর সামনে পথ দিয়ে যায় তখন শাশুড়ি এসে সামনে দাঁড়িয়ে শ্যাম দরশনে বাধা দেয়। আমার সারা অন্তর ছটফট করে মারে। সারা জগৎ যাঁর গুণ গায় সেই শ্যাম দরশন আমার কবে হবে—কবে একবার শুধু নয়নভরে সেই শ্রীমুখ দর্শন করবো। দুনিয়া যাঁর যশ গায় তাঁর রূপ কেমন একবার নয়নভরে দেখতে ইচ্ছা করে। কী এমন আছে যা দেখলে সংসারের কাজ, সংসারের সব কিছু ভুল হয়ে যায়। শ্যাম দরশনের জন্য তার হৃদয়ের বেদনা একদিন অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছায়, এমন সময়ে শাশুড়ি এসে নয়নের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, বউ, আমার দিকে তাকিয়ে থাক, আর কোনদিকে ভুলেও তাকাবি না।

বধূটির অন্তরের বেদনা শ্যামসুন্দর জানতে পারেন। তিনি যেন অন্তর্যামী দয়ালু ভক্তবৎসল। তাই একদিন শ্যামসুন্দর বধূটিকে কৃপা করবার জন্য চুপিচুপি এসে বধূটির পিছনে দাঁড়ালেন। বধূটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে শাশুড়ি। শাশুড়ির চোখে চোখ দিয়ে বসে আছে বধূটি। এমন সময় শ্যামসুন্দর চুপিচুপি পিছনে এসে দাঁড়াতেই —শাশুড়ির দুই চোখের মণিতে প্রতিবিম্বিত হল শ্যামসুন্দরের মনোহর রূপমাধুরী। বধূটি শাশুড়ির নয়নের তারায় শ্যামসুন্দরের ছবি ভাসতে দেখে বলছে, 'হায়! হায়! কতদিন কতমাস এই রূপদর্শনে বঞ্চিতা হয়েছিলাম। আমার অতীত দিনগুলি সব বৃথাই গেল। হে বিধাতা, একবার ঐ অতীতের দিনগুলিকে পুনরায় আমার বাকী আয়ুর সঙ্গে জুড়ে দাও। আমার শ্যামদরশন বিনে হারানো দিনগুলি ফিরিয়ে দাও ঠাকুর ফিরিয়ে দাও। নয়নের তারায় ভেসে ওঠা রূপ যদি এত সুন্দর হয়—তবে না জানি ওইরূপ নয়নের সামনে দেখলে আরও কত সুন্দর লাগবে'—এই বলে বধূটি ঘাড় ঘুরিয়ে সেই শ্যামরূপ দর্শন করলো অমনি শ্যামরূপে চিত্ত নিবিষ্টা হয়ে বধূটি চিরকালের জন্য শ্যামসুন্দরের হয়ে গেল।

শাশুড়ি ভাবলেন আমার সব চেষ্টা বিফলে গেল। পরের দিন শাশুড়ি যখন দেখলেন শ্যামসুন্দর আবার তাদের বাড়ীর দিকেই আসছে তখন বউকে ডেকে বললেন, বউ তুই রান্নাঘরে যা। রান্নাঘরে অনেক কাজ বাকী আছে। উদ্দেশ্য : বউ যেন ঘরের বাইরে না থাকে। শাশুড়ির নির্দেশে বউ উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠেছে—তার সমস্ত লজ্জা তখন পালিয়েছে। বধূটি তখন শাশুড়িকে বলছে—''মা আজ আপনি যদি আমার শ্যাম দরশনে বাধা দেন তাহলে সে বাধা মেনে আমি ঘরেই রয়ে যাবো। আজ আপনার আদেশ আমি অমান্য করবো না। কিন্তু আগামী কাল যদি আপনার মনে এরূপ আদেশ দেওয়ার ইচ্ছা জাগে, তবে আপনি আর ভুলেও আমাকে ঘরে খুঁজবেন না। শ্যামসুন্দরের গলে যে বনমালা শোভা পাচ্ছে, আমি সেই বনমালার আশেপাশে ভ্রমরীরূপে গুনগুন স্বরে শ্যামের যশোগান করে উড়ে উড়ে বেড়াবো।'

বধূর কথার তাৎপর্য্য হল : আজ যদি যদি আমার শ্যামদর্শন না হয় তাহলে আমার প্রাণভোমরা আর এই দেহে থাকবে না—সে দেহত্যাগ করে বেরিয়ে যাবে শ্যামসুন্দরের বনমালার সুগন্ধ আস্বাদনের জন্য।

ননীচোর কানাই

একদিন কানাই ব্রজের এক গোপীর বাড়ী প্রবেশ করেছে। উদ্দেশ্য ননীচুরি। গোপীর ঘরে ঢুকে শিকেয় থেকে ননীর ভাঁড় নামিয়ে যেই ভাঁড়ের ভেতর হাত ঢুকিয়েছে অমনি সেই গোপী এসে পড়েছে। কানাইকে দেখে গোপী জিজ্ঞাসা করছে, 'এই ছোঁড়া তুই কে রে?'

—আমি বলরামের ছোট ভাই কানাই।

—এখানে কি দরকার?

—নিজের ঘর মনে করে এখানে চলে এসেছি।

—তা ঠিক আছে, ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু ঘুমন্ত ছেলের গায়ে হাত দিয়ে চিমটি কাটছিস কেন?

—আজ বাছুরগুলো কোনদিকে চরাতে নিয়ে যাবো; তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়ার জন্য ওকে চিমটি কেটে ঘুম থেকে জাগাচ্ছিলাম।

—আচ্ছা, সে না হয় হল, ননীর ভাঁড়ে হাত ঢুকিয়েছিস কেন?

—আমার একটা বাছুর হারিয়ে গেছে, তাই তোমার এখানে খুঁজছি। তুমি ভুলেও ভেব না—গোপী মাসি, আমি তোমার ঘরে ননী চুরি করতে এসেছি।

—বাছুর খুঁজছিস? ননীর ভাঁড়ে?

—হ্যাঁগো মাসি। এই দেখ না বলতে বলতে কানাই এক ডেলা ননীকে হাতে করে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা বাছুরের মত আকৃতি করে গোপীকে দেখায় এবং দেখিয়ে বলে, যাক মাসী আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেছি এখন আমি আসি। বাবা এটা মধুবন থেকে আমায় এনে দিয়েছিল। এই বাছুরটা এমন দুষ্টু না মাসি, কেবলই আমার হাত থেকে ছিটকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। যেখানেই ননীর ভাঁড় দেখতে পায়, সেখানেই গিয়ে লাফিয়ে পড়ে, ফলে একে খুঁজে বের করতে আমার খুব কষ্ট হয়। আচ্ছা মাসি, এখন আমি আসি—এই বলে কানাই গোপীর বাড়ী থেকে ননী খেতে খেতে বেরিয়ে গেল।

বাকপটু কানহাইয়া

ব্রজের এক গোপী চলেছে মথুরার হাটে ননী বিক্রী করতে। হৃদয়ে তার কৃষ্ণ চিন্তা। কৃষ্ণের দিব্যরূপ মাধুরীর ধ্যানে তন্ময় চিত্তা গোপী বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—তাই ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে হাটে প্রবেশের আগেই সে পথ চলতে চলতে চীৎকার করে বলছে, 'মাধব চাই মাধব, মাধব নেবে গো...।' গোপী বলতে চেয়েছিল, ননী চাই, ননী নেবে গো...। তা না বলে সে বলছে, 'মাধব চাই—মাধব।' আপনভোলা গোপী ননীর পরিবর্তে মাধব বেচতে চলেছে। গোপীর অন্তর জুড়ে মাধব বাস করে। তাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিককে সে ভাঁড়ে ভরে বেচতে চলেছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর গোপীর হুঁশ পর্যন্ত নেই যে, সে কী বলছে।

নন্দলাল তা শুনতে পেয়ে ভাবছে—আরে এ গোপী বলে কি? মা-ধ-ব নাও-মাধব। মা-ধ-ব চাই। এ যে দেখছি আমাকেই বিক্রী করতে চলেছে। ছুটতে ছুটতে রাস্তার মাঝে গিয়ে গোপীকে আটকে বলছে—''আরে ও ননীওয়ালী! শোন আমি গোকুলের রাজা। আগে আমাকে একটু ননী তো দিয়ে যা।'' গোপী নন্দলালকে সামনে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়। তাঁকে নিয়ে মস্করা করতে ইচ্ছা জাগে। তাই সে নন্দলালকে বলে—''আরে নটখট কানহাইয়া, তুই কি করে গোকুলের রাজা হলি? গোকুলের রাজা তো বলরাম। ননী যদি খাওয়াতেই হয় তো তাকেই খাওয়াবো। নন্দবাবা না জানি কোথা থেকে এই কেলটে ছোঁড়াটাকে এনেছে। নন্দবাবা ফর্সা আর তুই তো নিকষ কালো। কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছে রে তোকে?'

কানহাই রেগে গোপীর আঁচল চেপে ধরে। গোপী বলে,—''ওরে ও লালা শাড়ী ছেড়ে দে—টানিস না, ননীর ভাঁড় মাথা থেকে পড়ে যাবে। মাটিতে পড়ে ভাঁড় ভেঙে গেলে ননী ধুলোয় মিশে নোংরা হয়ে যাবে। শাড়ীতে ও ননী লেগে শাড়ী মাখামাখি হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ঘরে ফিরে গেলে শাশুড়ি আমার গায়ের চামড়া আস্ত রাখবে না। এই বলে গোপী নিজশক্তিবলে কানহাইয়ার হাত থেকে শাড়ী ছাড়িয়ে নিয়ে আমার পথ চলতে শুরু করে। কিছুদুর গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে কানহাইয়া রেগে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে। গোপীর কষ্ট হয় তা দেখে, সে ফিরে আসে এবং কানহাইয়াকে খুশি করতে চেষ্টা করে। কানহাইয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে—''ও কানহাইয়া আমার ভুল হয়ে গেছে, এই নে ননী, যত খুশী খা। কথা শোন কানহাইয়া। এমন করে মুখভারী করে থাকিস না। ননী মিছরী যা চাইবি তাই পাবি। আচ্ছা বাবা, আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করছি। স্বীকার করছি তুই-ই গোকুলের রাজা—কিরে এবার খুশী তো'?

কানহাইয়া একবার বেঁকে বসলে তাঁকে খুশী করা কি এত সহজ! সে রেগে বলে—''আমি তোর কাছে ননী-মিছরী কিছুই চাই না। তুই পালা আমার কাছ থেকে।' গোপী কানহাইয়াকে খুশী করতে না পেরে ননীর ভাঁড় মাথায় নিয়ে পথ ধরে চলতে থাকে। কানহাইয়া উঠে দাঁড়ায়, পথ থেকে একটা পাথর তুলে নেয় এবং তা গোপীর মাথার ভাঁড় লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্য অব্যর্থ। গোপীর মাথার ভাঁড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কানহাইয়া তা দেখে ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে লুকিয়ে পড়ে। ওদিকে গোপী ও কানহাইয়া পিছু পিছু এসে হাজির যশোদা মায়ের কাছে অভিযোগ জানানোর জন্য। গোপী এসে বলে—ও যশোদা মা তুমি তো কানহাইয়াকে কোলে নিয়ে খুব আদর করছো।—দেখ ও আজ আমার কি দশা করেছে—ননীর ভাঁড় ভেঙে দিয়েছে, আমার সারা শাড়ীতে এবং গায়ে ননী লেগে কেমন মাখামাখি হয়েছ দেখ। তোমার ছেলে ভীষণ দুষ্টু হয়েছে—ওকে আদর না দিয়ে একটু শাসন করো।

মা যশোদা নালিশ শুনে কানহাইয়ার দিকে চাইতেই কানহাইয়া বলে মা—ঐ গোপীকে দেখে আমার খুব ভয় লাগছে। ও চলে যাক, তারপর সব কথা তোমাকে খুলে বলবো।

গোপী যশোদার ইশারায় চলে যাওয়ার ছলে বাড়ির থামের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কানহাইয়া কি বলে তা শোনার জন্য। গোপী সরে যেতেই যশোদা জিজ্ঞাসা করেন—বল তুই কেন পাথর ছুঁড়ে ওর ননীর ভাঁড় ভেঙেছিস। কানহাইয়া বলে, মা ঐ গোপী বড় কৃপণ। একটু ননী চাইলে দেয় না। আবার তিন চারদিন আগে তোলা বাসী ননী হাটে বেচতে যায়। তুমিই বলো মা ঐ বাসী ননী যদি কোন গরীব মানুষ কিনে খায় তাহলে তার কি রোগ হবে না? এই ভেবেই তো আমি ওর ভাঁড় ভেঙে দিয়েছি।

কানহাইয়ার মুখ থেকে এই কথা শোনামাত্র যশোদা গোপীকে উদ্দেশ্য করে তিরস্কারের সুরে বলছেন, 'ওরে ও গোপী, বাসী ননী তুই কেন বেচতে নিয়ে যাস।'

মায়ের কথা শুনে কানহাইয়া হাসতে থাকে। গোপীও সেই হাসিতে যোগ দেয় থামের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসে। যশোদার কোল থেকে কানহাইয়াকে কোলে নিয়ে বলে বাব্বা! তুই কি সুন্দর বলতে পারিস বটে।

রসিক কানাই

সেদিন সকালবেলায় কানাই-এর নামে নালিশ নিয়ে ব্রজের গোপীরা সবাই জড়ো হয়েছে যশোদার অঙ্গনে। যশোদা তাদের দেখে বললেন—কিরে সব সকাল সকাল আমার বাড়ীতে কেন? কিছু দরকার পড়েছে বুঝি তোদের?'

গোপীরা বলে, নাগো নন্দরাণী, আমরা কোনও দরকারে আসিনি—এসেছি তোমার কানাইয়ের নামে নালিশ জানাতে। তোমাকে কিন্তু মন দিয়ে আমাদের সব অভিযোগ শুনতে হবে। যশোদা বলেন, বেশ বল। গোপীরা সব একে একে গোপাল কার বাড়ীতে ননী চুরি করেছে, কার বাড়ীতে ভাঁড় ভেঙেছে, গোদোহনের আগে বাছুর ছেড়ে দিয়েছে—সব শুনিয়ে যায় মা যশোদাকে। কিন্তু গোপীদের মধ্যে একজন গোপী চুপ করে থাকে, সেও মা যশোদার মত সবার কথা শোনে কিন্তু নিজে কিছু অভিযোগ জানায় না মা যশোদার কাছে। তার এই নীরবতা দেখে অন্য গোপীরা তাকে বলে,—'কিরে চুপ করে রইলি যে, তোর ঘরে ঢুকে কানাই কি করেছে নন্দরাণীকে বল? তখন সেই গোপীটি বলল,—'আমার ঘরে ঢুকে কানাই যা করেছে তা বলার যোগ্য নয়। আমি তা বলতেও পারবো না।' অন্য গোপীরা বলে—ওটি হবে না, তোমাকে বলতেই হবে। যতক্ষণ না তুমি বলছো ততক্ষণ তোমাকে এখান থেকে যেতেই দেব না। সবার পীড়াপীড়িতে গোপীটি তখন অন্য গোপীদের বলল, তোমাদের সবাইকে শপথ করতে হবে এই কথা তোমরা অন্য কাউকে বলতে পারবে না? যদি তোমরা শপথ করো তাহলে বলতে পারি। গোপীরা শপথ করে যে, কথাটা কখনও কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তখন সেই গোপীটি বলতে শুরু করে তার ঘরে ঢুকে কানাই কি করেছে সে কাহিনী :

'তোমরা তো জান দিদি আমার স্বামী সারাদিন মাঠে পরিশ্রম করে, এক একদিন মাঠ থেকে ফিরতে রাতও হয়ে যায়। গত পরশুদিন অনেক রাত পর্যন্ত মাঠে ক্ষেতের কাজ করে আমার স্বামী ঘরে ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে। তারপর কোনরকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। শুতে না শুতেই আমরা দুজনে গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি। আমরা জানতেই পারিনি যে, কখন সকাল হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কানাই আমাদের বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। আমাদের ঘরের বাইরে অনেক জিনিস পড়ে থাকে বলে আমরা দরজায় ছিটকিনি না দিয়ে শুয়ে পড়ি। তোমাদের দেওরের তো মাথায় চুল নেই—তাই লম্বা দাড়ি রেখে, সেই দাড়ির চুল আঁচড়িয়ে মাথার চুল আঁচড়ানোর সাধটা মেটায়। সেদিন দুষ্টু কানাই ঘরে ঢুকে করেছে কি—তোমাদের দেওরের দাড়ির লম্বা চুলের সঙ্গে আমার মাথার চুল জড়িয়ে আচ্ছা করে গিঁট বেঁধে দিয়ে পালিয়েছে। এদিকে সকাল হয়েছে। প্রতিবেশিনীরা সব চীৎকার করে ডাকছে,—আরে ও বউ যমুনায় জল আনতে যাবি না। এতখানি বেলা হল এখনও শুয়ে আছিস যে, শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি? ওদের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি জানালা পথে, খোলা দরজা দিয়ে রৌদ্র সে ঘরে ঝলমল করছে। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি যেই বিছানা ছেড়ে উঠতে গেছি অমনি তোমাদের দেওর—উঃ! উঃ! উঃ! দাঁড়াও। দাঁড়াও। আমি বলি—অমন উঃ! উঃ! করছো কেন? তখন তোমার দেওর বলে, আমি কি সাধ কর উঃ উঃ করছি, পিছন ফিরে দেখ, আমার কি হয়েছে।

বলবো কি পিছন ফিরতেই দেখি তোমাদের দেওর দাড়ি চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তা দেখে আমি তো লজ্জায় মরি। ও তখন চীৎকার করে বলছে—''কি হয়েছে একবার দেখ! আমি তখন তাকিয়ে দেখি ওর দাড়ির সঙ্গে আমার মাথার চুলে গিঁট মারা। বিয়ের সময় বস্ত্রে বস্ত্রে হয়েছিল গাঁটবন্ধন। বিয়ের পরে দেখি কেশে কেশে কেশবন্ধন। ও বলল, এ নিশ্চয়ই যশোদার ছোঁড়ার কাজ। আমার মাথার চুল টেনে নিয়ে গিয়ে গিঁটটাও বেঁধেছে একেবারে ঠিক দাড়ির নীচে। ওদিকে প্রতিবেশিনীরা চীৎকার করছে—ওরে বউ, তোর দেরী

হচ্ছে কেন? নতুন নতুন লালতের শাক, ওরে আমাদের ও এমন দিন ছিল। জল আনতে যাবি কিনা বল। আমি তখন ঘর থেকে চীৎকার করে বললাম—আজ আমার শরীরটা ভালো নেই—আজ যাব না তোমরা যাও।

প্রতিবেশিনীরা চলে গেল। কিন্তু ঘরের কাণ্ডকারখানা তখন শেষ হয়নি। বহু চেষ্টা করেও গিঁট খোলা গেল না। তখন আমার স্বামী বলল,—যাও কাঁচি নিয়ে এসো। আমি বললাম ঠিক আছে যাচ্ছি বলে যেই না পা বাড়িয়েছি কাঁচি আনার জন্য অমনি তোমাদের দেওর বলছে দাঁড়াও, দাঁড়াও আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি নইলে আমার সমস্ত দাড়ি ছিঁড়ে তোমার সঙ্গে চলে যাবে। আমি আগে আগে চলি, পিছে পিছে আসে তোমাদের দেওর। একবার বিয়ের সময় অগ্নি ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে সাতপাক দিয়েছিলাম। এখন ঘরে দুজনায় দুজনার সাক্ষী হয়ে কত যে পাক খেলাম তার শেষ নেই। যাই হোক কোনরকমে পাশের ঘরে ঢুকে কাঁচি খুঁজে পেতেই আবার আমাদের দুজনার মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ও বলে তোমার চুলে কাঁচি চালাও? আমি বলি, কেন? তোমার দাড়িতে কাঁচি চালাও? আমি সধবা। সধবার চল কাটা অমঙ্গল, বিশেষ করে বিয়ের পর। তখন ও বলে, একে তো মাথায় চুল নেই। তার উপর দাড়ি কেটে যদি পরিষ্কার হয়ে রাস্তায় বের হই—তখন লোকে জিজ্ঞাসা করবে—কিরে তোর অশৌচ কবে হলো? তখন আমি কি উত্তর দেব?'

কি বলবো যশোদা মা? তোমার গোপালের কুকীর্তির কথা-একথা কি কাউকে বলা যায়? দোহাই তোমাদের তোমরা যেন এই কথাটা আবার পাঁচকান করো না। তাহলে ব্রজের সবাই আমাদের নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করবে। গোপীটির অভিযোগ শুনে যশোদাসহ অন্য গোপীরা মুখটিপে হাসতে থাকেন।

সবার অলক্ষ্যে

বৃন্দাবনের কোন এক গোপের ঘরে নববধূ হয়ে এসেছে একটি মেয়ে। নাম তার নীরজা। বৃন্দাবন থেকে কিছু দূরে কোন এক গ্রামে তার পিত্রালয়। নীরজা বৃন্দাবনে বধূ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ির লোক তাকে সতর্ক করে দেয়—সে যেন কৃষ্ণ থেকে দূরে থাকে। কোন ক্রমেই সে যেন কৃষ্ণের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে।

নীরজা ভেবে পায় না কেন তার প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা। সে শুনেছে কৃষ্ণ এক কিশোরের নাম। নন্দের আদরের পুত্র সে। সেই কিশোরকে শ্বশুর বাড়ির লোক এত ভয় পায় কেন? তাঁর মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য বা দুরন্তপনা আছে যাতে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে ভয়ে এড়িয়ে চলে? নীরজা শ্বশুর বাড়ির লোকজনের মুখে একথা শুনেছে যে কৃষ্ণের কিশোররূপে এমন মাধুর্য্যমণ্ডিত আকর্ষণ আছে যা দেখলে ঘর-বাড়ি, জগৎসংসার এমন কি দেহজ্ঞান পর্যন্ত বিস্মরণ হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে না দিক ক্ষতি নেই কিন্তু তাঁকে একবার নয়নভরে দেখতে দিতে এদের আপত্তি কেন? সংসারের সকল কাজের মাঝে নীরজার মনের মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি বারবার ভেসে ওঠে। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়। আসে গিরি গোবর্ধনের পুজোর দিন। আর পাঁচজন গোপবধূর মতো সে ও যায় গিরি গোবর্ধনের পূজা-উৎসব দেখতে।

গিরিগোবর্ধনের পাদদেশে পৌঁছেই সে শুনতে পায় সর্বচিত্তাকর্ষক মন হরণকারী মোহন বাঁশীর সুর। নীরজা ভাবে কে এই নিপুণ শিল্পী—যে বাঁশীর সুর ছড়িয়ে তার হৃদয়কে শরীর থেকে বের করে নিতে চাইছে। এদিক-ওদিক আকুল নয়নে খুঁজে বেড়ায় নীরজা-বাঁশীর শিল্পীকে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পায় না। ধীরে ধীরে বাঁশীর সুর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে নীরজা। দেখে ভীড় থেকে কিছুটা দূরে গিরি গোবর্ধনের একপ্রান্তে রয়েছে একটি মনোরম কুঞ্জবন। সেই কুঞ্জবনে এক নয়নাভিরাম নীলকিশোর আপনভাবে বিভোর হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। লোকজন গিরিগোবর্ধনের পূজা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে কারও নজর নাই। নীরজা ধীরপদে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যায় নীলকিশোরের কাছে। নীলকিশোর নীরজাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কে? তোমার নাম কি?

—আমি নীরজা, বৃন্দাবনের নব গোপবধূ। তুমিই কি নন্দ কিশোর কৃষ্ণ?

—হ্যাঁ আমিই বৃন্দাবনের নন্দকিশোর, মা, যশোদার নয়নমণি গোপাল।

—তুমি বাঁশী বাজানো বন্ধ করলে কেন?

—তুমি এলে তাই!

—আমি এসে বুঝি তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটালাম বেশ তাহলে আমি যাই—

—না সখী—তুমি আসায় বিঘ্ন হবে কেন? আমি এমনিই বন্ধ করলাম। দেখছ না ওদিকে গিরিগোবর্ধনের পূজা আরম্ভ হয়েছে।

—আচ্ছা তুমি আমায় সখী বললে কেন? তুমি কি আমার সখা?

—হ্যাঁ ভাই, আমি তোমার চিরজীবনের সখা।

—আচ্ছা গিরিগোবর্ধনের পূজা হয়ে গেলে আমি তো আবার গৃহে গিয়ে বন্দিনী হয়ে যাবো। তখন তোমার সঙ্গে আমার কেমন করে দেখা হবে? আমাকে আমার স্বামী শ্বশুর বাড়ী থেকে বের হতে দেয় না। আজ উৎসব বলে আমাকে আসতে দিয়েছে—এরপর সখা তোমার সঙ্গে কেমন করে দেখা করবো? তোমার বাঁশীর গান যে আমার হৃদয়কে কেড়ে নিয়েছে বন্ধু। ওই গান কি আর আমি শুনতে পাবো না?

—তুমি ঘরে বসেই আমার বাঁশীর গান শুনতে পাবে সখী। তুমি আকুল প্রাণে যখনই আমার গান শুনতে চাইবে—তখনই আমার বাঁশীর গান তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।

—কিন্তু তোমার এই অপরূপ রূপের দর্শন কেমন করে পাবো তাতো বললে না?

—তুমি যখনই আকুল হৃদয়ে আমাকে দেখতে চাইবে, তখনই আমার দেখা পাবে। আচ্ছা সখী, এখন আমি আসি—আমার বাবা-মা বোধ হয় অনেকক্ষণ আমায় দেখতে না পেয়ে ভিড়ের মধ্যে খুঁজছে, আমি যাই।

যশোদার নীলমণি নীরজার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করে মৃদু হেসে চলে যায়—উৎসব মণ্ডপের দিকে। নীরজা নীলমণির চলার পথের দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে—তার হৃদয় যেন প্রিয় বস্তু হারানোর বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে, হায়! হায়! এইরূপ দর্শনে এতদিন বঞ্চিতা ছিলাম আমি। নীলমণির চলার পথের দিকে চেয়ে বলে—ওগো বন্ধু শুনে যাও আজ থেকে আমি তোমার। শুধুই তোমার—আমি আমার হৃদয় মন-প্রাণ ওগো বন্ধু তোমার চরণে সমর্পণ করলাম।

উৎসব শেষে বৃন্দাবনবাসী ফিরে যায় আপন আপন ঘরে। নীরজাও ফিরে যায় কিন্তু মন রয়ে যায়—গিরিগোবর্ধনের প্রান্তে স্থিত সেই কুঞ্জবনে, যেখানে নীলমণির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। মাঝে মাঝে সে ঘর ছেড়ে একাই বেড়িয়ে চলে আসে সেই কুঞ্জবনে—এসে দেখে তার বন্ধু গিরিবর্ধনের পাদদেশে ধেনু চরাচ্ছে বাঁশী বাজাচ্ছে। কখনও বা সখাদের সঙ্গে মল্লক্রীড়া করছে। তা দেখে নীরজার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু, এর জন্য তাকে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ি স্বামীর গঞ্জনা-লাঞ্ছনাও তাকে কম সহ্য করতে হয়নি। অনেক অগ্নিপরীক্ষার পথ পার হয়ে তবে সে পেয়েছে পরমপ্রিয় বন্ধু নীলমণিকে।

এইভাবে, কতদিন কত বছর চলে গেল। একদিন খবর এল মথুরা থেকে অক্রূর না কে একজন এসেছে তার বন্ধুকে নিয়ে যেতে। খবর শোনামাত্রই রাধা ও অন্যান্য গোপীদের মত নীরজাও ঘনঘন মূর্ছা যায়!

অক্রূরের রথে চেপে কৃষ্ণ যখন মথুরার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পথে তখন সবার অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে নীরজা রথের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। সেদিন কোন বাধাই তাকে আটকাতে পারে না। মনে হচ্ছে কে যেন তার প্রাণপাখীটিকে বুকের খাঁচা থেকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ রথ থেকে নামলেন। নীরজার অশ্রুসিক্ত নয়ন আপন উত্তরীয় দিয়ে মুছিয়ে দিলেন—সান্ত্বনার স্বরে বললেন,—'সখী, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গেই আছি। যখন আমাকে স্মরণ করবে—দেখবে আমি তোমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। অনেক বুঝিয়ে নীরজাকে শান্ত করেন কৃষ্ণ।

রথ চলে যায় মথুরায়। কৃষ্ণ আর আসেন না। বাঁশী আর বাজে না বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে। কৃষ্ণবিরহ যন্ত্রণার আগুনে আর সব গোপীদের মতো নীরজার হৃদয়ও দগ্ধ হতে থাকে। শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে মৃত্যু আসন্ন প্রায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িতা হয়ে বন্ধু কৃষ্ণকে, প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে নীরজার দুই নয়ন দিয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরতে থাকে। আস্তে আস্তে দুটি শীর্ণ হাত-উপরের দিকে তুলে নীরজা বলে,—'বন্ধু, আমার যে যাওয়ার সময় আগত প্রায়। বিদায়-এর ক্ষণে বড় ইচ্ছা জাগে মনে, তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করি। এসো বন্ধু মোর! এসো সখা, প্রিয়তম লইতে মোরে তব আনন্দ রথে শোনাও প্রিয় সে বাঁশীর গান—শীতল হোক তপ্ত, ক্লান্ত প্রাণ—দেরী কর কেন সখা—এত বি-ল-ম্ব হলে শে-ষ দে-খা হবে কেমন ক-রে এ-এ। নীরজার অন্তিম আকুল আহ্বানে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হলেন তার কাছে। কৃষ্ণ দাঁড়ালেন নীরজার শিয়রে, করকমল রাখলেন তার মাথায়। বললেন,—সখি, আঁখি খুলে দেখ আমি এসেছি।' নীরজা ধীরে ধীরে নয়ন মেলে দেখেন। গিরিগোবর্ধনের প্রান্তে স্থিত সেই কুঞ্জবন। কণ্ঠের বাণীতে সেই প্রেম-ভালোবাসা—আন্তরিকতার ছোঁয়া। নীরজা কৃষ্ণের দিকে চেয়ে করুণ আঁখি মেলে বলে—বন্ধু, আমার পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা অনুরোধ রাখবে?

—বলো কি তোমার অনুরোধ। শুধু একটা কেন অসংখ্য হলেও আমি তা রাখবার চেষ্টা করবো'।

—প্রথম দিন তোমার গান শুনে, গানে সুর অনুসরণ করে যেমন তোমার সঙ্গে মিলেছিলাম আজ, যাওয়ার পথে সেই বাঁশীর গান শোনাও বন্ধু—ওই গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি তোমার সুরের অনন্ত শয্যায়।

কৃষ্ণ নীরজার মাথায় হাত রেখে বলেন,—'সখি আজ যে আমি বাঁশী আনি নি। বাঁশী নিয়ে আসিনি বলে তুমি হতাশ হয়ো না—আমি এখনই তোমাকে বাঁশীর গান শোনাচ্ছি, তুমি একটু অপেক্ষা করো।

নীরজাকে অপেক্ষা করতে বলে কৃষ্ণ নিকটবর্তী একটি বেণুবাঁশে ঝোপ থেকে একটুকরো বেণুবাঁশ সংগ্রহ করে তা ছিদ্র করলেন এবং নীরজার মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে বাঁশীতে সুরের ঢেউ তুলে নীরজাকে শোনাতে লাগলেন। নীরজা সেই বাঁশীর সুর শুনতে শুনতে দ্রবীভূত হয়ে কৃষ্ণ অঙ্গে মিশে গেলেন। বাঁশীর সুরে, চোখের জলে তার সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে শুদ্ধাতিশুদ্ধ হয়ে পরম প্রিয়ের সত্তায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার সময় যে বাঁশী ত্যাগ করেছিলেন—আজ নীরজার অনুরোধে সেই বাঁশী গ্রহণ করলেন। নীরজাকে যেখানে বাঁশী শুনিয়ে তিনি পরমগতি দান করেছিলেন—আজও লোকে তাকে বংশীকুঞ্জ বলে নীরজার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

গোঠের মাঠে একঝলক

নন্দলালা ধেণু চরাতে যায় সখাদের সঙ্গে। কখনও গিরিগোবর্ধনের প্রান্তে, কখনও যমুনা তীরস্থিত বৃন্দাবনের বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে নন্দলাল থেকে মা যশোদা, রোহিনী ও নন্দবাবার শাসনছায়ায় কিন্তু গোচারণের মাঠে দাদা বলরাম সঙ্গে থাকলেও সখা ভদ্রসেনের শাসনাধীনে থাকে দুরন্ত কানাই।

ভদ্রসেন ব্রজরাজ নন্দকুমারের ছোটভাই নন্দনজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছোটপুত্রের নাম স্তোক কৃষ্ণ, ভদ্রসেনের মায়ের নাম অতুলা। কিন্তু ভদ্রসেন নন্দযশোদাকেই মা ও বাবা বলে ডাকে কানাই-এর মতো। কারণ সে ছোটবেলা থেকেই নন্দ যশোদার কোলে মানুষ হয়েছে। তাই কানাই যাকে যা বলে সে তাই বলে। এমনকি সে নিজের ছোট ভাইকেও পরিচয় দেয়, কানাই-এর মতো কাকার ছেলে বলে।

যাই হোক গোচারণের মাঠে ভদ্রসেনের যত চিন্তা কানাইকে নিয়ে। কানাই বড় চঞ্চল, দুরন্ত ও জেদী। কোমল শরীর বড় দূর্বল। দূর্বল সুকুমার কানাই-এর জন্য ভদ্রসেন সবসময় চিন্তান্বিত। দূরন্ত কানাই কখন কি করে বসে ঠিক নাই। তাই সবসময় সে কানাইকে চোখে চোখে রাখে। কানাই ভদ্র-র চেয়ে বয়সে কয়েকমাসের ছোট। মাঠে গিয়ে কানাই আকাশে পাখী উড়তে দেখলেই তার ছায়ালক্ষ্য করে ছুটতে থাকে, কখনও বা কোন খরগোশ কিংবা হরিণ দেখলে তার পিছু পিছু ছুটে যায়। আবার যখন সখাদের সঙ্গে খেলা করতে থাকে তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তির বোধ পর্যন্ত কানাই-এর হয় না। খেলতে খেলতে রৌদ্রতাপে কানাই-এর মুখ পুড়ে লাল হয়ে যায়—সেদিকেও তার নজর নাই। তাই ভদ্রকেই সবদিক সামলাতে হয় ভদ্রসেনের বলিষ্ঠ শরীর। বাবার মতো সেও মল্লবীর। কানাইয়ের মতো সেও পীতবসন পরে—কিন্তু উত্তরীয় তার বলরামের ন্যায় নীল। কখনও কখনও তার উত্তরীয় বলরামের সঙ্গে বদলও হয়ে যায়। বলরামের মতো সেও মাথায় হাঁসের পালক গুঁজে নেয়। কানাইয়ের সখাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় মধুমঙ্গল। কিন্তু সে ব্রাহ্মণের ছেলে, সে গরু চরাতে আসে না, আসে খেলতে। বলরাম সবার চেয়ে বড়, বিশাল, অর্জুন, ঋষভ, বরুথপ, শ্রীদাম-এরা সবাই ভদ্রর চেয়ে বড় কিন্তু বলরামের চেয়ে ছোট। এদের মধ্যে বড় ছোটর পার্থক্য কেবলমাত্র কতিপয় দিনের। অংশু, তেজস্বী, স্তোককৃষ্ণ, দেবপ্রস্থ, কানাইয়ের চেয়ে ছোট। কানাই মাঝে মাঝে নিজের গায়ের উত্তরীয় এখানে ওখানে ফেলে আসে। কোথায় ফেলেছে মনে থাকে না—তাই ভদ্রর কাঁধের উত্তরীয় টেনে নিয়ে নিজের কাঁধে রেখে দেয়। তা দেখে ভদ্র বলে—কি রে আমার উত্তরীয় নিলি যে?

—কানাই বলে, 'এটা তোর নয় আমার।'

—তোর উত্তরীয় তো পীতবর্ণের, নীল তো তুই গায়ে পরিস না?

—তাতে কি হয়েছে? পরি না এখন পরলাম। তাছাড়া এটা আমার না হোক দাদার তো বটে—দাদা তো নীল উত্তরীয় পরে।

কানাই কখন কি যে চায়, কি যে পরে—কি যে করে কিছুই বোঝা যায় না। গোচারণের মাঠে একদিন হয়েছে কি কতকগুলি ঝরা ফুল ও পতিত ফল দেখে কানাই জেদ ধরেছে এই ফুল ও ফলগুলিকে আবার গাছের ডালে আগের মতো লাগিয়ে দিতে হবে। সখারা কেউ কানাইকে বুঝিয়ে পারছে না যে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু কানাই কারও কথা শুনতে রাজী নয়। কানাই ভদ্রকে লক্ষ্য করে বলে—তুই তো এটা করতে পারিস, তাড়াতাড়ি কর নইলে আমি তোদের সঙ্গে খেলবো না-খেলবো না-খেলবো না, এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে মাকে বলবো তোরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস।

বেচারা ভদ্র কি করবে ভেবে না পেয়ে বলে—আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি কী করা যায়। ভদ্র কোনরকমে গাছে উঠে ফুলগুলিকে কাঁটায় গেঁথে লাগিয়ে দেয়। পতিত ফলগুলিকে কোনরকমে গাছে আটকে

রাখে। কানাই তখনকার মতো শান্ত হয়। কিছুক্ষণ পর একটি খরগোশ আসে—এসে কানাইয়ের পা শুঁকতে থাকে। ভদ্র বলে কানাই খরগোশ তোর কাছে ফল চাইছে—তুই ওকে ফল খেতে দে। নইলে ও তোর সঙ্গে ঝগড়া করবে। কানাই ভদ্রর কথা বিশ্বাস করে বলে আমাকে ফল এনে দে,—ভদ্র আবার গাছে উঠে সেই পতিত ফলগুলি পেড়ে এনে কানাইয়ের হাতে দেয়। কানাই ফলগুলি একটা একটা করে খরগোশকে খেতে দেয়। কানাই খরগোশকে জিজ্ঞাসা করে—কিরে তোর বুঝি খুব ক্ষিধে পেয়েছে—নে ফল খা। খরগোশ দুপায়ের ফাঁকে ফল চেপে ধরে খেতে থাকে। তা দেখে কানাইয়ের খুব আনন্দ হয়। বলে—খা খা যতখুশী খা। বলে বাকী ফলগুলি যেই খরগোশকে দিতে যায় অমনি ভদ্র কানাই-এর ফলশুদ্ধ হাত চেপে ধরে বাধা দেয়, বলে : ছোট্ট প্রাণী, ছোট্ট পেট, অত ফল খেলে রোগ হয়ে মরে যাবে যে?

ভদ্রকে যেমন কানাইকে সামলাতে হয় তেমনি মাঠের পশুর দিকে নজর রাখতে হয়। তবে সব থেকে বেশি নজর তার কানাই-এর প্রতি। কারণ কানাই যেখুব সুকুমার ও দুর্বল। ধেণু বা গাভী নিয়ে সখারা বনের কোন পথ ধরে যাবে তাও ঠিক করে ভদ্রসেন। বলরামকে যে যা বলে সে তাতেই হ্যাঁ দেয়। যদি কেউ বলে—আজ পূর্বদিকে চলো—বলরাম বলে—হ্যাঁ চলো। ধেণু নিয়ে কখন কোন পথে যাবে তা নিয়ে যদি সখাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়—তখন সবাই একসঙ্গে বলে—ভদ্রকে জিজ্ঞাসা করো ও যা বলবে তাই হবে। এরপর সবাই যখন ভদ্রকে জিজ্ঞাসা করে—আজ কোন পথে যাবো? ভদ্র বলে—দাঁড়া কানাইকে জিজ্ঞাসা করি। কানাইকে জিজ্ঞাসা করতেই কানাই বলে—যেদিকে তুই যাবি, সেদিকেই আমি তোর সাথে ধেনু চরাতে যাবো। ভদ্র তখন তার ইচ্ছামত একটা পথ ধরে ধেণু নিয়ে চলতে থাকে। সখারা জিজ্ঞাসা করে : কিরে আজ ঐ পথটা দিয়ে গেলি না যে।

ভদ্র উত্তর দেয়—ও পথে কাঁটা আছে, কাঁকর আছে—আমাদের কানাইয়ের কোমল পায়ে ব্যথা লাগবে। কাঁটা পাথরে ভরা পথে কি কানাইকে নিয়ে যাওয়া যায়? মা যশোদা, শ্রীদামের দিদি [রাধারাণী] জানতে পারলে কানাইকে আর আমাদের সঙ্গে আসতেই দেবে না। সখারা সব মেনে নেয় ভদ্রর কথা।

শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাঙ্গনা

ব্রজে দেবাঙ্গনা নামে এক গোপকন্যা ছিল। সে একদিন গোশালায় অর্থাৎ গোয়ালঘরে গিয়ে দেখে প্রচুর গোবর জমে আছে। গোবরের বিশালরাশি দেখে ভাবছে, আজ গোয়ালের গোবর সাফ করতে করতেই সারাটা দিন কেটে যাবে। এততো গোবর কখনই বা পরিষ্কার করবো? আর কখনই বা যশোদার লালাকে দেখতে যাবো? সে হয়তো এতক্ষণে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছে। আমি তাঁর সেই মধুর বংশীধ্বনি না শুনে, গোয়ালের গোবর পরিষ্কার করে মরছি, জানি না কাজ কখন শেষ হবে? এই সময় যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তো খুব ভালো হয়। বিশেষ করে কানাই যদি আসে তো খুব মজা হয়।

"আরে ও কানাই-কানাইরে একবার এদিকে আয় না?'" নন্দমহারাজের বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে কানাইয়ের উদ্দেশ্যে দেবাঙ্গনা ডাক দেয়। মনে মনে ডাকে কানাই, কানাই আয়-আয়রে, এদিকে আয় না? একদিকে গোবরের ঝুড়ি মাথায় তুলে বাইরের প্রাঙ্গণে ফেলে জমা করে অন্যদিকে মনে মনে কানাইকে ডেকে চলে। ভক্তের আর্তিভরা ডাকে ভগবানের আসন টলে ওঠে। সহসা কানাই সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাঁকে দেখতে পেয়ে দেবাঙ্গনা আনন্দে ডগমগ। কানাই বলে,—'কিরে গোপী কি করছিস?' দেবাঙ্গনা উত্তর দেয়,—'দেখছিস তো গোয়াল পরিষ্কার করছি। তুই আমাকে একটু সাহায্য কর না কানাই!'

—কি সাহায্য করবো?

—আমি গোবরের ঝুড়ি ভর্তি করে তোর মাথায় তুলে দিই, তুই তা নিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে গোবরের স্তুপে ফেলে দিয়ে আয়।

—ঠিক আছে, আমি না হয় তো গোবরের ঝুড়ি মাথায় করে বাইরের গাদায় (স্তূপ) ফেলে দিচ্ছি, কিন্তু—কিন্তু কি?

—এলাম সাত সকালে তোর কাছে একটু মাখন নিতে, আর তুই কিনা তার পরিবর্তে আমাকে গোবর ফেলার কাজ দিলি?

—মাখন তো আর এমনি এমনি পাওয়া যায় না, তার জন্য মেহনত করতে হয়, এখন গোবরের ঝুড়ি তো বাইরে ফেলে আয়, পরে না হয় মাখন দেব।

—কতটা মাখন দিবি?

—এক ঝুড়িতে একতাল বা একডেলা পাবি।

কানাই বলে, 'ঠিক আছে, আমি গোবরের ঝুড়ি বাইরে ফেলছি, তুই গোবর ভরে আমার মাথায় তুলে দে।'

এক-দুই-তিন-চার এইভাবে গুণতে গুণতে কানাই বাইরের গাদায় গোবরের ঝুড়ি খালি করে। দেবাঙ্গনা তার মাথায় গোবরের বোঝা তুলে দেয়। কি সরলতা ভগবানের। এতে তার শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের হানি হয় না।

যাইহোক, দু-চার ঝুড়ি বাইরে ফেলে আসার পর কানাই গোপীকে বলছে—"দ্যাখ গোপী তুই হলি ঝুড়ি ভরে তুলে দেওয়ার লোক, আমি হলাম সেই ঝুড়ি বহন করে নিয়ে বাইরে ফেলার লোক। কিন্তু ঝুড়ি গোনার লোক কই? যাঃ আমি আর তোর গোবরের ঝুড়ি মাথায় করে বইবো না? আমি চললাম মায়ের কাছে—'

—শোন শোন কানাই, আমিই না হয় তোর গোবরের ঝুড়ি অর্থাৎ তুই কত ঝুড়ি বইলি তা গুণে দেব।

—কিন্তু তুই গোবর ভরে দিবি, মাথায় তুলে দিবি, আবার বলছিস গুণে দিবি, এতে যদি তোর গোনা ভুল হয়ে যায়—তাহলে তো আমার মাখন কম পড়ে যাবে? গোপী হেসে বলে ভুল হবে কেন? তুই যতবার ঝুড়ি নিয়ে বাইরে যাবি, আমি ততবার তোর কপালে একটা করে গোবরের টিপ পরিয়ে দেব—তাহলেই সব ঠিক হবে।

কানাই বলল,—'ঠিক আছে, মাথায় ঝুড়ি তুলে দে।'

গোপী তুলে দেয় গোবরভর্তি ঝুড়ি, কানাই ফেলে আসে বাইরে। মাথায় ঝুড়ি তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপী কানাইয়ের কপালে একটি করে গোবরের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে। ঝুড়ি বইতে বইতে কানাইয়ের সারামুখ লাল হয়ে উঠলো। ওদিকে গোপীও ফোঁটা পরাতে পরাতে তাঁর কপালসহ সারামুখ গোবরের টিপে ভরে দিল। আকাশের তারার মতো তার নীলপদ্ম আননে গোবরের টিপ তারার মতো শোভা পাচ্ছে। গোবরভর্তি ঝুড়ি নিজের মাথায় তুলে কানাই ভক্তরূপা গোপীকে আনন্দদান করছেন। কোন কষ্ট অনুভব করছেন না। কারণ তিনি নিজের দেহকে দেহ বলে ভাবেন না। তাঁর আমিত্ব বা অভিমান যেন অনন্তানন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। এই লীলায় কানাই জগৎকে যেন বলতে চাইলেন—নিজের আমিকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রেখ না। বাস্তবিক আমিত্বের স্বরূপকে স্বরূপতঃ চিনে নাও। সুখ নেওয়ার বস্তু নয়, দেওয়ার বস্তু। এই সুখ কিভাবে দিতে হয় তা ভগবান জীব ও জগৎকে শেখাচ্ছেন। কখনও বাঁশী বাজিয়ে, কখনও মাখন চুরি করে, কখনও বা গোবরের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কপালে গোবরের তিলক পরে।

জীব আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ। তাই সে সুখের জন্য, আনন্দের জন্য চেষ্টা করে কিন্তু সুখ বা আনন্দকে সে ধরতে পারে না। আমাদের পয়সা হলে মটরগাড়ী কিনি, ড্রাইভার রাখি—কেন না তখন নিজে গাড়ি চালাতে সঙ্কোচ হয়। ইজ্জতের প্রশ্ন দেখা দেয় কিন্তু বিশ্বম্ভর কানাইয়ের ঘোড়ার গাড়ি অর্থাৎ রথ চালাতেও সঙ্কোচ হয় না।

দেবাঙ্গনা টিপ পরায়, গোবরের ঝুড়ি মাথায় তুলে দিয়ে বাইরে ফেলতে পাঠায়। নির্বিকার চিত্তে তিনি তা করেন। কাজ শেষে কোমরের পীতাম্বরের কাছা খুলে ঝোলার মতো করে কানাই গোপীকে বলে—এবার এতে মাখন দে। দেবাঙ্গনা একতাল করে মাখন দিচ্ছে আর একটি একটি করে কানাইয়ের কপালে গোবরের টিপ মুছে দিচ্ছে। গোপীর মাখন দেওয়া শেষ হলে কানাই বলে,—'শুধু মাখন আমি কমই খাই, খুব ভালো হতো যদি এর সাথে একটু মিছরী পেতাম।' দেবাঙ্গনা বলে,—'মিছরী তো আর এমনি এমনি পাওয়া যায় না, তার জন্য অন্য কাজ করতে হবে।'

—কি কাজ? কানাই জিজ্ঞাসা করে।

—একটু নাচ করে দেখাতে হবে।

—ঠিক আছে, এক্ষুণি নাচছি বলে কানাই নাচতে শুরু করেন। নাচ শেষ হলে দেবাঙ্গনা কানাইয়ের ঝোলায় মিছরীচূর্ণ করে মাখনের উপর ছড়িয়ে দেন। কানাই পরমানন্দে তা খেতে খেতে নৃত্য করতে করতে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

পঞ্চ আশ্চর্য্য

মহাভারতের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। পাণ্ডবরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। শতকৌরব নিহত এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন,—'ধর্মরাজ যুদ্ধ তো সমাপ্ত হল। ধর্মের জয়ও হল, অধর্মের পতন হল। এবার রাজ্য অভিষেকের আয়োজন করুন এবং রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতের তুলে নিয়ে ন্যায় ধর্মের সঙ্গে রাজ্য ভোগ করুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—লক্ষ লক্ষ যুবকের রক্ত ঝরিয়ে লক্ষ লক্ষ নারীকে বিধবা সাজিয়ে, হাজার হাজার মায়ের কোল শূন্য করে যে রাজ্য আমি পেয়েছি তা ভোগ করার ইচ্ছা আমার নেই। রাজ সিংহাসনে বসার কোন অভিরুচি আমার নেই। যুদ্ধে রক্ত, অশ্রুপাত শোক ও বেদনা দেখে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভাবছি কি লাভ এই রাজ্য ভোগ করে? রক্ত, অশ্রুর মূল্যে যা পেয়েছি তা যে কখনই সুখাবহ হবে না তা আমি বুঝতে পেরেছি, তাই আমি চাই...।

—কি চান আপনি?

—ভাবছি গঙ্গার তীরে কোন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে সাধন ভজন-তপস্যাদি করে নিজকৃত পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবো। তারপর পাপমুক্ত শুদ্ধ হৃদয়ে ফিরে এসে শান্তিতে রাজ্য শাসন করবো। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন,—'হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, তবু তুমি আর কোনদিনই শান্তিতে রাজ্যপালন করতে পারবে না। কেন না খুব সম্প্রতি পৃথিবীতে কলি প্রবেশ করবে। তার লক্ষণ যদি দেখতে চাও তবে তোমরা পাঁচভাই আজ পাঁচদিকে ভ্রমণে বেরিয়ে যাও। ভ্রমণে বেরিয়ে তোমরা পাঁচভাই পাঁচরকম আশ্চর্য্য ঘটনা দেখতে পাবে। সন্ধ্যার পরে তোমরা পাঁচভাই যখন ফিরে আসবে তখন তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

পাঁচ ভাই শ্রীকৃষ্ণের কথামত সেদিন পাঁচদিকে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠির বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় গিয়ে দেখেন একটি হাতী দাঁড়িয়ে আছে—তার দুটি শুঁড়। দুই শুঁড়ওয়ালা দেখে যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হয়ে যান। অর্জুন দেখেন দ্বিতীয় আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। তিনি দেখলেন, একজায়গায় একটি পাখী রয়েছে। ওই পাখীর পাখায় বেদমন্ত্র ও ধর্মের সার লেখা রয়েছে কিন্তু পাখীটি একটি মরদেহের মাংস ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

অন্যদিকে ভীম দেখেন, একটি গাভী তার নবজাত বাছুরকে এমনভাবে লেহন করছে যে বাছুরটির সারা গা বেয়ে লোম উঠে গিয়ে রক্ত ঝরছে—তবুও গাভীটি লেহন করে চলেছে।

সহদেব চলতে চলতে একজায়গায় থেমে গেলেন বিস্ময়কর একটি ব্যাপার দেখে। একজায়গায় ছয়টি কূয়ো আছে—চার প্রান্তের চারটি কূয়োয় জল আছে কিন্তু মাঝের দুটি খালি।

নকুল ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা। তিনি এক পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হয়েছিলেন। সেখান থেকে পাহাড়ের দিকে তাকাতেই তিনি দেখলেন-পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথরের চাঁই বিপুল বেগে গড়িয়ে পড়ছে, গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগেও তার গতি থামছে না বা আটকে যাচ্ছে না কিংবা অন্য কোন বড় পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়েও তার গতি প্রতিরোধ হচ্ছে না, শেষে গড়াতে গড়াতে পাথরের চাঁইটি একটি ঘাস পাতায় এসে আটকে গেল। কি আশ্চর্য্য! ভাবতে ভাবতে নকুল ফিরে গেলেন হস্তিনাপুরে। অপরদিকে অন্য চার ভাই ও সন্ধ্যার আগেই নগরে ফিরে গেছেন।

পাঁচভাই সন্ধ্যার কিছুপর কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে আপন আপন দেখা আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন এবং ঐ পাঁচ ঘটনার রহস্য কি তা জানতে চাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরের দেখা দুই শুঁড়ওয়ালা হাতীর রহস্য বিশ্লেষণ করে বললেন, ধর্মরাজ কলিযুগে যারা শাসক হবেন—তারা সব ঐ দুই শুঁড়ওয়ালা হাতীর মতো অর্থাৎ এরা দুই দিক থেকে প্রজাদের শোষণ

করবেন।

অর্জুনের দেখা দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ঘটনার রহস্য হচ্ছে—কলিতে ধর্ম নিয়ে নানা মত ও সম্প্রদায় হবে তারা শাস্ত্রের বিষয় নিয়ে প্রবচন ও দেবে, নিত্য বস্তু কি অনিত্য বস্তু কি তা নিয়ে বড় বড় গ্রন্থও লিখবে কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম প্রবক্তারা অনিত্য বিষয়ভোগেই আসক্ত হবে। তাদের কামনা নিত্য অপেক্ষা অনিত্য বস্তুতেই বেশী থাকবে। তাদের বাইরে ধর্মের বেশ, মুখে ধর্মের বুলি কিন্তু অন্তরে থাকবে তীব্র ভোগ আকাঙ্ক্ষা।

মধ্যম পাণ্ডব দেখেছেন একটি গাভী তার নবজাত বাছুরের গা এমনভাবে লেহন করছে যে, বাছুরটির গা হতে রক্ত ঝরে যাচ্ছে—তবু গাভীটির লেহনে বিরাম নেই—এর অর্থ হচ্ছে কলিতে মানুষ পুত্রকন্যার প্রতি এত মোহগ্রস্ত বা আসক্ত হবে যে পুত্র-কন্যা বা সন্তান-সন্ততিরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখবে না অর্থাৎ তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে না—তাদের আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়বে। ফলে তারা দুর্বলচিত্ত বা ভীরু হৃদয়ের অধিকারী হবে।

চতুর্থ আশ্চর্য্য হচ্ছে সহদেবের দেখা ঘটনা। দুই দিকের দুই কুয়োর জল আছে মাঝের কুয়োগুলি খালি। এর অর্থ হচ্ছে কলিকালে ধনবান, ঐশ্বর্য্যবান, ক্ষমতাশালী লোক বিবাহ-উৎসবে ভোজে লাখ লাখ টাকা খরচ করবে কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ যদি দীনদুঃখী ক্ষুধাতুর বা অনাথ থাকে তবে তাকে সাহায্যের জন্য কেউ ভাববে না বা এগিয়ে আসবে না। নিজের স্বার্থপূরণে লক্ষ টাকার তেল পুড়িয়ে ঘর আলো করবে কিন্তু পাড়ার ঘরে যে জীবনদ্বীপের তেল শেষপ্রায়, সেখানে একফোঁটাও তেল ঢেলে সাহায্য করবে না।

নকুলের দেখা পঞ্চম আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথরের চাঁই প্রবলবেগে গড়িয়ে পড়ার সময় গাছের গুঁড়িতে না আটকে কিংবা কোন বড় পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে তা না থেমে শেষে একটি ঘাসের পাতায় আটকে গেল। এর রহস্য হচ্ছে, কলিকালে মানুষ ধনবান ও ক্ষমতাবান হবে। কিন্তু তার যখন পতন হবে তখন সেই পতন ধন বা ক্ষমতার দ্বারা প্রতিরোধ হবে না, তাঁর মন নীচের দিকে পড়তেই থাকবে ঐ পাথরের চাঁই-এর মত। অঢেল ধনরাশি তার পতনের গতিরোধ করতে পারবে না। আবার বৃক্ষের গুঁড়ির মতো ক্ষমতার দম্ভও তার পতনকে রুখতে পারবে না কিন্তু ঘাসের ছোট্ট একটি পাতার মত রাম অথবা কৃষ্ণনাম তার পতনোন্মুখ মনের গতিকে থামিয়ে দেবে।

হে পাণ্ডববৃন্দ ঈশ্বরের নামকে আশ্রয় করে মঙ্গলকর্মে ব্রতী হন।

একটি রাতের কথা

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও কৌরবরা ঘোরতর যুদ্ধে রত। যুদ্ধ সপ্তম দিবস অতিক্রম করে অষ্টম দিবসে পড়েছে। কৌরব শিবিরে দুর্যোধন চিন্তান্বিত; কারণ তিনি দেখলেন, যে এই সাত-আটদিনের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা অক্ষত শরীরে বেঁচে রয়েছে এবং পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করছে। অন্যদিকে, কৌরবপক্ষের অনেক যোদ্ধাই ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। পিতামহ ভীষ্ম এখন কৌরবপক্ষের সেনাপতি। তাই দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন,—''পিতামহ যুদ্ধ আপনি আমার পক্ষ নিয়ে করছেন সত্য কিন্তু মনে মনে আপনি জয় চাইছেন পাণ্ডবদের। আপনি মহারথী, ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী—আপনার সামনে যুদ্ধে স্থির থাকে এমন শক্তি জগতে কার আছে?'' ভীষ্ম বললেন, 'আমি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়েই লড়াই করছি কিন্তু পাণ্ডবরা এক কৃষ্ণের সাহায্য নেওয়ার ফলে তাঁর সামনে আমার সমস্ত শক্তি ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।'

''আপনার মত বিচক্ষণ যোদ্ধার মুখে একথা শোভা পায় না পিতামহজী, আপনি ইচ্ছা করলেই পাণ্ডবদের সংহার করতে পারেন। কৃষ্ণ বলেছেন—পঞ্চ পাণ্ডবের একজন নিহত হলেই এই মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন আগামী কালের যুদ্ধে একজন পাণ্ডবকে অবশ্যই সংহার করবেন।''

—বেশ তবে তাই হোক আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আগামী কালের রণে আমি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে সংহার করবোই করবো।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন প্রসন্ন হলেন। আনন্দের আবেশে তিনি পিতামহকে বললেন,—'পিতামহজী, আগামীকাল ব্রাহ্মমুহূর্তে আমি আমার পত্নী ভানুমতীকে আপনার কাছে পাঠাবো—আপনি ওকে আশীর্বাদদানে সুখী করে নিশ্চিন্ত করবেন। বিগত কয়েকদিনের যুদ্ধের পরিণাম দেখে ও খুবই ভেঙে পড়েছে।'

পিতামহ বললেন,—'ঠিক আছে, তুমি ভানুমতীকে সময়মত পাঠিয়ে দিও। কিন্তু সাবধান তোমার আমার এই কথা যেন কেউ জানতে না পারে।' দুর্যোধন বললেন, 'আজকের যুদ্ধশেষে সবাই এখন ক্লান্ত হয়ে আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করছে। এই সময়ে আপনি ও আমি ছাড়া এখানে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই নেই যে আমাদের কথা জানতে পারবে। ভীষ্ম বললেন, ঠিক আছে তুমি এখন যাও।' দুর্যোধন ভীষ্মের আদেশে ফিরে গেলেন আপন শিবিরে।

অপরদিকে, রাত্রে পাণ্ডবরা শুয়ে আছেন আপন শিবিরে।। শুধুই জেগে আছেন অতন্দ্র প্রহরী শ্রীকৃষ্ণ—যাঁর চরণে পাণ্ডবরা নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছেন।

সহসা রাত্রির নৈঃশব্দ ভেদ করে শ্রীকৃষ্ণ রথ নিয়ে হাজির হলেন দ্রৌপদীর কাছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। ঘোর অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টিও পড়ছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর শিবিরের দরজায় মৃদু আঘাত করে দ্রৌপদীকে জাগালেন। দ্রৌপদী দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ বিষন্নমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অজানা বিপদের আশঙ্কায় দ্রৌপদীর বুক কেঁপে উঠলো। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ইশারায় রথে উঠে বসতে বললেন। দ্রৌপদী রথে উঠে বসলেন। তখনও তার বুক কাঁপছে, তাই থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সখাদের সব কুশল তো?' শ্রীকৃষ্ণ রথ চালাতে চালাতে দ্রৌপদীকে বললেন, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা। তা শুনে দ্রৌপদীর দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। তিনি বেদনাসিক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'আপনি থাকা সত্বেও কি আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে যাবে? হে পাণ্ডব সখা, বৈধব্যের যন্ত্রণা

হয়তো আমি সহ্য করতে পারবো—আমি বিধবা হলে আপনার যে বদনাম হবে, সেই বদনামের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না, কারণ আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পাণ্ডবদের আপনি রক্ষা করবেন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ কৃষ্ণা, একদিকে ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে আমার প্রতিজ্ঞা। ভক্তের প্রতিজ্ঞার সামনে আমার প্রতিজ্ঞা যে শক্তিহীন হয়ে পড়ে।' সাশ্রু নয়নে দ্রৌপদী বললেন, তাহলে এক কাজ করুন, আপনি চিতা সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করুন, আমি সেই চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেব। পাণ্ডবদের মৃত্যুর আগে আমায় মরতে দিন যাতে আপনার উপস্থিতিতে নিজের চোখে স্বামীদের মৃত্যু না দেখতে হয়। এইটুকু কৃপা অন্তত আপনি আমায় করুন।

শ্রীকৃষ্ণ চিতা রচনা করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। দ্রৌপদীও ঝাঁপ দেওয়ার জন্য তৈরী। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'দ্রৌপদী তুমি চিতার অগ্নি পরিক্রমা করে চিতায় উঠে বসো। দ্রৌপদী বললেন, ''আমার সারা অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে আমি পা তুলতে পারছি না।'' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ''ঠিক আছে আমি তোমায় কাঁধে তুলে নিয়ে অগ্নি পরিক্রমা করছি'—এই বলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কাঁধে তুলে নিয়ে অগ্নি পরিক্রমা করতে করতে পিতামহ ভীষ্মের শিবিরের সামনে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দ্রৌপদী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—''আপনি আমায় কোথায় আনলেন? ভীষ্মের শিবিরের সামনে। কৃষ্ণ বললেন, 'তুমি শিবিরের ভেতরে প্রবেশ করো।' দ্রৌপদী বললেন, 'উদ্দেশ্য?'

—উদ্দেশ্য অবশ্যই একটা আছে। তুমি ভেতরে প্রবেশ করলেই দেখতে পাবে পিতামহ জেগে আছেন। রাত্রিশেষে দুর্যোধনপত্নী ভানুমতী আসবে ভীষ্মকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে, তার আসার আগেই তুমি পিতামহের চরণে মাথা রেখে প্রণাম জানাও। যতক্ষন না পিতামহ তোমার ''সৌভাগ্যবতীভব'' বলে আশীর্বাদ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পিতামহের চরণ থেকে মাথা তুলবে না। যাও দেরী করো না—রাত্রি শেষ হতে আর বিলম্ব নেই—আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমত শিবিরের ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই জুতোর শব্দ হতে থাকে। জুতোর শব্দ শুনে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি দ্রৌপদীর কাছে এসে দ্রৌপদীর পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিয়ে নিজের পীতবসনের এক প্রান্তে বেঁধে নিয়ে বললেন শব্দ হলে পিতামহ চিনে ফেলবেন—তাই জুতো আমার কাছে রেখে নিঃশব্দে যাও। শ্রীকৃষ্ণ জুতো পীতবসনের এক প্রান্তে বেঁধে লম্বা ঘোমটা টেনে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে ভীষ্মের শিবিরের সামনে একটা খালি জায়গায় সেই জুতো মাথার বালিশ করে শুয়ে রইলেন। দ্রৌপদী গেলেন ভিতরে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন পিতামহ ভীষ্ম ধ্যানাসনে উপবিষ্ট—দ্রৌপদী ধীর পায়ে অগ্রসর হয়ে মাথা রাখলেন পিতামহের চরণে। মস্তকস্পর্শে পিতামহের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি মনে করলেন—দুর্যোধন পত্নী ভানুমতী তাঁকে প্রণাম করছে—তাই তিনি চোখ না খুলেই আশীর্বাদ করলেন ''সৌভাগ্যবতী ভব।'' দ্রৌপদী পিতামহের চরণ থেকে মাথা তুলে বললেন—''পিতামহ রাত্রে দুর্যোধনকে দেওয়া বচন সত্য হবে, না রাত্রিশেষে আমাকে যে আশীর্বাদ করলেন সেই আশীর্বচন সত্য হবে?' দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বরে ভীষ্ম চমকে উঠলেন। আঁখি খুলে দীপের আলোয় দ্রৌপদীকে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—''দ্রৌপদী এই সময়ে তুমি এখানে কী করে এলে? আজ রাত্রে দুর্যোধনকে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম তা তুমি জানলে কি করে? তোমাকে এখানে এনেছে কে? আমাকে বলো?

—তার আগে আপনি বলুন পিতামহ—আপনার কোন বচন সত্য হবে? রাত্রে দুর্যোধনকে দেওয়া বচন? না রাত্রিশেষে আমার প্রতি আপনার আশীর্বচন?

ব্রাহ্মমুহূর্তে যে আশীর্বচন আমি তোমায় দিয়েছি, তাই সত্য হবে। বেটি! কারণ ব্রাহ্মমুহূর্তে দেওয়া আশীর্বচনের রক্ষক ভগবান কিন্তু বেটি তোমাকে এখানে যে এনেছে সে কোথায়? তাকে একবার আমায় দেখাও।

—আমাকে যিনি এনেছেন তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। দ্রৌপদীর কথা শেষ না হতেই পিতামহ ভীষ্ম আসন ছেড়ে ত্বড়িৎ গতিতে বাইরের দিকে রওনা হলেন। তখন ঊষার আলো ফুটে উঠেছে। বাইরে এসে

পিতামহ দেখলেন তার শিবিরের সামনে দরজা থেকে কিছুটা দূরে খালি মাটির উপরে জুতো মাথায় দিয়ে পীতাম্বরের ঘোমটা টেনে শুয়ে আছে একজন—ভীষ্ম বুঝতে পারলেন ব্যক্তিটি কে! তাই তাড়াতাড়ি ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে বললেন—প্রভু তোমার একি লীলা? তুমি দ্রৌপদীর জুতো মাথায় নিয়ে ঘোমটা টেনে শুয়ে আছো মাটিতে?

—কৃষ্ণ বললেন আপনার প্রতিজ্ঞাই তো আমাকে মাটিতে শুতে বাধ্য করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভীষ্মের দুচোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি সেই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়লেন এবং অশ্রুর ধারায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ দু'খানি ধুইয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি যেখানে পাণ্ডবদের রক্ষক হয়ে তাদের বধূর জুতো মাথায় নিয়ে শুয়ে থাকো—সেখানে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার সাধ্য কি পাণ্ডবদের কেশাগ্র স্পর্শ করে। যাও প্রভু, তুমি ফিরে যাও। তোমার এই ভক্তবাৎসলতা অমর হোক। আজকের যুদ্ধেই আমি শরীর ত্যাগের সংকল্প গ্রহন করবো।''

ইতিমধ্যে দ্রৌপদী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার দিকে চেয়ে ভীষ্ম বললেন—যাও কন্যা, নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাও। যে পক্ষের কুললক্ষ্মীর পায়ের জুতো ভগবান বহন করেন—আমার মত শত ভীষ্মের সাধ্য নেই সেই পক্ষের একজনের প্রাণ হননের।

ভোরের আলো ভালো করে ফোটার আগেই রথসহ দ্রৌপদীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব শিবিরের দিকে রওনা দিলেন। নির্বাক নিস্পন্দ ভীষ্ম অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই পথ-পানে, যে পথ ধরে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী।

বোনের দাদা—দাদার ভাই

শ্রাবণ মাসের রাখী পূর্ণিমা। সমগ্র দ্বারকা নগরী জুড়ে রাখীবন্ধনের উৎসব মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। দ্বারকায় আনন্দ যেন আজ মূর্তিমান হয়ে পরমোল্লাসে নৃত্য করছে। অভিমন্যু জননী সুভদ্রা দ্বারকায় এসেছেন হস্তিনাপুর থেকে। উদ্দেশ্য আনন্দ উৎসবে দাদা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের হাতে রাখী পরাবেন। প্রাসাদের নিভৃতকক্ষে স্বর্ণ থালিতে প্রজ্বলিত দীপ-পুষ্পমালা-চন্দন-রেশমসূত্রের তৈরী রাখী ও অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার সাজিয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন অগ্রজ ভ্রাতাদের জন্য।

যথাসময়ে স্নানাদি সমাপন করে নববস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুভাই সুভদ্রার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ভগ্নী সুভদ্রা সর্বপ্রথম বড়দাদা বলরামকে আরতিবন্দনা করে, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য অর্পন করে কপালে তিলক অঙ্কিত করে হাতে রাখীর মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিলেন। অতঃপর বলরামকে মাখন ও মিছরী খাওয়ালেন। বলরাম মাখন মিছরী খেতে খেতে ভগ্নীকে আশীর্বাদ করলেন। সুভদ্রাও অগ্রজের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম জানালেন এবং অগ্রজের দীর্ঘজীবন কামনা করলেন।

অনন্তর সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপনীতা হয়ে তাঁকেও আরতি বন্দনাদি করে কপালে তিলকাদি রচনা করে, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য অর্পণকরত হাতে রাখীর মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দিয়ে মাখন মিছরী খাওয়ানোর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সহসা থালি থেকে মাখন মিছরী নিজ হাতে তুলে নিলেন। তা দেখে বলরাম টিপ্পনি কেটে বললেন, 'ভগ্নি সুভদ্রে! তোমার এই দাদাটি মাখন চুরির অভ্যাস দেখছি এখনও ত্যাগ করতে পারেনি।' টিপ্পনী কেটে বলরাম মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। তা দেখে কৃষ্ণ বললেন,—'দাউজী [দাদাজী] চুরি আমি করি কিন্তু খাও তুমি। মাখন চুরি করে খাওয়ানোই আমার স্বভাব—ওতেই আমার আনন্দ।' থালি থেকে তুলে নেওয়া মাখন মিছরী সুভদ্রাকে খাওয়াতে খাওয়াতে বলরামের কথার উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। খাওয়া শেষ হলে সুভদ্রা কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ সুভদ্রাকে বললেন,—'ভগ্নি, আজ তোমার জন্য আমি একটা উপহার এনেছি।'

উপহারের কি দরকার? তোমাদের আশীর্বাদ স্নেহ-ভালোবাসাই তো আমার পরম সম্পদ।

—ভগ্নি ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে হাতে যে রক্ষা বন্ধনী বেঁধে দেয় তার বিনিময়ে তাকে কিছু দেওয়াও যে ভাইয়ের কর্তব্য। শুধু মৌখিক আশীর্বাদেই লৌকিক কর্তব্য সম্পন্ন হয় না।

আমাকে উপহার দিয়ে যদি তুমি সুখী হও, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ একটি কাঠের সিন্দুক খুলে একটি অপরূপ দারুনির্মিত রথ ভগ্নি সুভদ্রার হাতে তুলে দিলেন। রথের তিনটি প্রকোষ্ঠ। মধ্যের প্রকোষ্ঠটিতে ভগ্নি সুভদ্রার মূর্তি সুন্দরভাবে নির্মিত করে স্থাপন করা হয়েছে। দুপাশের দুটি প্রকোষ্ঠের একটিতে বলরাম ও অন্যটিতে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দারুমূর্তি বিরাজমান। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে—তিনটি দারুমূর্তিই কথা বলতে পারে। যে প্রকোষ্ঠটিতে বলরাম মূর্তি বিরাজমান তার নাম তালধ্বজ রথ, পাশের অন্য যে প্রকোষ্ঠটিতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি বিরাজ করছে তার নাম গরুড় ধ্বজ রথ, এবং মধ্যের প্রকোষ্ঠটির নাম দেবীদলন রথ—যার মধ্যে ভগ্নি সুভদ্রার মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

দারুনির্মিত রথে দারুমূর্তি দেখে অগ্রজ বলরাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। উপহাসের সুরে তিনি কৃষ্ণকে বললেন,—'কৃষ্ণ! সুভদ্রা এখন আর ছোট্ট খুকী নয় যে ওকে কাঠের খেলনা বা পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে। তাছাড়া ভগ্নির এখন পুতুল খেলার বয়সও নেই—যে তোমার দেওয়া পুতুল নিয়ে খেলা করবে। ও এখন অভিমন্যুর মত বীরপুত্রের মা। তুমি দ্বারকাধীশ। উপহার যদি দিতেই হয় তবে ভগ্নিকে ধনদৌলত দাও। কাঠের খেলনা, কাঠের পুতুল দিয়ে আদরের বোনটিকে আর কাঠের পুতুল তৈরি করে মন খুশী করার চেষ্টা করো না। ওসব আজে বাজে তুচ্ছ পদার্থ প্রদান করে ভগ্নির মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টা ত্যাগ করো।' বলরামের

কথা শেষ হলে কৃষ্ণ বললেন,—'তুমি ঠিকই বলেছ দাউজী। বৃদ্ধবয়সে কখনও কখনও বাল্যস্বভাব বা বাল্যাবস্থা ফিরে আসে। যেমন তোমার এখনও বাল্য স্বভাব রয়েই গেছে।'

—তার মানে?—বলরামের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা।

বাল্যকালে তুমি আমার কালো শরীর নিয়ে খুবই ব্যঙ্গ করতে, সখাদের সামনেই বলতে—বাবা নন্দ গৌরবর্ণের, মা যশোদা গৌরাঙ্গী, আর আমি কেন কালো হলাম। আবার আজ ব্যঙ্গ করে বলছো—দ্বারকাধীশ, ভাইকে ব্যঙ্গ করে বিরক্ত করার অভ্যাসটা তোমার গেল না দাউজী।

—তুমি কি বলতে চাও যে তুমি দ্বারকাধীশ নও?

—দ্বারকাধীশ আমি কখন হলাম—দ্বারকাধীশ তো তুমিই।

—একথার অর্থ?

—দ্বারকার রাজকোষের একটি স্বর্ণ মুদ্রাও কি তোমার বিনা অনুমতিতে ব্যয় হয়? আঠারো অক্ষৌহিনীর সেনানায়ক কে? আমি না তুমি? প্রজা পরিষদের অধ্যক্ষ কে? তুমি-তুমি-সব তুমি দাউজী। আমি তোমার দ্বারকার সব প্রজার পাদ-প্রক্ষালনকারী এক সেবক। উচ্ছিষ্ট পাত্র উত্তোলনকারী এক দাস মাত্র। সমগ্র দ্বারকাবাসীর নিযুক্ত নৃত্যগীত শিল্পকলার অনুরাগী এক ক্ষুদ্র শিক্ষক। দারু শিল্পকার্য আমি ছোট থেকেই ভালোবাসি। সেইজন্য বহুদিন ধরে বেশ কয়েক মাসের নৈষ্ঠিক প্রচেষ্টায় এই দারুশিল্পটি তৈরি করেছি—আজকের দিনটিতে ভগ্নি সুভদ্রাকে উপহার দেব বলে। এটা আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় শিল্পকর্ম—আজ পূণ্য তিথিতে এটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা কি ঠিক?

বলরাম নিরুত্তর। শ্রীকৃষ্ণের দুই নয়ন অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। সুভদ্রা তা লক্ষ্য করে পরিস্থিতি হালকা করার জন্য কৃষ্ণের বুকে মাথা রেখে বলেন—ভাইয়া, তুমি আমার সঙ্গে হস্তিনাপুর যাবে?

—না বোন, তোমাকে তোমার শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে দাউজী।

—তুমি কেন যাবে না ভাইয়া? তুমি ও দাউজীর সঙ্গে চলনা? দুজনায় গেলে খুব আনন্দ হবে। চল না ভাইয়া—

—হিমালয় থেকে কয়েকজন সাধু মহাত্মা আসবেন। সৎসঙ্গ হবে। তাদের সেবা করবে কে?

—তুমি ও বড় ভাইয়া ছাড়া আর যারা রয়েছেন, তাদের হাতে সেবার ভার দিয়ে চল না বোনের বাড়ি একটু বেড়িয়ে আসবে।

—সাধু মহাত্মার সেবা কার্যভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করি। অন্য কাউকে এই দায়িত্ব আমি অর্পণ করি না। তুমি তো জানো—সেবা কর্মই আমার প্রথম ও প্রধান ধর্ম।

সুভদ্রা কৃষ্ণ ভাইয়ার কথা শুনে উদাস হয়ে গেলেন। একটা বিষণ্ণতার ছাপ তার সারামুখে ছড়িয়ে পড়লো। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে সুভদ্রার মাথায় হাত রেখে স্নেহার্দ কণ্ঠে বললেন—এই দারুনির্মিত রথস্থিত মূর্তি হাতে নিয়ে তুমি যখনই আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবে তখন আমরা দুইভাই তোমার কথার উত্তর দেব এবং তোমার সঙ্গে বার্তালাপ ও করবো। বিশ্বাস না হলে তুমি রথস্থিত মূর্তিগুলি পরীক্ষা করে দেখতো পারো।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সুভদ্রা অপলক নয়নে দারুমূর্তিগুলির দিকে চেয়ে থাকেন। সহসা তিনমূর্তির অধর স্পন্দিত হয়ে উচ্চারিত হয়—ওম জগন্নাথায় নমঃ। সমগ্র কক্ষে সেই বাণী অনুরণিত হয়। সুভদ্রা অশ্রুভরা নয়নে শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনার ছলে পাদপ্রক্ষালন করেন। বলরাম প্রেমার্দ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বুকে চেপে ধরে বলেন—ভাই কৃষ্ণ, তোমার হৃদয় না বুঝে তোমাকে অনেক ব্যঙ্গ করেছি—আমায় ক্ষমা করো।

কৃষ্ণ বলরামের মুখ চেপে ধরে বলেন—দাউজী, ছোট ভাইয়ার কাছে ক্ষমা চাইতে নেই। ভাইয়া শুধুই তোমার স্নেহের ভাইয়া।

হেমন্তের শিশিরসিক্ত শীতল বাতাসে নতুন ধানের গন্ধ উৎসবের বার্তা বহন করে আনে ব্রজের নন্দগ্রামে। নতুন ধানের গন্ধে নন্দগ্রামে নবান্নের সানন্দ পদধ্বনি শোনা যায়। শিশু-বৃদ্ধ-তরুণতরুণী-গোপগোপীরা সবাই উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। অঙ্গনে অঙ্গনে নব শস্যরাশির স্তূপ। অঙ্গে অঙ্গে নব সাজ-সজ্জার বাহারীরূপ। নবান্ন উৎসবে একদিকে যেমন গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হয়, তেমনি অন্যদিকে পশুপাখীর ও পূজা হয়। ঋষি-ব্রাহ্মণ-অতিথিদের অন্ন-মিষ্টান্ন-বস্ত্রাদি-'রত্ন দান করা হয় প্রচুর পরিমাণে। প্রতিটি গৃহের বহির্দ্বার নানা পত্র-পুষ্প ও পল্লবদ্বারা সুসজ্জিত। আজ যমুনার তীরে গোচারণ বন্ধ। কানাই-বলাই সকাল থেকেই বাড়িতে রয়েছে। সখারা বাইরের রাস্তায় নতুন পোশাক পরে খেলা করছে। মাঝে মাঝে তাদের আনন্দ কোলাহল নন্দালয়ে ভেসে আসছে। কানাই আজ সখাদের সঙ্গে খেলতে না যাওয়ায় দাদা বলাই মা যশোদা সবাই বিস্মিত। কি ব্যাপার দুরন্ত কানাই আজ শান্ত হয়ে মায়ের কোলে বসে কেন? দাদা বলাই ভাবেন কানাইয়ের কি শরীর খারাপ? যশোদা ও ভাবেন আজ আমার নীলমণি এত চুপচাপ কেন? জ্বরটর হয়নি তো? কানাই-এর শরীরে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন—শরীর তো ঠান্ডা রয়েছে। কানাই মিটিমিটি হাসছে। যশোদা কানাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করেন—''কি রে কানাই, আজ খেলতে গেলি না কেন? যা, বাইরের রাস্তায় সখাদের সঙ্গে খেলগে যা'। কানাই বলে—''মা, আজ তোমার কোল ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে সারাটা দিন তোমার কোলেই বসে থাকি।''

কানাইয়ের কথা শুনে মা যশোদার বক্ষের দুগ্ধাধার থেকে স্নেহের অমৃতরস বেরিয়ে আসে। তিনি কানাইয়ের দুই ঠোঁটের ফাঁকে তা চেপে ধরেন। কানাই পরমানন্দে মা যশোদার বাৎসল্য রস পীযুষ পান করতে থাকে। দক্ষিণদিকের স্তনাধার স্বল্পক্ষণ পান করেই কানাই যশোদার বামদিকের স্তনাধার পান করতে যাওয়ার আগেই অগ্রজ বলরাম এসে বাধা দেয়। কানাইকে চোখ পাকিয়ে বলে,—'এই তুই আমার ভাগেরটা খাচ্ছিস যে?' কানাই বলে,—'বেশ করেছি খাবই তো?' আমার মায়ের সব দুধই আমি খাব তুমি বলবার কে? তুমি রোহিনী মায়ের দুধ খাওগে যাও।' কানাইয়ের কথা শুনে যশোদা বলেন—''কানাই তুমি যখন রোহিনী মায়ের দুধ খাও, তখন বলাই তো তোমাকে কিছু বলে না—তাহলে তুমি এখন দাদার সাথে দুধ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করছো কেন? দাদাকে দাদার ভাগটা খেতে দাও।'' মায়ের কথায় কানাই বলাই-এর দিকে চেয়ে বলে—''ঠিক আছে দাদা তুমি তোমার ভাগেরটা খাও, আমি আমারটা খাই কিন্তু দাদা রাতের বেলায় তুমি যখন রোহিনী মায়ের কাছে শোবে তখন যেন আমার ভাগের দুধটা খেয়ে নিও না।'' ইতিমধ্যে রোহিনী মা ও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উভয় জননী কানাই-বলাই-এর দুধ খাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকেন। কানাই-বলাই মনের সুখে মা যশোদার স্তন সুধা পান করতে থাকে। তা দেখে রোহিনী বলেন আজ উৎসবের দিনে মাঠে গোচারণ বন্ধ অথচ ঘরে গোপালক শিশু দুটির দুরন্ত পনার বিরাম নেই। কানাই বলাই রোহিনীর কথায় কান না দিয়ে উভয়ে উভয়ের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে এবং মহাসুখে মায়ের দুধ পান করতে থাকে।

অন্যদিকে যে সব সখারা রাস্তায় খেলা করছিল তারা তাদের মাঝে কানাই-বলাইকে না পেয়ে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। খেলার যে আনন্দ সেই আনন্দ তারা পেয়েও যেন পাচ্ছিল না। তাই মাঝে মাঝে খেলা থামিয়ে তারা কানাই-এর বাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু কানাই-বলাই কারও কোন পাত্তাই নাই। ওরা দুইভাই আজ যেন প্রতিজ্ঞা করেছে বাড়ি থেকে বের হবে না। সখারা যখন কানাইয়ের বাড়ির দিকে চেয়ে-কানাইয়ের আসার অপেক্ষা করছে—ঠিক তখনই সেই রাস্তার বিপরীত দিকে একটা

কণ্ঠস্বর ভেসে আসে : ''এসো এসো খোকাখুকু, এসো গোপগোপী, এসো এসো গ্রামের যত সখা-সখী, এনেছি এক মজার পাখী, বহুৎ জ্ঞানী, দেখামাত্র করে সে ভবিষ্যৎবাণী, বিশ্বাস না হলে নিজে এসে দেখে যাও।'

কানাইয়ের সখারা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রাস্তা দিয়ে একজন পাখীওয়ালা আসছে। দেখামাত্রই সখারা ছুটে গিয়ে সেখানে তাকে ঘিরে ভীড় করে দাঁড়াল। তাদের দেখাদেখি অনেক গোপ-গোপরমণী ও সেখানে হাজির হল। গোপেদের মধ্যে একজন পাখীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল—''তোমার পাখীর নাম কি ভাই?'' পাখীওয়ালা বলে, পাখীকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও, পাখীর নাম কি?

তখন সখারা জিজ্ঞাসা করে—''এই পাখী তোর নাম কি?''

পাখী বলে—''আমার নাম সখা।''

পাখীকে মানুষের মতো কথা বলতে দেখে সখারা এবং গ্রামের অন্যান্যরা সব অবাক হয়ে যায়।

গ্রামের কেউ কখনও এমন সুন্দর কথাবলা পাখী দেখেনি। তোতা-ময়না-ময়ূর-এর চেয়েও এই পাখীটা দেখতে অনেক সুন্দর। পাখীওয়ালা পাখীটার একটা পা কালো দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে—দড়ির অন্য প্রান্ত হাতে ধরা আছে, যাতে পাখী উড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। পাখীটার প্রতি সকলের উৎসাহ ও কৌতূহল দেখে পাখীওয়ালা পাখীটার খুব প্রশংসা করতে শুরু করে। সে বলল, পাখীটা খুব জ্ঞানী। ভূত ভবিষ্যত বলতে পারে এবং যা বলে সবই সত্য। পাখী মিথ্যা বলতে জানে না। গ্রামে সবাই জিজ্ঞাসা করে—পাখীটা কোথা থেকে এনেছো? পাখী খায় কি? পাখীওয়ালা উত্তর দেয়—পাখীটা এনেছি অনেক দূর হিমালয় থেকে। ফলমূল, শস্য দানা হচ্ছে এর আহার। কানাইয়ের সখাদের মধ্যে একজন বললো,—'ও পাখীওয়ালা তুমি একবার নন্দবাবার বাড়ি চলো। সেখানে আমাদের সখা কানাই আছে, সে তোমার পাখীর সঙ্গে কথা বলবে। আমরা তা শুনবো।' পাখীওয়ালা বলে—''বেশ চলো, আমি তো তোমাদের নন্দবাবার বাড়ি চিনি না, তোমরা আমায় পথ চিনিয়ে নিয়ে চলো।' সখারা পাখীওয়ালার আগে আগে যায়। আনন্দে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। নন্দবাবার বাড়িতে প্রবেশ করে সখারা চীৎকার করে বলে—এই কানাই, দেখ দেখ কি সুন্দর একটা পাখী এনেছে দেখ। কানাই তখন দুধ খাওয়া শেষ করে নন্দবাবার কোলে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। সখাদের কথা কানে যেতেই চোখ খুলে এক লাফে বাবার কোল থেকে নেমে পাখীওয়ালার দিকে দৌড়ে গেল। পাখীটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো—''কি রে পাখী তুই আমার কাছে আসবি না? আমার সাথে কথা বলবি না?'' মধুর স্বরে পাখী উত্তর দেয়,—'তোর সঙ্গে কথা বলবো না তো, আর কার সঙ্গে কথা বলবো? কথা তো তোর সঙ্গেই বলতে হয়। তুই যে আমার সখা হোস।'

পাখীর কথা শুনে কানাইয়ের চোখে জল আসে। সে পাখীওয়ালাকে বলে—''তাউজী [জ্যাঠা বা কাকামশায়] আমাকে তুমি পাখীটা দিয়ে যাও।'' পাখীওয়ালা বলে—''তা কি করে সম্ভব। পাখী যে আমার রুজি রোজগার সব। পাখীটা তোমাকে দিয়ে দিলে আমার সংসার চলবে কেমন করে? এ পাখী আমি তোমায় দিতে পারবো না বাবা।'' তখন পাখীটি হঠাৎ বলে উঠলো,—'আমি কানাইয়ের কাছে যাবো। কানাইয়ের সাথে খেলবো। আমি তোমার কাছে আর থাকবো না। তুমি আমার পায়ের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ। আমার পায়ে ব্যথা হয়। আমি তোমার কাছে কিছুতেই থাকবো না।'

মা যশোদা অদূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন—পাখী, পাখীওয়ালা ও কানাইয়ের কথা। কানাই যখন পাখীটি চেয়েছে তখন কানাইকে ঐ পাখীটি কিনে দিতেই হবে—নইলে কানাই রাগ করবে—রাগ করলে ঘরে তার দুষ্টুমিও বাড়বে। তাই তিনি দেরী না করে প্রচুর মূল্যবান রত্নে পূর্ণ একটি বৃহৎপাত্র নিয়ে পাখীওয়ালাকে বললেন—''এই নাও বাবা তোমার পাখীর মূল্য। আমার কানাইকে তোমার পাখীটি এইবার দিয়ে যাও। আশা করি এতে তোমার রুজি রোজগার ভালোভাবেই সম্পন্ন হবে।'

পাখীওয়ালা পাখীটি কানাইকে দিয়ে দিল। কানাই প্রথমে পাখীটার পায়ে বাঁধা দড়ি খুলে দিল। পাখী উড়ে গিয়ে মনের আনন্দে কানাইয়ের কাঁধে বসলো। কখনও বা উড়ে গিয়ে বলরামের কাঁধে, কখনও বা যশোদার

কাঁধে বসে। কানাই পাখীকে আদর করে জিজ্ঞাসা করে—''সখা তুই মাখন মিছরী খাবি তো?'' তখন পাখীওয়ালা বলে—''এ কেবল ফল খায়, মাখন মিছরী খাওয়ালে মরে যাবে।'' পাখী তা শুনে বলে—সখা ওর কথায় কান দিস না, তুই যা খাওয়াবি আমি তাই খাবো।' পাখীর কথা শুনে সখারা আনন্দে হাততালি দেয়। হেসে লুটোপুটি খায়। পাখীওয়ালা মূল্য স্বরূপ প্রচুর রত্ন পেয়ে খুশী মনে বাড়ি ফিরে যায়। সখারা পাখী নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে খেলা করে।

দেখতে দেখতে দিন যায়, রাত্রি আসে প্রভাত হয়। কানাই পাখীকে জিজ্ঞাসা করে—'কি রে সখা, তুই আমার সঙ্গে বনে যাবি না, সেখানে অনেক পাকা পাকা ফল আছে তুই ফল খাবি, গান করবি আর আমি গরু চরাবো। তারপর সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে আসবো। মা তোর জন্য সোনার খাঁচা তৈরি করে রাখবে। সেখানে তুই বিশ্রাম করবি। পাখী বলে,—'এ তুই কি কথা বলছিস সখা। তুই আবার আমাকে সোনার খাঁচায় বন্দী করে রাখতে চাস। বন্দী করেই যদি রাখবি তবে আদর করে আমার পায়ের বাঁধন খুলে দিলি কেন? সখা আমাকে আর খাঁচায় বন্দী করিস না। আমি তোর কাছেই শুয়ে থাকবো—সেই হবে আমার বিশ্রাম।'

কানাই বলে,—'বেশ ঠিক আছে তাই হবে। কিন্তু সখা, তুই ডিম দিবি কখন? তোর ডিম থেকে বেশ ছোট ছোট বাচ্চা বের হবে, আমরা সবাই মিলে তোর সেই বাচ্চাদের সাথে খেলবো।'

পাখী বলে—সখা তুই কি বোকারে!

—কেন?

—ডিম দেয় পক্ষিনী, আমি তো পক্ষী।

—তোর পক্ষিনী কোথায় থাকে?

—সে থাকে অনেক দূরে-হিমালয়ের ওপারে।

—কানাই পাখীটাকে আদর করে চুমু খায় আর বলে—''পক্ষিনীর জন্য তোর মন খারাপ করে না, যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

কানাই পাখীকে আকাশে উড়িয়ে দেয়। পাখী উড়ে যায় হিমালয়ের দিকে। কানাই একদৃষ্টিতে নীল আকাশপানে চেয়ে থাকে।

''নন্দগ্রাম ছেড়ে উড়ে যায় পাখী—মেলে দুই ডানা।
কানাইয়ের কাছে পেয়েছে খুঁজে সে আপনার ঠিকানা।।

কৃষ্ণ ও বিদুর পত্নী

হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে একখানি ছোট্ট কুটির। এই কুটিরে বাস করেন বিদুর ও তৎপত্নী সুলভা। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও অমাত্য। সমগ্র মহাভারতে তিনি ধর্মাত্মা রূপেই পরিচিত। তৎপত্নী সুলভাও স্বামীর মত ধর্মপ্রাণা। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে—এমন সময়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ এলেন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। মহাত্মা বিদুর কৃষ্ণ আগমনের সংবাদ পেয়ে আনন্দে পত্নীকে বললেন—কৃষ্ণ কুরুরাজ ও পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে কথা শেষ করে আমাদের গৃহে পদার্পণ করবেন ও আতিথ্য গ্রহণ করবেন। তুমি কৃষ্ণের জন্য যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করে রেখ।

স্বামীর কাছে কৃষ্ণ আসার কথা শুনে বিদুর পত্নীর সারা শরীর-মন-প্রাণ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি ঘর-প্রাঙ্গণ সমস্ত কিছু গোময় দ্বারা ধৌত করে সুন্দর করে পত্রপল্লব দ্বারা সাজিয়ে রাখলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আহারের জন্য কী কী রান্না করবেন এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন সুলভা। কৃষ্ণ আগমনের সংবাদে হৃদয় তাঁর আনন্দে বিভোর। তিনি স্নানের জন্য গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত কূপের নিকট উপনীতা হয়ে ব্যস্তচিত্তে স্নানে মনোনিবেশ করলেন। স্নান করছেন আর হৃদয়ে ভাবছেন হৃদয়েশ্বর কৃষ্ণের কথা। হৃদয়ে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করতে করতে তিনি ভাববিহ্বলা হয়ে পড়লেন। এমন সময়ে বাইরের দরজায় মৃদু করাঘাত! বিদুরপত্নী তন্ময়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—কে?

প্রত্যুত্তরে দরজায় করা ঘাতকারী বলেন—''মা, দরজা খোল, আমি এসেছি।''

বিদুরপত্নী কৃষ্ণকণ্ঠ শুনেই আলুথালু বেশে সিক্ত বসনেই ছুটে গেলেন দরজার কাছে। দরজা খুলতেই সেই নয়নাভিরাম ভুবনভুলানো শ্রীমুখের দর্শন হতেই আনন্দ আবেশে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণরূপ—মাধুরী। কৃষ্ণরূপ দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃতা হয়ে ভুলে গেলেন তিনি কৃষ্ণকে আহ্বান জানাতে। তা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বললেন—''মা-মাগো আমি এসেছি তোমার কাছে, খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমায় কিছু খেতে দাও।' কথাগুলি বলে কৃষ্ণ নিজেই বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এবং নিজহাতে একখানি আসন সংগ্রহ করে তাতে উপবেশন করলেন। উপবেশনের পর পুনরায় বিদুরপত্নীকে লক্ষ্য করে বললেন—''কি গো মা আমায় কিছু খেতে দেবে না? আমার যে খুব ক্ষিধে পেয়েছে।'

কৃষ্ণের কথায় সম্বিৎ ফিরে পান বিদুরপত্নী। ভাবেন তাই তো কি খেতে দিই কৃষ্ণকে? এখনো যে রান্না হয়নি। সবে স্নান শেষ হয়েছে মাত্র। ভাবতে ভাবতে বিদুর পত্নীর সহসা মনে পড়ে ঘরের অভ্যন্তরে রাখা পাকাকলাগুলির কথা। তিনি দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করে কলার ছড়া হাতে নিয়ে বাইরে এসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপবেশন করে কৃষ্ণকে কলা খাওয়াতে শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণকে আজ নিজের হাতে খাওয়াবেন এই ভাবনায় বিদুর পত্নীর জগৎ সংসার এমনকি দেহজ্ঞান পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়। আনন্দ ভাব—বিহ্বল চিত্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখে কলা ছাড়িয়ে কলার খোসাটা তুলে ধরেন—শাঁসটা ফেলে দেন। কৃষ্ণ পরমানন্দে কলার খোসা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকেন। বিদুরপত্নী জিজ্ঞাসা করেন,—''কলা মিষ্টি আছে তো?'' কৃষ্ণ বলেন,—'খুব মিষ্টি। এতো মিষ্টি কলা এর আগে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না'।

ভক্তের অন্তরের ভাব আস্বাদনে ভগবান ও জানেন না তিনি কি খাচ্ছেন। সহসা প্রবেশ করেন বিদুর। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে ঐভাবে কলার খোসা খাওয়ানো হচ্ছে দেখে বিস্মিত হলেন। পত্নীর দিকে চেয়ে বিদুর বললেন,—'সুলভা তুমি কৃষ্ণকে একি খাওয়াচ্ছো? বিদুর পত্নীর হাত থেকে কলার ছড়াটা

নিজের হাতে নিয়ে বললেন,—'যাও, তুমি ভিতরে গিয়ে ভিজে কাপড় বদলিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ খাওয়াতে থাকি।'

সুলভা স্বামীর কথায় চমকে ওঠেন। সম্বিত ফিরতেই তিনি দেখেন যে তিনি কৃষ্ণকে এতক্ষণ ধরে কলার খোসা খাওয়াচ্ছিলেন সিক্ত বসন পরিধান করে। স্বামীর কথায় লজ্জাবনতা হয়ে ঘরের অভ্যন্তরের প্রবেশ করলেন বসন বদলানোর জন্য। ইত্যবসরে বিদুর কৃষ্ণের কাছে বসে কৃষ্ণকে কলা খাওয়াতে শুরু করেন। তিনি খোসা ছাড়িয়ে একটি কলা শ্রীকৃষ্ণের হাতে দেন। শ্রীকৃষ্ণ তা খেয়ে বিদুরের দিকে চেয়ে বলেন—''তাত! এই কলায় সেই মধুর স্বাদ নেই—যা মায়ের হাতে খাওয়ানো কলার খোসায় ছিল।'

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনে বিদুরের দুনয়ন অশ্রুতে ভরে ওঠে। তিনি কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বলেন—তোমার কোন স্বাদ প্রিয় লাগে তা আমি জানি কিন্তু আমার পত্নীর হৃদয়ে তোমার প্রতি যে স্নেহ প্রীতি আছে তা আমি কোথায় পাবো? আমার হৃদয়ে আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তা। আমার পত্নীর হৃদয় জুড়ে শুধু তোমার আনন্দঘন রূপের চিন্তা।

রক্ষা বন্ধন

ছোট্ট নদী শিপ্রা। এই নদীর তীরে অবস্থিত অবন্তীনগর। বর্তমান নাম উজ্জয়িনী। এখানেই মহর্ষি সন্দিপনীর গুরুকুল আশ্রমে অধ্যয়নরত কৃষ্ণ ও বলরাম। গুরু—গুরুপত্নী ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সকলেই কৃষ্ণ বলরামের গুরুভক্তি নিয়মনিষ্ঠা ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ। এককথায় আশ্রমের সকলের নয়নমণি কৃষ্ণ বলরাম। তাঁদের সুমধুর যুগলকণ্ঠের বৈদিক মন্ত্রের স্পষ্ট উচ্চারণ গুরুদেব পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শোনেন। এই আশ্রমের এক পড়ুয়ার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের আশ্রমে আসার প্রথম দিন থেকেই পড়ুয়াটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং কৃষ্ণকে সে প্রথম দিন থেকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেন। পড়ুয়াটির নাম সুদামা। সে শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুভক্তি, বাককুশলতা ও রূপমাধুরী দেখে মুগ্ধ হয় এবং নির্জনে একা বসে ভাবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ভগবান। ভগবান ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে এত রূপগুণ থাকা সম্ভব নয়। গুরুর কাছে অধ্যয়নের সময় সুদামা শ্রীকৃষ্ণের একদিকের পাশের আসনটিতে বসেন অন্যপাশে বসেন দাদা বলরাম। একদিন অপরাহ্নে অধ্যয়ন শেষে কৃষ্ণ ও সুদামা যখন আলাপমগ্ন ছিলেন তখন গুরুপত্নী তাদের উভয়কে বন থেকে কাঠ কন্দমূল ও ফল সংগ্রহ করে আনার জন্য আদেশ করলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র দুই বন্ধুতে বনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

রাস্তায় চলতে চলতে শ্রীকৃষ্ণ সুদামার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—'বন্ধু! তুমি তো আমাকে প্রেমের শক্ত বাঁধন দিয়ে বেঁধে ফেলেছো। আমার সাধ্য নেই তোমার প্রেমের বাঁধন ছিন্ন করা।' কৃষ্ণের মুখে কথাটা শোনামাত্রই সুদামার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সে সহসা কোন কথা বলতে পারে না। তার যেন মনে হল সে কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বিচরণ করছে না—সে বিচরণ করছে ব্রহ্মলোকে। ভাব বিহ্বল কণ্ঠে সে বলে,—'কানাই তুমিই তো সাক্ষাৎ ভগবান।'

কৃষ্ণ বলেন,—'বন্ধু সুদামা, আমরা সবাই তো ভগবানের অংশ। প্রত্যেক প্রাণীর বা জীবের মধ্যে ভগবানের কিছু না কিছু গুণের বিকাশ দেখা যায়। যেমন তোমার মন্ত্রশক্তি, নামভক্তি, ইষ্টনিষ্ঠা ও প্রেম ভগবান প্রদত্ত। সংসারে তোমার মতো বন্ধু পাওয়া দুর্লভ।' কৃষ্ণের কথা শুনে সুদামা বলেন,—'কানাই, আমি তো সামান্য এক দীন ব্রাহ্মণ মাত্র। জগতে আমার মতো নির্ধন-দরিদ্র আর কেউ নেই।' কৃষ্ণ সুদামার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেন, ''ও কথা বলো না বন্ধু। সংসারে তোমার মতো ধনবান আর কেউ নেই। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই ভগবানের নিবাসস্থল। তোমার হৃদয়ভরা প্রেম। আর সেই প্রেমে ভগবানকে তুমি বশে রেখেছো। ভগবানের কাছে ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, উঁচু-নীচু, এইসব ভেদ নেই।' এইভাবে কথা বলতে বলতে দুই বন্ধু বনের গভীরে প্রবেশ করলেন।' সেখানে যজ্ঞের জন্য কাঠ কন্দমূল, ফলপুষ্প ও কুশআদি সংগ্রহ করে একত্র করে পুনঃ দুই বন্ধুতে বার্তালাপ শুরু করলেন। কুশতৃণের গোছা বাঁধতে বাঁধতে কৃষ্ণ বললেন,—'বন্ধু তুমি তো এক মহান শিল্পী। কুশ তৃণ দিয়ে তুমি নানা অলংকার ও যজ্ঞোপবীত তৈরি করতে পারো শুনেছি। আমি এও শুনেছি যে তোমার তৈরি কুশতৃণের অলংকার ও যজ্ঞোপবীত এর কাছে স্বর্ণাদি রত্ন নির্মিত অলংকারও তুচ্ছ বা ম্লান হয়ে যায়।' কৃষ্ণের কথা শেষ হতেই সুদামা বলেন,—''বন্ধু, আমিও শুনেছি তুমি একজন ভালো দারুশিল্পী। তুমি নাকি কাঠের খুব সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরি করতে পারো— তোমার তৈরি মূর্তির কাছে বিশ্বকর্মার সৃষ্টি ও নাকি তুচ্ছ হয়ে যায়।' দুই বন্ধুতে এইভাবে যখন পরস্পর পরস্পরের শিল্পকর্মের প্রশংসা করছিল, তখন সহসা চারিদিকে আঁধার নেমে এল। ঝড় শুরু হল। মাথার উপরে শোনা যায় মেঘের গুরু গুরু গর্জন! কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। দুজনেই হতচকিত হয়ে পড়ে। আশ্রমে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। কিন্তু সে বিদ্যুতের চমকানিতে ঘন বনের পথ দেখা যায়

না। দেখতে দেখতে আঁধার আরও ঘনীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ভিজতে দেখে সুদামা দুই বাহু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে রাখে। শ্রীকৃষ্ণের কোন অঙ্গে যাতে বৃষ্টি বা ঝড় না লাগে তার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সুদামা যেন কৃষ্ণের অগ্রজ। কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করাই যেন তার একমাত্র কাজ। কৃষ্ণ সুদামার বুকের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এইভাবে সারারাত দুই বন্ধুতে মিলে বনের মধ্যে একটা গাছের নীচে অতিবাহিত করে। দেখতে দেখতে সকাল হয়। প্রভাতের আলো ফুটে ওঠে। বনভূমে এখন আর আঁধার নেই—নেই ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবনর্ত্তন। সারারাত দুই বন্ধু আশ্রমে ফেরেনি। তাই গুরুদেব সন্দিপনী বলরাম ও অন্যান্য বিদ্যার্থীর সঙ্গে বনে প্রবেশ করে কৃষ্ণ সুদামার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উপস্থিত হলেন সেই গাছতলায়, যেখানে সুদামার বুকের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তখনও পর্যন্ত। এই দৃশ্য দেখে গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি উভয়কে নাম ধরে ডাকতেই উভয়েই গুরুদেবের কাছে উপনীত হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম জানালেন।

গুরুদেব সুদামার মাথায় হাত রেখে বললেন,—'সুদামা তুমি আশ্রমের মর্যাদা রেখেছো। আমি আশীর্বাদ করছি—ইতিহাস একদিন তোমাদের বন্ধুত্বকে অমরতা প্রদান করবে। যুগ যুগ ধরে মানুষ তোমার বন্ধুত্বের কথাকে স্মরণ করে ধন্য হবে। আমি আরও আশীর্বাদ করি সমস্ত বৈদিক জ্ঞান তোমার অধিগত হোক। এখন চল, আমরা সবাই আশ্রম অভিমুখে রওনা হই।' কৃষ্ণ-সুদামা, গুরু ও সতীর্থদের সাথে বন হতে আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন।

তারপর কেটে গেছে আরও অনেক দিন। দেখতে দেখতে এসে গেল আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার পালা যাকে তখনকার দিনে বলা হত সমাবর্তন দিবস। বিদায়ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ সুদামার হাতে একটি কাষ্ঠমূর্তি দিয়ে বললেন—বন্ধু, বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর আমার অনুপস্থিতিতে যখন তোমার হৃদয় কেঁদে উঠবে—তখন এই মূর্তির মাঝে আমাকে দেখো।

সুদামা শ্রীকৃষ্ণের কাছ হতে কাঠের মূর্তিটি নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর মূর্তিটিকে আর একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করে সেটি ঝোলায় রেখে দিলেন। ঝোলা থেকে কুশতৃণদ্বারা তৈরী একটি করবন্ধন [কুশের তৈরি বালা] বের করে শ্রীকৃষ্ণের হাতের কব্জীতে বেঁধে দিয়ে বললেন,—''বন্ধু! তৃণনির্মিত এই করবন্ধন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপতে জপতে তৈরি করেছি তোমার জন্য। যদিও তুমি কালজয়ী পুরুষ। তবুও আমার দেওয়া এই করবন্ধন তোমার প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে তোমাকে রক্ষা করবে।'

শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—''বন্ধু! করবন্ধন নয়-এ আমার রক্ষা—বন্ধন।'

গুরু দিলেন বর

অবন্তীনগরের গুরুকুল আশ্রম। আশ্রমের আচার্য্য মহামুনি সন্দিপনী। তিনি ছাত্র বা বিদ্যার্থীদের বেদ-বেদাঙ্গ-যোগ-ধর্ম-শস্ত্র-অস্ত্র ইত্যাদি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে এসে মহামুনির সান্নিধ্যে থেকে বিদ্যানুশীলন করতেন। মহামুনি সন্দিপনীও স্নেহ দরদী হৃদয়ে তাদের শিক্ষা দান করতেন। গুরু ও গুরুপত্নীর স্নেহ ভালোবাসায় দূরাগত বিদ্যার্থীরা পিতামাতার অভাব অনুভব করতেন না। বিদ্যার্থীদের গুরুকুলে থেকেই বিদ্যা অধ্যয়ন করতে হবে—এটাই ছিল সে যুগের নিয়ম।

যাই হোক একদিন অবন্তীনগরের এই গুরুকুল আশ্রমে উপনীত হলেন দুই কিশোর বালক। একজনের গায়ের রং বর্ষার নবমেঘ সদৃশ, অন্যজনের দীপ্ত গৌরবর্ণ। দেখে মনে হয় যেন দুই রাজার কুমার। আশ্রম অঙ্গনে প্রবেশ করে দুই কিশোর গুরু সন্দিপনী চরণে কিছু বন্যফল-ফুল ইত্যাদি সামান্য অর্ঘ্য অর্পণ করে বললেন—

তদ্ব্যঞ্জনং চ :—
শ্রীমন্মহাকুলজবিপ্রবতংস রত্ন!
বিদ্যানিধে! বিহিত বৈদিক মর্ম্ম ধর্ম!
অজ্ঞান দুঃখ বিনিবর্ত্তক! দীনবন্ধো!
ত্রয়স্ব নৌ স্বয়চরণং শরণং প্রপন্নৌ।। ইনি।। ৪২।।
[উত্তর গোপাল চম্পূঃ, অষ্টমপূরণ]

দুই কিশোর শ্রীগুরু চরণে অর্ঘ্যপ্রদান করত এইরূপে বিদ্যার্থীভাব প্রকাশ করলেন। হে শ্রীমন্! হে মহাকুলজাত! হে বিপ্রগণের শিরোভূষণ রত্ন! হে বিদ্যানর্ব। হে সমস্ত বৈদিক ধর্মের তত্বাবধায়ক। হে অজানজনিত দুঃখ বিনাশক! হে দীনবন্ধো! আমরা দুইজনে আপনার সুন্দর চরণে শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি বিদ্যাদান করে অজ্ঞানজনিত দুঃখ হতে আমাদের দুজনকে ত্রাণ করুন।।

গুরু সন্দীপনী দুই কিশোরের অনিন্দ্যরূপ দেখে মুগ্ধ নয়নে তাদের পানে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন—বৎস! তোমাদের পরিচয় কি? তোমরা কোথা হতে এসেছো?

'ভগবন্! আমরা শূরবংশীয় ক্ষত্রিয় বসুদেবের পুত্র। আমার নাম বলরাম-আর এই আমার অনুজ শ্রীকৃষ্ণ। আমরা মথুরা মণ্ডল থেকে আপনার কাছে এসেছি'—দুই কিশোরের মধ্যে অগ্রজ গৌরবর্ণ বলরাম শ্রদ্ধানতচিত্তে উত্তর দেন শ্রীগুরু সন্দিপনীকে।

—উত্তম! তোমরা এখন বিশ্রাম করো। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত।

—ভগবন্! আমাদের অধ্যয়নের সময় কখন? কৃষ্ণবলরাম একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন।

—তোমাদের দুজনের ক্ষত্রিয় নন্দন বলে যে অভিমান আছে অগ্রে তা পরিত্যাগপূর্বক এই আশ্রমস্থ অন্যান্য সকল সুশিক্ষিত বিদ্যার্থীদের সঙ্গে বিশ্রামান্তে প্রথমতঃ ভিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা করো। তদন্তর অধ্যয়ন প্রসঙ্গ শুরু হবে।

অতঃপর গুরুর কথামত সেদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন থেকেই আশ্রমস্থ বিদ্যার্থীদের কাছে ভিক্ষাদি বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে দুই ভাই গুরুর জন্য মাধুকরী বের হলেন। গুরু সন্দিপনী তাদের মাধুর্য্যমণ্ডিত ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ হলেন গুরুপত্নী ও আশ্রমস্থ সকল বিদ্যার্থী।

যথাসময়ে গুরু সান্নিধ্যে থেকে শুরু হল দুই ভাইয়ের অধ্যয়নপর্ব। দুই ভাইয়ের স্পষ্ট বেদমন্ত্র উচ্চারণ, মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে গুরু বিস্মিত হলেন। ছয়মাসের মধ্যে দুইভাই বেদাদি সকল শাস্ত্রশিক্ষা সমাপন

করলেন। গুরুদেবও ইতিমধ্যে ধ্যানবলে জানতে পেরেছেন দুই কিশোরের প্রকৃত পরিচয়। একদিন তিনি নিজ গৃহিণীকে ডেকে বললেন,—'গৃহিণী, যে নতুন বালকদুটি আমার শিষ্য হয়ে অধ্যয়ন করতে এসেছে- ওরা কে জান?' গৃহিণীর জিজ্ঞাসা—'কে?'

ওরা সকল জ্ঞানের আধার, নরাকারে নিরাকার ব্রহ্ম। দেখ ঈশ্বরের কি লীলা যিনি জগতের ঈশ্বর—সকল কিছুর মূল ; তিনি এসেছেন ছাত্র হয়ে আমার কাছে শিক্ষা নিতে। ওদের দুই ভাইয়ের আগমনে আমার গুরুকুল বিদ্যালয় আজ ধন্য পরমতীর্থে পরিণত হয়েছে।

গুরুসন্দিপনী যখন নিভৃতে তাঁর পত্নীকে উপরোক্ত কথাগুলি বলছিলেন তখন কৃষ্ণ সহসা সেখানে উপনীত হয়ে উভয়ের চরণে প্রণিপাত জানিয়ে গুরুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভগবন্ আমাদের অধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণার কাজ শেষ হয়েছে—এবার আমাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করুন।' গুরুদেব ও গুরুপত্নী শ্রীকৃষ্ণ মুখপানে চাইতেই উভয়ের যুগলনয়ন অশ্রুতে ভরে ওঠে। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাথায় হাত রেখে বললেন, ''কৃষ্ণ আমি জানি তুমি কে? তবু লৌকিক জগতে আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য। তাই গুরু হিসাবে আমি আমার শিষ্যকে যাওয়ার আগে কিছু দিতে চাই। তাই তুমি যাওয়ার আগে আমার কাছে বর প্রার্থনা করো।' কৃষ্ণ বললেন, 'হে ভগবন্। আপনার প্রদত্তবিদ্যা ও অকৃপণ স্নেহই আমাদের চলার পথের পাথেয়। আপনি আমাদের দুইভাইকে বিদ্যাদান করেছেন—অজ্ঞান হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়েছেন আশীর্বাদ করুন যেন সেই আলোয় আমরা পথ চলতে পারি।'

তোমার বিনয় ও শ্রদ্ধা আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু তবুও বলছি তুমি আমার কাছে অন্ততঃ একটা 'বর' প্রার্থনা করো—অন্যথায় আমার আচার্য গৌরব নষ্ট হয়ে যাবে।

—ওকথা বলবেন না ভগবন্। ওতে আমার অপরাধ হবে। বেশ, আপনার যখন ইচ্ছা, তখন আপনি আমাকে এই 'বর' দিন ভগবন্—আমি যেন মায়ের হাতের ভোজন পাই। মা যেন আমাকে নিজের হাতে খাওয়ার সময় খাইয়ে দেন। আপনার কাছে এই আমার প্রার্থনা। গুরু সন্দিপনী কৃষ্ণকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'তথাস্তু!'

কৃষ্ণের এই প্রকার বর প্রার্থনা শুনে বলরাম বিস্মিত হলেন, কৃষ্ণ বললেন দাউজী, মা সন্তানের মুখে শুধু ঘি, রুটি, অন্নই তুলে দেন না, ওর সঙ্গে আরও একটু বিশেষ বস্তু মিশ্রিত থাকে, সেই লোভেই আমার গুরুর কাছে ঐ বর প্রার্থনা।

বলরাম বললেন, 'কৃষ্ণ, মায়ের হাতের মিশ্রিত ঐ বিশেষ বস্তুটি কি?'

কৃষ্ণের উত্তর—মাতৃহৃদয়ের অপার প্রেম ও মমতা।

ভাই-বোনের লড়াই

দ্বাপর যুগে গালিব নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ছিলেন 'গালিব সংহিতা' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি পতিব্রতা নারীর গুণ মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে পতিব্রতা নারী আপন তেজে মৃত্যুকেও পরাজিত করতে সমর্থ্য। পতিব্রতা নারী সর্বত্র বন্দনীয় এমন অভিমত ও তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

দ্বাপরে একদিন গালিব ঋষি গঙ্গাস্নানান্তর কোমর জলে দাঁড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে সূর্য্যবন্দনা করছিলেন। ঐ সময়ে চিত্রসেন নামে এক গন্ধর্ব দিব্য বিমানে সহস্র কামিনী সঙ্গে নিয়ে আকাশমার্গে বিচরণ করছিলেন। তার মুখ নিঃসৃত পানের পিক ঋষি গালিবের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে এসে পড়ে। ঋষি কুপিত হন। ত্রিকালদর্শী ঋষি চিত্রসেনকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য শাপ দিতে উদ্যত হতেই ঋষির মনে পড়ে যায়—তপঃ শক্তি ক্ষয়ের কথা। তিনি শাপ দেওয়া থেকে বিরত হয়ে চিত্রসেনের অন্যায় আচরণের শাস্তি বিধানের জন্য দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপনীত হয়ে বললেন, 'প্রভু আপনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন গো ব্রাহ্মণ ধর্ম রক্ষার জন্য। আপনি বর্তমান থাকতে উদ্ধত গন্ধর্ব চিত্রসেন আমার উপাসনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। সে সূর্য্য উপাসনার সময় আমার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে আকাশমার্গ থেকে উচ্ছিষ্ট পানের পিক ফেলেছে। আপনি এর বিচার করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ ঋষির পাদবন্দনা করে বললেন—''আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আগামী কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি চিত্রসেনকে বধ করবো। আমি আপনার এবং আমার মাতা দেবকীর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি—যান ঋষিবর আপনি এবার নিশ্চিন্তে ফিরে গিয়ে উপাসনা করুন। সন্তুষ্ট চিত্তে ঋষি প্রস্থান করলেন দ্বারকার রাজসভা থেকে।

গালিব ঋষি চলে যাওয়ার পর দেবর্ষি নারদ প্রবেশ করলেন দ্বারকার রাজসভায়। সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি বীণা বাদ্যযোগে সংকীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন দ্বারকার অন্তঃপুরে। শ্রীকৃষ্ণ আসন হতে উত্থিত হয়ে দেবর্ষিকে অভ্যর্থনা জানালেন। দেবর্ষি নারদ লক্ষ্য করলেন আনন্দময়ের পদ্ম আননে আজ অপ্রসন্নতার ছাপ। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—''ভগবন্ আপনি তো সদাসর্বদা আনন্দময়, শান্তিস্বরূপ, আপনার স্মরণে দর্শনে সমস্ত জগত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ আজ আপনার মুখ কমলে দেখছি অপ্রসন্নতার চিহ্ন—এর কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ নারদকে গালিব ঋষির ঘটনাটি আনুপূর্বিক বলে চিত্রসেনকে বধের জন্য ঋষি গালিবকে দেওয়া তাঁর প্রতিজ্ঞার কথাও বললেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে চিত্রসেন বধের প্রতিজ্ঞা শুনে নারদ মনে মনে হাসলেন। হাসতে হাসতে তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন—আমি যদি তোমার যথার্থ ভক্ত হয়ে থাকি, তবে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে চিত্রসেনের প্রাণ আমি রক্ষা করবোই—অন্যথায় আমার দেবর্ষি নামে কলঙ্ক লেপন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না চিত্রসেনের প্রাণরক্ষা করতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বীণা আমি বাজাবো না, তোমার নাম ও কীর্ত্তন করবো না। মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে নারদ কৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চিত্রসেনের কাছে উপনীত হলেন। গন্ধর্ব রাজ যথাবিধি দেবর্ষিকে সাদর সম্ভাষণ সহ পূজার্চনা করে জিজ্ঞাসা করলেন—''দেবর্ষি কোথা হতে আসছেন আপনি? আপনার সর্বাঙ্গীন কুশলদানে আমাকে আনন্দিত করুন।''

দেবর্ষি বললেন—গন্ধর্বরাজ আমার সর্বাঙ্গীন কুশল কিন্তু তোমার এখন সমুহ বিপদ। যা কিছু শুভ করণীয়, তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে নাও। কারণ তোমার জীবনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর কথা শুনতেই গন্ধর্বরাজ ভয়ে চমকে উঠলেন। দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার মৃত্যু যে নিকটে, আপনি কেমন করে জানলেন। দেবর্ষি গন্ধর্বরাজকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার কথা শোনালেন, বললেন—আগামীকাল সূর্যাস্তের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার জীবন হরণ করবেন। চিত্রসেন নিজের অজান্তে ভোগ মত্ত হয়ে ঋষি গালিবের চরণে অপরাধ এবং

সেই অপরাধের দণ্ড হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হবে শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন। নিজ প্রাণরক্ষার জন্য তিনি ব্রহ্মা, বরুন, ইন্দ্র, কুবের সকলের কাছেই ছোটাছুটি করলেন কিন্তু কেউ তার প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে সমর্থ হলেন না। অগত্যা চিত্রসেন দেবর্ষি নারদের চরণে পতিত হয়ে বললেন—হে দেবর্ষি আমায় রক্ষা করুন। আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত, আমার এই বিপদে আপনি ভিন্ন অন্য কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এই বলে গন্ধর্বরাজ দেবর্ষির পা দুটি জড়িয়ে ধরে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। দেবর্ষির হৃদয় করুণায় বিগলিত হল। তিনি গন্ধর্বরাজকে বললেন ভয় নাই, এসো আমার সাথে, এই বলে তিনি চিত্রসেনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রপ্রস্থের যমুনাতটে।

যমুনার তটভূমে উপনীত হয়ে দেবর্ষি বললেন—শোন গন্ধর্বরাজ আজ অর্ধরাত্রি সময়ে এখানে এক রমনী ব্রতোপলক্ষে স্নান করতে আসবে, ঐ সময় তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি উচ্চৈস্বরে বিলাপ করবে। ঐ রমনী তোমার বিলাপ শুনে তোমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে তোমার বিলাপের কারণ কি? তখন তুমি ঐ রমনীকে বলবে আগে আপনি আমাকে কথা দিন যে আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন। সেই রমনী কথা দিলে তখন তুমি কৃষ্ণের তোমাকে বধ করার প্রতিজ্ঞার কথা বলবে। মনে রেখ চিত্রসেন সেই রমনী কথা না দেওয়া পর্যন্ত তুমি যেন ভুলেও সেই রমনীর কাছে, তোমার শোকের বা বিলাপের প্রকৃত কারণ বলবে না। দেখবে সেই রমনীই তোমার প্রাণরক্ষা করবে। চিত্রসেনকে এইভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জুনের মহলে প্রবেশ করে অর্জুনপত্নী সুভদ্রার কাছে উপনীত হয়ে বললেন—সুভদ্রে, আজকের তিথিটি বড় পবিত্র। এই তিথিতে অর্ধরাত্রি সময়ে যমুনায় স্নানান্তে যদি কোন দীন প্রার্থীকে রক্ষা করা হয় তাহলে অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় হয়। পতিব্রতা রমনীর পক্ষে বিশেষ করে এই তিথি চির সৌভাগ্য প্রদানকারী। নারদের মুখে পূণ্যতিথির কথা শুনে সুভদ্রা ওই দিন অর্ধরাত্রে দেবর্ষির সঙ্গে যমুনায় স্নানের জন্য রওনা দিলেন। সেখানে স্নান শেষ হওয়ার পরে তিনি চিত্রসেনের বিলাপ ধ্বনি বা ক্রন্দন শুনতে পেলেন। সিক্ত বসনে তিনি চিত্রসেনের কাছে উপনীতা হয়ে বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। গন্ধর্বরাজ বললেন—'দেবী যদি আপনি আমাকে আশ্রয় দান করে আমার প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে আমি আপনাকে আমার বিলাপ বা দুঃখের কারণ জানাবো। সুভদ্রা দেবর্ষি নারদকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করলেন—আমি অবশ্যই তোমাকে আশ্রয় দিয়ে তোমার প্রাণরক্ষা করবো। এখন বল তোমার বিলাপের কারণ কি?

গন্ধর্বরাজ বললেন—আপনার অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কাল সূর্যাস্তের পূর্বে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমার অপরাধ, আমি আকাশমার্গে বিমানযোগে বিচরণের সময় অজান্তে ঋষি গালিবের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পানের পিক ফেলেছিলাম। গন্ধর্বরাজের মুখে অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার কথা শুনতেই সুভদ্রা হতচকিতা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবে পেলেন না এখন তাঁর করণীয় কি? একদিকে গো ব্রাহ্মণ ঋষি ধর্ম হিতকারী দীনবন্ধু ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—অন্যদিকে শরণাগত গন্ধর্বরাজকে রক্ষার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এই অসামঞ্জস্য অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্থির করলেন আমার প্রাণ যায় যাক, আমি এই শরণাগতের প্রাণ রক্ষা করবোই করবো। এইরূপ সংকল্প করে তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে সঙ্গে করে রাজমহলে ফিরলেন এবং স্বামী অর্জুনকে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললেন। অর্জুন সব শুনে সুভদ্রাকে বললেন,—'ভয় নেই প্রিয়ে। তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য পার্থের গাণ্ডীবই যথেষ্ট।' সুভদ্রা নিশ্চিন্ত হলেন।

অন্যদিকে নারদ ইতিমধ্যে পরদিন প্রভাতেই দ্বারকায় উপনীত হয়ে কৃষ্ণের কাছে গন্ধর্ববধ প্রতিজ্ঞার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই কৃষ্ণ বললেন,—'আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি চিত্রসেনকে বধ করবো।' নারদ তা শুনে মৃদু হেসে বললেন,—'সে না হয় করবেন কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার বোন সুভদ্রা ও ভগ্নীপতি অর্জুন তাকে আশ্রয় দিয়ে তার জীবনরক্ষা করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন'। কৃষ্ণ বললেন,—'দেবর্ষি, অর্জুন সুভদ্রা এটা ঠিক কাজ করেনি। আপনি আমার পক্ষ থেকে ওদের কাছে যান এবং বুঝিয়ে বলুন আমার প্রতিজ্ঞার কথা।' অনন্তর নারদ আবার ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়ে অর্জুন সুভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শোনালেন। বললেন

—তোমরা চিত্রসেনকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায়তা করো। অর্জুন বললেন,—'দেবর্ষি যদিও আমি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত তবুও আমি শ্রীকৃষ্ণের কথানুযায়ী প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়ে ক্ষাত্রধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হতে পারবো না। আমি তাঁর শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে আমার এবং আমার স্ত্রী সুভদ্রার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো। বরং আপনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে পুনরায় গিয়ে বলুন তিনি যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন।'

নারদ পুনরায় দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন সবকথা। নারদের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে শ্রীকৃষ্ণ তৈরী হলেন অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। ঐ দিন অপরাহ্নের কিছু পূর্বেই ইন্দ্রপ্রস্থের ভূমিতে শুরু হল অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ। উভয় পক্ষের সৈন্য অশ্ব-গজ-পদ ও রথচক্রভারে কেঁপে উঠলো ইন্দ্রপ্রস্থের ভূমি। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় হয়ে মুখোমুখি সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করে প্রণাম জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে দশ বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনের মস্তকে আশীষ বর্ষণ করলেন। ধীরে ধীরে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হল। পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র গুরুশিষ্যের লড়াইয়ে মুখর হয়ে উঠলো। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন ও তৎপ্রতিকারে পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। মহাশূন্যে দুই অস্ত্রের লড়াই শুরু হল। অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারিদিক। মহাপ্রলয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। এইরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে অর্জুন স্মরণ করলেন আপন ইষ্টদেব দেবাদিদেব মহাদেবকে। ভগবান শিব তৎক্ষণাৎ রণস্থলে আবির্ভূত হয়ে দুই অস্ত্রের উদ্দেশ্যে স্তুতি করে অস্ত্রদ্বয়কে প্রশমিত করলেন। অতঃপর দেবাদিদেব কৃষ্ণের কাছে উপনীত হয়ে বললেন—প্রভু। আজ আপনার একি বিচিত্র লীলা দেখছি। আপনার অনুগত ভক্ত অর্জুনের প্রতি আপনার এই ব্যবহার শোভনীয় নয়। ভক্তের প্রতিজ্ঞার কাছে আপনার প্রতিজ্ঞা তো চিরকালই জলাঞ্জলি দিয়েছেন, সেকথা কি ভুলে গেছেন? আপনার যে প্রতিজ্ঞা ভীষ্ম ভেঙে দিয়েছেন, সে প্রতিজ্ঞার চেয়ে চিত্রসেন বধের প্রতিজ্ঞা কি অধিক মূল্যবান? দয়া করে আপনি শান্ত হোন। অর্জুনের ও সুভদ্রার প্রতিজ্ঞা রক্ষাতেই আপনার গৌরব। ভগবান শিবের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং ভক্ত অর্জুনকে বক্ষলগ্ন করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁর যুদ্ধশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করে দিলেন। এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুভয়ে ভীত চিত্রসেনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে তাকে অভয় প্রদান করলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের প্রার্থনায় প্রতিজ্ঞা পালন ধর্ম বিসর্জন দিলেন। কিন্তু এই সংবাদ যখন গালিব ঋষির কাছে পৌঁছালো এবং তিনি যখন শুনলেন শ্রীকৃষ্ণ চিত্রসেনকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অভয়তা প্রদান করেছেন—তখন তিনি কুপিত চিত্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সুভদ্রাকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দেওয়ার জন্য কমণ্ডলু থেকে হাতে জল নিলেন। তা দেখে সুভদ্রা বললেন—হে ঋষিবর, আমি যদি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং পতিব্রতা হয়ে থাকি তাহলে ঐ জল আপনার হাতেই জমে থাকবে, আপনার হাত থেকে ধরিত্রী বা কারও অঙ্গে পতিত হবে না। সুভদ্রার সতীত্বের প্রভাবে ঋষি গালিবের হাতের জল হাতেই জমে গেল। ঋষি লজ্জিত হলেন। তা দেখে সুভদ্রা ঋষির কাছে উপনীতা হয়ে চরণ বন্দনা করে বললেন, 'ঋষিবর, আপনি আপনার গ্রন্থে সতী নারীর মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—সতী নারী অপরাজিতা। পতিব্রতার সতীত্বের কাছে মৃত্যুও পরাজিত হয়। আজ চিত্রসেন-এর মৃত্যু হলে আপনার গ্রন্থের বাণী যে মিথ্যা হয়ে যাবে।' গালিব ঋষি বললেন, 'পতিব্রতার বিরোধ করার শক্তি আমার নেই মা। অনুমতি দাও কমণ্ডলুর জল কমণ্ডলুতেই রাখি।' সুভদ্রা সম্মতি দিলে ঋষি হাতের জল কমণ্ডলুতে রেখে সুভদ্রাকে আশীর্বাদ করে সেখান হতে বিদায় নিয়ে আশ্রম অভিমুখে রওনা দিলেন। সুভদ্রা ও দেবর্ষি নারদের ক্ষণিক সৎসঙ্গে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হৃদয়ও পরিবর্তিত হল। তাঁর অন্তরের ভোগ বাসনা প্রশমিত হল এবং তিনিও অন্তে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালাভ করে পরমপদ প্রাপ্ত হলেন।

দ্বারকায় প্রার্থী অশ্বত্থামা

মহাভারতের মহাযুদ্ধ সন্নিকটবর্তী। পাণ্ডব-কৌরব উভয়পক্ষের শিবিরে জোর কদমে প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেছে। কৌরব শিবিরে আপন কক্ষে রাত্রিবেলায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। তাঁর চোখে ঘুম নেই। ভাবছেন এই যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি কে হবেন? নিশ্চয়ই তাঁর পিতা দ্রোণাচার্য্য। ভীষ্ম অতি বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি যুদ্ধের জন্য আশীর্বাদ দিতে পারেন মাত্র, সেনাপতি হওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। আর যদি কোন কারণে তাঁর পিতা ও বার্ধক্যের কারণে প্রধান সেনাপতির পদ না প্রাপ্ত হন তাহলে তিনি নিজে অবশ্যই ঐ পদ দুর্যোধনের কাছ হতে সম্মানের সঙ্গে প্রাপ্ত হবেন। কারণ কর্ণ সুতপুত্র কাপুরুষ, অহংকারী। সুতরাং ঐ পদের একমাত্র দাবিদার আমিই। কিন্তু আমি যদি সেনাপতি হই—তাহলে আমাকে লড়তে হবে অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাও বিশেষ ব্যাপার নয়—ব্যাপারটা হচ্ছে কৃষ্ণকে নিয়ে, কারণ অর্জুনের রথের তিনিই সারথি।

যদি কৃষ্ণের কাছে চক্রটা না থাকতো কিংবা যদি ঐ চক্রটা আমি হাতে পেতাম তাহলে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে পরাজিত করার কাজটা সহজেই সম্পন্ন হয়ে যেত। কৃষ্ণের ঐ অমোঘ সুদর্শন চক্রটা যদি একবার হস্তগত হয় তাহলে যুদ্ধ জয় আমার অনিবার্য। যুদ্ধ জয় হলে কৌরবসেনা আমার পক্ষে জয়ধ্বনি দেবে। অশ্বত্থামা আপন শিবিরে পায়চারী করতে করতে যেন সেই অনাগত জয়ধ্বনি নিজকর্ণে শুনতে পাচ্ছেন—একথা ভাবতেই তাঁর হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ জাগ্রত হল। কিন্তু কৃষ্ণের ঐ সুদর্শন চক্র কী করে তাঁর হস্তগত হবে? কৃষ্ণকে চাইলে তিনি কি তা দেবেন? শুনেছি তিনি ব্রাহ্মণ ঋষিদের কখনও বিমুখ করেন না। আমি ব্রাহ্মণপুত্র আমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে ঐ চক্র প্রার্থনা করি তাহলে তিনি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন? রাত্রি প্রভাত হতে এখনও বিশেষ দেরী আছে। দ্বারকায় গিয়ে একবার কৃষ্ণ সমীপে প্রার্থনা করে দেখা যাক তিনি কী করেন। এইরূপ ভাবতে ভাবতে শিবির ছেড়ে বেরিয়ে এসে অশ্বত্থামা রথের উপর চড়ে বসলেন। রথ ছুটলো দ্বারকার অভিমুখে। অশ্বত্থামা মনে মনে বললেন, আমি ব্রাহ্মণপুত্র। অতএব এই ব্রাহ্মণ হওয়ার সুযোগ আমাকে নিতেই হবে।

দ্বারকার অধিকাংশ লোক অশ্বত্থামাকে চিনতেন। তাছাড়া তিনি ব্রাহ্মণপুত্র। ব্রাহ্মণের অবাধগতি দ্বারকাধীশের কাছে। অশ্বত্থামা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণোচিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হলেন। কৃষ্ণ সখা অর্জুনের গুরুপুত্রের যথোচিত সম্মান সৎকার করলেন। অশ্বত্থামাও কৃষ্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে দুই চার রাত্রি সেখানে রয়ে গেলেন। এখনও তাঁর প্রার্থনা তিনি কৃষ্ণকে জানাননি—অথচ সময়ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে—তাই একদিন অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হতেই, শ্রীকৃষ্ণ সখার গুরুপুত্রের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে এবং প্রণাম জানিয়ে তাঁকে ভোজনে উপবেশন করার জন্য অনুরোধ করলেন। ভোজন শেষে তাম্বুল গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে যুক্ত করে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণপুত্র, আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। এখন বলুন আমি কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি?'

অশ্বত্থামা বললেন, 'আমি আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি। আমি জানি আপনি উদার হৃদয়। ব্রাহ্মণকে অদেয় ও আপনার কিছু নাই। আপনার সুদর্শনচক্র আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। যদি কিছু মনে না করেন তো ....'

—আপনি সংকোচ ত্যাগ করে আদেশ করুন কি আপনার প্রার্থনা আমি যথাসাধ্য তা পূরণের চেষ্টা করবো। মৃদু হেসে কৃষ্ণ বললেন।

—আমি আপনার সুদর্শন চক্রের প্রার্থী। এর পরিবর্তে আপনি আমার মাথার মণি নিতে পারেন। সংসারে এই মণি অত্যন্ত দুর্লভ।

—হে ব্রাহ্মণকুমার আপনি যদি সুদর্শনচক্র উত্তোলন করে নিয়ে যেতে পারেন তবে আমার কোন আপত্তি নেই। আর এর জন্য আপনাকে ঐ দুর্লভ মাথার মণিও আমাকে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। মণি আপনি নিজের কাছেই রাখুন। সুদর্শন চক্র ছাড়াও অন্য কোন অস্ত্র যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাও নিয়ে যেতে পারেন আমার আপত্তি নাই। তবে মনে রাখবেন সুদর্শনচক্র কোন সম্পত্তি নয় যে ওকে ধরে রাখবো। ওটা একটা অস্ত্র। এই অস্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ যে জানে, সেই এই অস্ত্রকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। যে এই অস্ত্রের ব্যবহার জানে না, তার পক্ষে ঐ অস্ত্রের প্রার্থনা করা সমীচীন নয়।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা যে যুক্তিপূর্ণ তা অশ্বত্থামা মনে মনে স্বীকার করলেন। কিন্তু সুদর্শন পাওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি চক্র উত্তোলনের জন্য এক হাত দিয়ে চক্রটি উঠানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পরে দু হাত দিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চক্রটি তুলতে চেষ্টা করলেন। এবারও ব্যর্থ হলেন। লজ্জায় অশ্বত্থামার মস্তক নত হল। তিনি বললেন—'আপনার এই চক্র ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়, এবং একে হাতে তুলে ধারণ করতে একমাত্র আপনিই সমর্থ।'

—আপনার প্রার্থনা পূরণ হল না আমি দুঃখিত। এখন বলুন আপনি আর কি চান আমার কাছে। অশ্বত্থামা বিষণ্ণ চিত্তে বললেন—আপনি স্বেচ্ছায় যা দেবেন তাই গ্রহণ করবো। 'বেশ, তবে তাই হোক'—এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে প্রচুর অশ্ব ও রত্ন দান করে সন্তুষ্ট করলেন। বিদায় নেওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বললেন,—'হে ব্রাহ্মণ, যদি অনুচিত মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?' অশ্বত্থামা বললেন, 'বলুন?'

—আপনি চক্র নিয়ে কি করতে চান, দয়া করে যদি আমায় বলেন—

—আমি আপনার চক্র নিয়ে, আপনাকে প্রণাম জানিয়ে আপনার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে চাই। আপনি আমার এই ধৃষ্টতাকে মার্জনা করবেন।

—আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন আমি কখনও ব্রাহ্মণের উপর অস্ত্র ক্ষেপণ করি না। কিন্তু ধনঞ্জয় আমার অভিন্ন স্বরূপ। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার আপনার যে বাসনা, তা যথাসময়ে ধনঞ্জয়ই পূরণ করবে।

অশ্বত্থামা কৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

কৃষ্ণের অতিথি সৎকার

দ্বারকায় প্রবেশ করেছেন মহর্ষি দুর্বাসা। রাজপথ দিয়ে চলেছেন তিনি। চলতে চলতে দ্বারকাবাসীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছেন—আমি মহাক্রোধী দুর্বাসা! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোন আচরণের সামান্য ত্রুটিও আমি সহ্য করি না, তাকে অভিশাপ দিই। আমাকে চাতুর্মাস্য করতে হবে। কে আছে ধার্মিক গৃহস্থ আমাকে আমন্ত্রণ জানাও।

দুই-এক দিনের ব্যাপার হয় তো দু'একজন সাহস নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারে। কিন্তু চারমাস ধরে এই মহাক্রোধী ঋষিকে ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে কি শেষে বিপদে পড়বে? দ্বারকাবাসী সাহস করে না দুর্বাসাকে আমন্ত্রণ জানাতে। কারণ ঋষি কখন কার উপর সন্তুষ্ট বা কুপিত হবেন তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। অতএব ডেকে বিপদ বরণ করতে কেউ রাজী নয়।

তবে দুর্বাসার কি চাতুর্মাস্য হবে না? তিনি কি দ্বারকা থেকে ব্যর্থ হয়ে অথবা কুপিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে দ্বারকাবাসীর সর্বনাশ করে ফিরে যাবেন? না তা সম্ভব নয়। ঋষির অপমান হলে নগরের অকল্যাণ হবে। অতএব দুর্বাসাকে চাতুর্মাস্য পালনের সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যথায় দ্বারকাবাসী ঋষির শাপের কোপে পড়বেন—তাই শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে দুর্বাসার চিৎকার পৌঁছাতেই তিনি এগিয়ে এসে ঋষিকে প্রণাম করে বদ্ধ অঞ্জলি হস্তে বললেন—ভগবন্। আপনি এই সেবকের গৃহে পদার্পণ করে, গৃহকে ধন্য করুন।

দুর্বাসা শ্রীকৃষ্ণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তাঁর সঙ্গে চলতে থাকলেন। অন্য সময় ঋষি যখন কোথাও যান, হাজার হাজার শিষ্য নিয়ে যান। এবার দ্বারকায় এসেছেন একা। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসাকে সঙ্গে করে নিয়ে মহারানী রুক্মিনীর প্রাসাদে উঠলেন এবং ঋষির বিশ্রামের ব্যবস্থা করে ঋষির সেবার ব্যাপারে মহারানীকে সতর্ক থাকতে বললেন। দুর্বাসার কোনও নিয়ম নেই। কখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করতে সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন মধ্যরাত্রে। কখনও সাগরতটেই দু'চারদিন ধ্যানস্থ থেকে যান। কখন যে তিনি বাইরে যাবেন, কখন যে তিনি ফিরবেন কেউ জানে না। কখনও চান শীতল জল, কখনও বা গরম জল। কখনও বা অর্ধরাত্রে ভোজন চান—কখনও বা দিনের শেষ প্রহরে যে সময়ে, যে জিনিস অপ্রাপ্য সেই সময়ে সেইসব জিনিস যথা ফলমূল, শাকসব্জী চেয়ে বসেন।

এককথায় ঋষির মর্জি বোঝা ভার। কাজেই মহারানী রুক্মিনীকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ঋষির সেবা করেন।

কিন্তু একমাত্র তার পক্ষেই এই সেবা সম্ভব। কারণ তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। দুর্বাসা যা যা প্রার্থনা করেন মহারানী তৎক্ষণাৎ তা সেবার জন্য উপস্থিত করেন ঋষির কাছে। এমনকি ঋষির অসময়ের বস্তু প্রার্থনাও রুক্মিনীকে অপ্রস্তুত করতে পারে না। মহারানী নিজ হাতে সকল সেবা কর্ম সমাধান করেন।

একদিন দুর্বাসা বললেন,—'আজ আমি রথে চড়ে নগর ভ্রমণে বের হব।' সঙ্গে সঙ্গে রথ প্রস্তুত। দুর্বাসা বললেন,—'রথে অবলা পশুকে সংযুক্ত করে তাকে দিয়ে টানতে তোমাদের লজ্জা করে না? অশ্ব পশু বলে তার কি রথ টানাতে কষ্ট হয় না? তোমরা স্বামী স্ত্রী অশ্বের পরিবর্তে রথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রথ টানতে থাকো আমি ঐ রথে চড়ে রথ চালাবো এবং ভ্রমণ করবো।' দুর্বাসার কথা শুনে কৃষ্ণ একবার তির্যকভঙ্গীতে মহারানীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দৃষ্টির অর্থ—এসো মহারানী নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী অশ্বের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে রথ টানতে শুরু করলেন—দুর্বাসা চাবুক হাতে নিয়ে সেই রথে চড়ে যথেচ্ছভাবে কারণে অকারণে উভয়ের অঙ্গে কষাঘাত করতে লাগলেন। রথ দ্রুতবেগে চলতে থাকে। চাবুকের আঘাতে মহারানীর ও কৃষ্ণের কোমল অঙ্গে কালশিটে পড়ে যায়। নীরবে উভয়ে তা সহ্য

করেন। একবারের জন্যও এমনকি বেদনার্ত চীৎকার করেন না। দ্বারকাবাসী, আত্মীয় স্বজন, কৃষ্ণ পুত্ররা, পুত্রবধুরা সেবক-সেবিকারা এদৃশ্য দেখেন আর নীরবে চোখের জল ফেলেন। অসহ্য বেদনাকর নির্মম দৃশ্য দেখেও তারা জোর করে ক্রন্দনের ধ্বনি চেপে রাখেন। কেউ কেউ বা দূরে সরে যান সহ্য করতে না পেরে।

ঋষি দুর্বাসার সেদিকে দৃকপাত নেই। তিনি আপন মনে বেপরোয়াভাবে উভয়অঙ্গে প্রহার করতে করতে রথে আরোহণের সুখ অনুভব করছেন। দ্বারকার অলিন্দ হতে, প্রাসাদের ছাদ হতে, গবাক্ষ পথ হতে ভেসে আসে রমনীদের কণ্ঠস্বর। এ ঋষি নয়, এ দানব! ক্রুর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন সবাই। অভিশাপ দিতে থাকেন ঋষিকে। কিন্তু সামনে গিয়ে কিছু বলার সাহস কারোর নেই। সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছেন কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। কিন্তু পিতার সামনে ঋষির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস তাঁর নাই। তাই তিনি জ্যেষ্ঠতাত বলরামের কাছে উপনীত হয়ে বললেন, 'তাত! আপনিও কি দুর্বাসার ভয়ে ভীত? ওই নিষ্ঠুর ঋষি অশ্বের স্থানে আমার বাবা-মাকে জুড়ে বাবা মায়ের কোমল অঙ্গে আঘাত করছে, আমার মা-বাবার সম্মান দ্বারকার রাজপথের ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে—অথচ তা দেখেও আপনি শান্তচিত্তে সহ্য করছেন? আপনার কাছে এর কি কোন প্রতিকার নেই?

বলরাম ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। মহা অনর্থ কিছু একটা ঘটার পূর্বেই ঋষি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণকে রথের স্থান থেকে পৃথক করে হৃদয় চেপে ধরে বললেন,—'মধুসূদন তুমি ধন্য। তুমি সত্য সত্যই পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্যদেব। তোমাদের দুজনার কীর্তি জগতের বুকে অমর হোক।' মহর্ষির কৃপাদৃষ্টিতে উভয়ের অঙ্গে কশাঘাতের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষিকে নিয়ে রুক্মিনীর সঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। এখবর বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আপন ভবন ত্যাগ করে দুর্বাসার দিকে যাওয়ার আগেই পেয়ে গেলেন। তিনি আজ অনুজ কৃষ্ণের উপর কিছুটা রুষ্ট হলেন। নতুন নতুন লীলা নাটক রচনা করতে কৃষ্ণের তো জুড়ি নাই কিন্তু বেচারী গৃহবধূকে কষ্ট দিতে এর বিন্দুমাত্র সংকোচ হলো না। বলরাম এও জানেন—ভাইয়ের ইচ্ছা ব্যতীত দুর্বাসার সাধ্য নাই এমন আচরণ করার।

এই ঘটনায় সমগ্র দ্বারকায় দুর্বাসার মান সম্মান ধূলায় লুটিয়ে গেল। দ্বারকাবাসী কেউই আর আগের মতো দুর্বাসাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানায় না। দুর্বাসা নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছেন। দুর্বাসার এই আচরণ শ্রীকৃষ্ণ পুত্রদের মনে ঋষি মুনিদের প্রতি এক আক্রোশের জন্ম দিল। এই কারণেই কৃষ্ণতনয় শাম্ব পিণ্ডারীক তীর্থে স্ত্রীবেশে মুনি ঋষিদের সামনে এসে উপহাস করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে যদুকুলের বিনাশের কারণ হয়েছিল। যাইহোক মহর্ষি দুর্বাসার চাতুর্মাস্য পূর্ণ হয়ে গেল। শেষ দিনে উনি বললেন—আজ আমি পরমান্ন ভোজন করবো। অধিক পরিমাণে পরমান্ন রন্ধন করো।

মহারানী রুক্মিণী পরমান্ন রন্ধন করে একটি বড় স্বর্ণথালায় ঢেলে ঋষিকে পরিবেশন করলেন। ঋষি ভোজনে বসলেন। অল্পমাত্র গ্রহণ করেই ঋষি ভোজন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। বেশি ভোজন করলেন না। ভোজনান্তে আচমন করতে করতে তিনি কৃষ্ণকে আদেশ করলেন,—'কৃষ্ণ, তুমি অবশিষ্ট পরমান্ন নগ্ন হয়ে নিজের সারা শরীরে মেখে নাও এবং মাখা হয়ে গেলে আমার সামনে উপস্থিত হও।' ঋষির আদেশে পীতাম্বর দিগম্বর হয়ে সারা শরীরে পরমান্ন মেখে নিলেন। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীর শুভ্রবর্ণ ধারণ করলো। কিন্তু কৃষ্ণ ঋষির প্রসাদ পদতলে মাখতে বা লেপন করতে পারলেন না—এতে গোমাতা ও ঋষির প্রসাদ দুইয়ের অবমাননা হবে এই ভেবে। মাখা শেষ হলে তিনি ঋষির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঋষি কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ লক্ষ্য করে বললেন,—'পদতলে পরমান্ন লেপন করনি কেন?' কৃষ্ণ বললেন,—'আপনার প্রসাদ পদতলে লেপন করলে আপনার, গোমাতার অপমান হবে।' ঋষি বললেন,—'তোমার অঙ্গে যেখানে যেখানে পায়স লেপন করেছো।—তা কোন অস্ত্র-শস্ত্র ভেদ করতে পারবে না কিন্তু পদতল তোমার অরক্ষিত থেকে গেল। ঐ পথ দিয়ে মৃত্যু এসে তোমার নরলীলার যবনিকাপাত ঘটাবে।'

মহর্ষি দুর্বাসা কৃষ্ণ অঙ্গে পরমান্ন লেপন করে কি কৃপা করতে চেয়েছিলেন তা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেল। মহানায়কের মহালীলার অবসান কোন পথে হবে তা দিবালোকের মতো

সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।

অহংকার সংহার

অগ্রজ বলরাম ও সখাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসের ধনুষযজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মথুরায় প্রবেশ করলেন। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই অগণিত নরনারী তাঁদের দেখার জন্য রাজপথে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভীড় জমাতে থাকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী সকলেই কৃষ্ণ-বলরাম দর্শনের ব্যাকুল অভীপ্সা নিয়ে সমবেত হল। কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামসহ সখাদের শ্রীঅঙ্গে ফুলচন্দন নিক্ষেপ করে অভ্যর্থনা জানাল, কেউ বা কুশাগ্রের দ্বারা পবিত্র জল তাঁদের সবার অঙ্গে সিঞ্চন করতে করতে স্তবস্তুতি করতে লাগল। কেউ করেন আশীর্বাদ, কেউ বা দেন উপহার। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শ্রদ্ধাবনত শিরে মৃদুহাস্যসহ করস্পর্শ দ্বারা উপহার সমূহকে ধন্য কৃতার্থ করছেন। সঙ্গের গোপবন্ধুরা শুধুমাত্র নয়ন দিয়ে উপহার সমূহ দেখতে থাকেন, গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা কারও নেই।

জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে তাঁরা যমুনার দিকে অগ্রসর হন। সহসা সেইপথে এসে উপস্থিত হয় মহারাজ কংসের রজক [ধোপা]। রাজপরিবারের সকলের বস্ত্র পরিষ্কার ও রঙ করা তার কাজ। এককথায় সে রাজবাড়ীর ধোপা। সঙ্গে তার শতাধিক কর্মচারী বা সহায়ক। সকলের হাতে স্বর্ণযষ্টি। স্বর্ণযষ্টির শীর্ষদেশে রত্নজড়িত বস্ত্রসমূহ টান টান করে ঝোলান, বস্ত্রে যাতে ভাঁজ না পড়ে তাই এই সতর্কতা। রজকের গায়ের রঙ মিশমিশে কালো-নাদুস নুদুস চেহারা, পাকানো গোঁফ। মদ্যপানের মত্ততায় চোখ দুটি লাল। তার চলনে-বলনে অহংকারের উদ্ধত কর্কশ প্রকাশ। পশ্চাতে চলমান সহকারীরা তারই প্রতিচ্ছবি। সুরামত্ত রজক পথ দিয়ে এমনভাবে চলছে যেন সেই মথুরার রাজা। তাকে আসতে দেখে মথুরার নাগরিকগণ রাস্তার দুপাশে সরে দাঁড়ায়। রাজার রজক—তাই সবাই ভয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। রজক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন অহংকারে চলতে থাকে, সহকারীরা তাকে অনুসরণ করে। নাগরিকদের প্রতি বিনয় বা সৌজন্যের প্রকাশ নেই। বরং নাগরিকরাই সৌজন্য বিনয় প্রদর্শন করে তার ও সঙ্গীদের চলার পথ তৈরি করে দেয়। আগামীকাল ধনুষযজ্ঞ। যজ্ঞোপলক্ষ্যে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে—সেই উৎসবে মহারাজ কংস যে বস্ত্র পরিধান করবেন—সেই বস্ত্র যে রজকের হস্তধৃত স্বর্ণযষ্টিতে শোভা পাচ্ছে। এই কাজের জন্য রাজার কাছ থেকে অগ্রিম পারিশ্রমিক বাবদ বেশ কিছু সুবর্ণ মুদ্রাও সে পেয়েছে। কোমরে বাঁধা বটুয়া থেকে তার ঝনঝন শব্দও শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় এইসব ভাবনাই তাকে অন্যদিনের তুলনায় আজ বেশ কিছুটা অহংকারী করে তুলেছে। এরপর মথুরার বিশিষ্ট নাগরিকদের রাজপথে সমবেত হতে দেখে—তার গর্ব যেন আরও অনেকখানি বেড়ে গেছে, রজক মনে মনে ভাবছে আমি মহারাজ কংসের কৃপাপাত্র, —এদের সম্মান সৌজন্য দেখাতে আমার বয়ে গেছে। রাজপথে ওদের চেয়ে আমার অধিকার বেশী। ওদের যদি যেতেই হয়, —ওরা রাজপথের বা রাস্তার দুই প্রান্তদেশ দিয়ে নেমে যাক। আমি মহারাজ কংসের রজক, রাজকর্মচারী—আমি কেন পথ ছেড়ে সরে যাবো!

—কানু, এ অহংকারী দুষ্টুটা কে রে? গোপবন্ধুদের একজন জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণকে।

—মনে হচ্ছে রাজা কংসের রজক। দেখছিস না সবার হাতে স্বর্ণযষ্টিতে রাজবস্ত্র শোভা পাচ্ছে।

—লোকটার এত অহংকার কি ভালো? বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ওর ভয়ে রাস্তার প্রান্তদেশ দিয়ে চলতে গিয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছে—ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, তুই যা হোক একটা কিছু কর না কানু! আর যে সহ্য হয় না!

—পূজনীয়, সম্মানীয় বড়দের দীর্ঘশ্বাসই বোধ হয় ওর জীবনের অন্তিম লগ্ন বয়ে নিয়ে আসবে। অহংকারে ক্ষমতার অপব্যবহারই মানবজীবনের পতনকে ত্বরান্বিত করে। 'দাউজী, তুমি কি বলো?'—কৃষ্ণ বলরামকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—তোমার কথা-আমার কথা কি আলাদা?—বলরাম উত্তর দিলেন।

দাদা বলরামের সমর্থন পেয়ে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে কংসের রজকের সামনে উপনীত হয়ে বললেন,—''ভাই রজক, আমরা তোমাদের নগরের অতিথি। অতিথি নারায়ণ—তাই আমরা তোমাদের পূজ্য। তোমার কাছে যে সব ধোয়া রঙ করা নতুন নতুন বস্ত্র সম্ভার রয়েছে—তা থেকে আমাদের সকলকে কিছু দাও। আমরা সেসব পরিধান করে ধনুষযজ্ঞে তোমাদের রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবো। আমাদের সকলের গাত্র মাপ অনুযায়ী পোষাক দিলে তোমার কল্যাণ হবে। দেখ, আমি তোমাদের নগরের শুধু অতিথিই নই—তোমাদের রাজার পরম আদরের ভাগ্নে। সুতরাং সব দিক দিয়েই আমি ও আমার সখারা তোমার বন্দনীয়, অতএব বিলম্ব না করে আমাদের বস্ত্র দাও।''

রজক ভেবেছিল কৃষ্ণ মথুরার নাগরিকদের মতো রাজমার্গের পার্শ্বদেশে অবতরণ করে তাকে পথ ছেড়ে দেবে কিন্তু সে যখন দেখল কৃষ্ণ রাস্তা ছাড়ার পরিবর্তে পথ অবরোধ করে তার কাছে সবার জন্য বস্ত্র চাইছে। তখন সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রজক কৃষ্ণের দিকে চেয়ে উপহাসের সুরে বলল,—'আরে জংলীর দল—এইসব রাজবস্ত্র পরে তোরা কি গরু চরাবি? এমন মূল্যবান বস্ত্র কি তোরা কখনও চোখে দেখেছিস? তোরা এইসব বস্ত্র পরার যোগ্য কি না তা কখনও ভেবে দেখেছিস? তোরা বড় মূর্খ-অসভ্য উচ্ছৃঙ্খল। যদি তোদের বাঁচার ইচ্ছা থাকে তবে রাস্তা ছেড়ে দে! তোরা মহারাজের বস্ত্র চেয়ে অপরাধ করেছিস—মহারাজ জানতে পারলে তোদের সবাইকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। নয়তো হত্যা করবে—তোদের সব সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবে।' রজকের গর্বোদ্ধত কথায় গোপ সখাদের মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তারা কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বলে,—'কানু, এই দুষ্টের ধৃষ্টতা বাচালতা অসহ্য'। গোপসখাদের হস্তধৃত লাঠি একসাথে উপরে উঠল রজকের মস্তকে প্রহারের জন্য। কিন্তু তৎপূর্বেই কৃষ্ণ ক্রোধে আরক্ত হয়ে ডান হাত উপরে তোলেন এবং হাতের অগ্রভাগ দ্বারা ত্বড়িৎগতিতে মুহূর্তের মধ্যে রজকের মস্তক ধড় থেকে আলাদা করে দেন। মস্তক মাটিতে পড়ে লাফাতে থাকে।

সখারা সমস্বরে বলল, 'সাবাস কানু! সাবাস।' রজকের মস্তকচ্যুতি দেখে তার সহকারীরা বস্ত্রসহ স্বর্ণযষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ করে-পিছন দিকে ঘুরে প্রাণের ভয়ে দৌড়তে থাকে। তাদের কোমরে যে স্বর্ণমুদ্রার বটুয়া ঝুলছিল—পালানোর সময় তারা তাও ফেলে দেয়—যদি স্বর্ণমুদ্রার লোভে কৃষ্ণ ও গোপ-বালকরা তাদের পিছু নেয় এই ভয়ে তারা পিছনের দিকে না তাকিয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকে। তাদের ভয়ে পালাতে দেখে গোপসখারা আনন্দে হাততালি দেয়। রজক ও তার সহকারীদের ফেলে যাওয়া বস্ত্রসম্ভার কৃষ্ণ ও গোপবালকরা একজায়গায় স্তূপীকৃত করে। কৃষ্ণ সেই বস্ত্রস্তূপের মধ্যে একটি সুন্দর বস্ত্র হাতে নিয়ে বলরামের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'দাদা! এই বস্ত্র তোমার জন্য।' বলরাম কৃষ্ণের হাত থেকে বস্ত্র গ্রহণ করে পরিধান করেন। সখারাও ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে আপন আপন পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্র পরিধান করল। কৃষ্ণও একখানি বস্ত্র নিজের জন্য হাতে তুলে নেন। কৃষ্ণ-বলরামসহ গোপবালকরা পূর্বপরিহিত বস্ত্রের উপরেই নবসংগৃহীত বস্ত্রসমূহ পরিধান করলেন। অবশিষ্ট বস্ত্র ও স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ বটুয়াপথের ধূলায় পড়ে রইলো। সখাসহ কৃষ্ণবলরাম সেদিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না।

সূচীশিল্পী গুণক ও কৃষ্ণ

কংসের রজককে নিধন করে সংগৃহীত ধৌত নববস্ত্র পরিধান করে কৃষ্ণবলরামসহ গোপসখারা চলেছেন মথুরার রাজপথ দিয়ে। সকলের গাত্রমাপ অনুযায়ী না হওয়ার ফলে সকলের চলতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। সকলের অঙ্গে বস্ত্র বিসদৃশ-বেমানান হয়ে শোভা পাচ্ছে। বস্ত্র অধিকাংশ ঢিলা হওয়ার জন্য ঠিকমত পথ চলা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় শম্বুকগতিতে চলতে চলতে একসময় সকলেই রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন জিজ্ঞাসা করে—এই বস্ত্র পরে পথ চলবো কেমন করে? সহসা সেই পথ দিয়ে যমুনা স্নানের জন্য আসতে থাকেন এক বৃদ্ধ দর্জি। দর্জির নাম গুণক। সে বিশেষ বিশেষ পর্বোনপলক্ষ্যে যমুনায় স্নান করতে আসে। রাজপথের চলমান নাগরিকরা ভাবেন—আজ তো মথুরায় কোন পর্ব বা উৎসব নেই—গুণক আজ কেন রাজপথ ধরে যমুনার দিকে চলেছে? আশ্চর্য্য! চলেছে স্নানে অথচ হাতে রয়েছে কাপড় কাটার কাঁচি। কী ব্যাপার! বিস্মিত নয়নে নাগরিকরা গুণককে লক্ষ্য করে। গুণক চলেছে আজ অন্যদিনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে।

পাঠক আসুন—গুণকের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। মথুরার নাগরিকরা বলেন—গুণক একজন উচ্চকোটির সূচীশিল্পী। শুধু মথুরার মধ্যেই তার শিল্পকর্ম সীমিত নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে—বিভিন্ন প্রদেশের রাজসূচী— শিল্পকর্মীরা গুণকের কাছে শিল্পকর্ম শিখতে আসে। অনেক রাজসূচীশিল্পী নিজেদেরকে গুণকের ছাত্র ভেবে গৌরব অনুভব করেন। গুণকের দোহারা ছিপছিপে গৌরবর্ণ শরীর। শরীরের খাঁজে খাঁজে বার্দ্ধক্যজনিত বলিরেখা। মাথাভর্তি শুভ্রকেশ কিন্তু নেত্র তেজদৃপ্ত উজ্জ্বল। স্বভাবে শান্ত, কম কথা বলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে আপন শিল্প কর্মের মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে যায়। শরীরে বার্দ্ধক্যের প্রভাব পড়লেও দুই হাত ও দুই নেত্রে এখনও তারুণ্যের দীপ্তি অম্লান। প্রয়োজনে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে খুব ধীরে। মনোযোগ দিয়ে না শুনলে সব কথা কর্ণগোচর হয় না। মথুরার রাজসূচীশিল্পী গুণক। ধনুযযজ্ঞের পূর্বে কংসকে নতুন বস্ত্র তৈরী করে দিতে হবে। সে এককথার মানুষ। কথানুযায়ী সময়মত সে গ্রাহকদের বস্ত্র সরবরাহ করে। এতৎসত্বেও তার একটি দোষ আছে।—তাকে হাজারবার ঘরে বা গৃহে এসে বস্ত্রের মাপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেও সে তা পালন করে না—এমনকি মহারাজ কংসের আহ্বানেও না। কংসকেও গুণকের দোকান ঘরে গিয়ে নিজের পোষাকের জন্য মাপ দিয়ে আসতে হয়। অথবা কোন সেবককে ঐ কাজের জন্য পাঠাতে হয়। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তার মুখের কথাই শেষ কথা। দরাদরি সে একদম পছন্দ করে না। কারও কাপড় বা পোশাক যদি সে তৈরী করে দেব বলে—তাহলে বুঝতে হবে সেটাই তাদের চরম পাওনা। পারিশ্রমিক নিয়ে বেশী দর কষাকষি করলে সরাসরি মুখের উপর বলে দেয়—সময় নেই।

গুণক উচ্চমানের কলাকার। কিন্তু দরিদ্র। সম্পদ সংগ্রহের জন্য যতটা পরিশ্রমের দরকার সে ততটা পরিশ্রম করে না। রাজার ও অন্যান্যদের বস্ত্র তৈরী করে সে যা পারিশ্রমিক পায়, তা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা তার কাছে সেলাই শিখতে আসে তাদের খাওয়ানো-পরানোর উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে দেয়। এইভাবে অর্জিত অর্থ পরের সেবায় উৎসর্গ করে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে সে তার দোকান ও সেলাই শেখানোর মহাবিদ্যালয় ছেড়ে কোথাও যায় না। তাই গুণককে আজ রাস্তায় কাঁচি হাতে যমুনার দিকে আসতে দেখে নাগরিকরা বিস্মিত হয়। গুণক কাঁচি হাতে নিয়ে পথ দিয়ে আসতে আসতে একসময় শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং কৃষ্ণের দিকে চেয়ে যুক্ত করে ক্ষীণকণ্ঠে বলে—'ভদ্র, যদি অনুমতি করেন তো, আপনাদের সকলের পোষাক কর্ত্তন করে গাত্র মাপ অনুযায়ী সজ্জিত করে দিই।'

কৃষ্ণ সম্মতিসূচক গ্রীবা নেড়ে বলেন—অবশ্যই ভদ্র, আপনার মহানুভবতায় আমরা কৃতার্থ। একটু দ্রুততার সঙ্গে আপনি আপনার কর্ম সম্প্রদানে প্রয়াসী হন, কারণ আমাদের ব্যস্ততা আছে। গুণক কৃষ্ণর কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাঁচি দিয়ে বস্ত্র কর্ত্তনে মনোনিবেশ করল। দ্রুতগতিতে কর্ম করতে থাকে সে। সবাইকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বস্ত্র ঠিক করে সুশোভিত করে দেয়। হাতে যেন তার যাদু আছে। কাঁচি যেন কথা বলতে বলতে সুচারুরূপে তার কর্ম সম্পন্ন করতে থাকে।

গোপবালকরা তাকে আশ্চর্য গতির সঙ্গে সুন্দর কর্ম করতে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। মথুরায় এসে এই প্রথম তারা এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত শিল্পকর্মীর দর্শন লাভ করল। রাজপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মথুরার নাগরিকরাও মুগ্ধ নয়নে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হয়ে যায়। ধন্য গুণকের শিল্পকলা। রঙ-বেরঙের বস্ত্রের যতটুকু প্রয়োজন—শরীরকে সুন্দর সুশোভিত করার জন্য ততটুকু রেখে বাকী অংশ সে ছেঁটে ফেলে দিল। কর্ত্তিত বস্ত্রের খণ্ড অংশ রাশিকৃত হয়ে পথে পড়ে রইলো।

দ্রুততার সঙ্গে কর্ম শেষ করে গুণক পুনরায় কৃষ্ণ বলরামের সামনে যুক্ত করে দাঁড়ালো। কৃষ্ণ তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কাঁধে কোমলকর স্থাপন করে বললেন,—'ইহলোকে তোমার সম্পদ অক্ষয় হোক। তোমার কোনদিন যেন অর্থাভাব না হয়। তোমার শরীর যুবকের ন্যায় বলশালী হোক। সকল ইন্দ্রিয় সতেজ থাক আজীবন। স্মৃতি হোক অটুট।'

মথুরার নাগরিকরা চকিত নয়নে দেখে—গুণকের শরীরের বার্দ্ধক্যের বলিরেখা অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথার কেশ শুভ্র থাকলেও সারা শরীরে তারুণ্যের দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে। কাঁধের উপর থেকে কৃষ্ণের কোমল কর স্বীয় হস্তদ্বয়ের দ্বারা মুঠী বন্দী করে বুকের উপর স্থাপন করে গুণক অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে—'হে ভদ্র, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন—আমি যেন বাকী জীবন আপনার এবং আপনার সেবকদের সেবায় অতিবাহিত করতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে মহান শিল্পী—আজ থেকে তুমি আমার নিত্যকালের সহচর।' কৃষ্ণের রক্তিম অধরপল্লব থেকে বাক্য নির্গত না হতেই সমবেত নাগরিকরা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—'ভগবান বাসুদেব কী জয়।' গুণকের ধ্যানতন্ময়তা সমবেত জনতার জয়ধ্বনিতে ভঙ্গ হয় না। সে জানে না তার দুইহাতের মধ্যে এখনও কৃষ্ণের হাত বন্দী হয়ে আছে। কৃষ্ণ হাত ছাড়িয়ে নিতেই-সে বিভোর, রোমাঞ্চিত শরীরে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে পথের উপরে। কৃষ্ণ বলরাম সখাসহ চলে যায়। চলতে চলতে একসময় তাঁরা রাজপথ ছেড়ে গলিপথ ধরে হাঁটতে থাকে। কৃষ্ণ-বলরাম রাজপথ ছেড়ে গলিপথে হাঁটছে কেন? সখারা ভেবে পায় না দুইভাইয়ের উদ্দেশ্য কী!

অন্যদিকে নাগরিকরা ভাববিভোর রোমাঞ্চিত কলেবর গুণককে তার দোকানে পৌঁছে দেয়। দোকানে পৌঁছে সে বুঝতে পারে না—সে কখন দোকানে এল-তার চোখের সামনে তখন শুধুই নীলমণি যশোদার দুলাল ভাসছে। সে শুনেছিল, পরশপাথর বলে একরকম পাথর আছে—যার স্পর্শে লোহা সোনা হয় কিন্তু এ নীলমণি কেমন মণি যার স্পর্শে সে নিজেই যেন এক নীলমণিতে রূপান্তরিত হয়েছে (ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি)। সে যেদিকে তাকায় শুধু নীলমণি নবঘন শ্যামসুন্দর দেখে। কাঁচি-সূঁচ বাদে দোকানের সমস্ত উপকরণ সুবর্ণে পরিণত হয়ে গেছে। কৃষ্ণ আশীর্বাদে তার ইহলোকের সম্পদ লাভ হয়েছে। গুণকের দুই নয়ন হতে অশ্রু ঝরছে। সে স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ে দোকান ঘরে। সামনে তার অনেক কাজ-রাজার বাড়ী থেকে লোক আসবে রাজার নতুন পোষাক নেওয়ার জন্য। এখন তাঁর কিছুই মনে পড়ছে না। নীলসুন্দরের ধ্যানে সে তন্ময়। তার হাত, হাতের শিল্পকর্ম এখন থেকে শুধু শ্যামসুন্দর ও তাঁর সেবকের জন্য সংরক্ষিত। অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করে—আজ থেকে আমি আর কারও বস্ত্র স্পর্শ করবো না—কারও কাপড় সেলাই করবো না—আমার হাত, হাতের শিল্পের অধিকার শুধুমাত্র কৃষ্ণের।

সুদামা মালী

গুণকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজপথ ধরে চলতে চলতে সহসা রাজপথের পার্শ্বস্থিত একটি গলিপথ দেখে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অগ্রজ বলরামের মুখের দিকে চাইলেন। বলরাম তা লক্ষ্য করে বললেন, 'গলিপথ দিয়ে কোথাও কোন বিশেষ স্থানে যেতে চাও?'

—গলিপথের শেষপ্রান্তে শুনেছি এক মালাকার বাস করে, তাকে একবার দেখতে চাই।

—তোমার ইচ্ছা যখন, তখন চল যাওয়া যাক।

বলরামের সমর্থন পেয়ে কৃষ্ণ সদলবলে গলিপথ ধরে হাঁটতে শুরু করেন।

—'কোথায় যাচ্ছিস রে কানু?' সখাদের একজন জিজ্ঞাসা করে।

—'নগর দর্শন করতে হলে শুধু রাজপথ আর বিশেষ বিশেষ স্থান দর্শন করলেই হবে না—গলিপথও দেখতে হবে। নগরের কোন গলি কেমন তাও জানতে হবে। তাছাড়া গলির মধ্যে কিছু দেখার থাকলেও থাকতে পারে।

সখারা কথার উত্তর না দিয়ে একসাথে চলতে থাকে। গলিপথেও মথুরার কতিপয় নাগরিকদের তাঁদের অনুসরণ করতে দেখা যায়। তারা কৃষ্ণ বলরামসহ গোপবালকদের গলিপথে যেতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—এরা চলেছে কোথায়? চোখে মুখে তাদের কৌতূহলের ছাপ কিন্তু কৃষ্ণ বলরামের নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহস তাদের নেই। তাদের মন বলছে, 'এরা সব অসাধারণ পুরুষ। বিশেষতঃ নীল সুন্দর কিশোরটি অবশ্যই স্বতন্ত্র ভগবান। যেভাবে কিছুক্ষণ আগে উনি কংসের রজককে শুধুমাত্র করাঙ্গুলি স্পর্শে নিহত করলেন—আবার ঐ করাঙ্গুলি স্পর্শে মথুরার শ্রেষ্ঠ সূচীশিল্পী গুণককে বৃদ্ধ থেকে তরুণে পরিণত করলেন—তাতে মনে হয় উনি অবশ্যই পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেব। নাগরিকদের মন এখন কৃষ্ণরঙে রঙিন। তাই তারা চুপচাপ কৃষ্ণ-বলরামের দলের পিছু পিছু চলেছে মন্থরগতিতে। চলতে চলতে গলির শেষপ্রান্তে অবস্থিত একটি সাধারণ বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ-বলরাম। বাড়ীর সংলগ্ন বৃহৎ পুষ্পোদ্যান থেকে পুষ্প-সৌরভ বাতাসে ভেসে এসে তাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে। —'কানু, এটা কার বাড়ী রে?'—সখাদের জিজ্ঞাসা।

কৃষ্ণ সখাদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে দাদা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে নির্দ্ধিধায় গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তা দেখে সখারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এক সখা বলল, 'আমাদের কানু তো সবার বাড়ী না বলেই প্রবেশ করে কিন্তু দাউদাদা? ওতো দেখছি আজ আনন্দ গদগদ হয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন পূর্ব পরিচিত প্রিয়জনের গৃহ। চল আমরাও ভিতরে যাই।' গোপবালকরা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু নাগরিকরা দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'শুনেছি গতকাল অক্রূরজী এই দুইভাইকে রথে বসিয়ে ধনুষযজ্ঞে অংশ নেওয়ার জন্য মথুরায় এনেছেন। সখারা দুই ভাইয়ের চরণ ধরে বারবার মিনতি করেছে—দাউদাদা—কানু-বৃন্দাবনে ফিরে চল। দুই ভাই অসম্মতি জানিয়েছে কিন্তু এই বাড়ীতে দুজনেই বিনা নিমন্ত্রণে প্রবেশ করলো। এটা নিশ্চয়ই গৃহমালিক সুদামার সৌভাগ্য বলতে হবে।'

মথুরার নাগরিকদের কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেল গৃহপতির নাম সুদামা। সুদামার নাম উঠতেই মথুরার নাগরিকদের মধ্যে সুদামাকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা বলতে থাকে মথুরায় একটা দিন ছিল যখন সুদামার হাতে গাঁথা মালা মন্দিরে প্রতিটি বিগ্রহের শ্রীকণ্ঠে শোভাবর্ধন করতো। এমন সুন্দর করে গাঁথা মালা কোথাও দেখা যায় না। সুদামা মালীর করস্পর্শে কুসুমরাশি যেন কথা বলে।

কোন মালায় কোন ফুলের পর কোন ফুল লাগবে—বড় না ছোট এ সুদামাই বিশেষরূপে জানে। কোন ঋতুতে কোন রঙের ফুল মালার শোভা বর্ধন করবে তা সুদামার মতো নিপুণভাবে কেউ জানে না। মালা না দেখে মালার আঘ্রান গ্রহণ করেই বলা যায় যে এ মালা সুদামার হাতে তৈরী। পুষ্পমালিকা ও পুষ্প অলংকার রচনার শৈলী তার অদ্ভুত অনুপম। তার তৈরী শিল্পকর্মের মূল্য কত,—এ ব্যাপারে সে ততটা আগ্রহী নয় যতটা আগ্রহী-গ্রাহক কী জন্য তার কাছে পুষ্প নির্মিত মাল্য অলংকার চাইছে তা জানার জন্য। তার হাতের তৈরী কুসুম শিল্পসম্ভার মথুরার মহারানীরও দুষ্প্রাপ্য-সাধারণ নাগরিকের তো কথাই নাই। মথুরার বন্দীনৃপতি উগ্রসেন তার শিল্পকলাকে সম্মান দেন, শ্রদ্ধা করেন আজও। যদি কোন গ্রাহক সুদামার কাছে গিয়ে পুষ্পমাল্য ও অলংকার প্রার্থনা করে তবে সুদামা সেই গ্রাহককে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি কী কারণে এই পুষ্পমালা ও অলংকার সংগ্রহ করতে চাইছেন?' ভগবান বিগ্রহের পূজা অথবা যজ্ঞের প্রয়োজনেই সে মালা বিক্রী করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ে সে পুষ্পমাল্য ভূষণাদি বিক্রী করে না। মাল্যভূষণের মূল্যবাবদ কে কী দিল তা সে দেখে না-মাল্যভূষণ নিয়ে গ্রাহক কি করবে এ ব্যাপারে সে সদা সতর্ক থাকে। যেদিন থেকে কংস মথুরার রাজ সিংহাসনে বসেছে সেদিন থেকে সুদামা তার কুসুম শিল্প কর্মসূচী থেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। কেউ চাইলে বলে, 'বয়স হয়েছে, হাতের আঙ্গুল ঠিকমত নড়াচড়া করে না—আর মাল্যভূষণ তৈরী করতে পারি না আগের মতো—তাই অবসর নিয়েছি।' বাগানের তরুলতার পুষ্পরাশি যেন তার সন্তান-সন্ততি। তাই দিনভর সে এখন বাগানের তরুলতামূলে জলসিঞ্চন করে, আগাছা পরিষ্কার করে। শুষ্ক গলিত পত্র ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। বাগান সব সময় সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। তার এই পবিত্র কর্মনিষ্ঠাই আজ বাসুদেবকে বলরাম ও সখাগণসহ এখানে আকর্ষণ করে টেনে এনেছে। মথুরায় এক তরুণ নাগরিকের ভাষায়,—'সুদামা যেন বাসুদেবের চিরকালের প্রিয়জন। তাঁর জন্যই তার বাগানে জলসিঞ্চন মাল্যভূষণ রচনা। বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এটাই তার পূজা, জীবনের পরমব্রত। মথুরানিবাসী এহেন প্রিয়জনের বাড়ীতে কৃষ্ণের তো বিনা আহ্বানেই সর্বাগ্রে পদার্পণ করা অবশ্য উচিত কর্ম। ধন্য মালাকার সুদামা, তুমি ধন্য! গোলোকের দুর্লভ অরূপরতন আজ তোমার মাটির অঙ্গনে।'

পাঠক এবার চলুন-সুদামার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করি।

গৃহের অভ্যন্তরে সুদামার তখন বিচিত্র দশা। সে শুনেছে অক্রূরজী বৃন্দাবন থেকে বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে মথুরায় এনেছে। তাই সে আনন্দে বিহ্বল। সুদামা মনে মনে বলছে, 'আমার স্বামী আমার আরাধ্য আজ মথুরায় এসেছেন। আমি জানি না তিনি কে? ভগবান না পরমপুরুষ। শুধু জানি তিনি আমারই প্রভু, আমার অন্তর্যামী। আমার প্রাণ, তাঁর পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে রয়েছি। তিনি কি আসবেন আমার মত দীন, নগন্য এক মালাকারের কাছে? যদি আসে তাহলে কী দিয়ে করবো তাঁর চরণ-বন্দনা?' তাই অক্রূর বৃন্দাবনে যাওয়ার পর থেকেই সে নবোদ্যমে বাগানের তরুলতার মূলে জল সিঞ্চন করতে থাকে।। তরুলতার দিকে চেয়ে চেয়ে বলে,—'আগামীকাল আমার মালিক, আমার প্রভু আসবেন। রাশি রাশি সুগন্ধিকুসুম বিকশিত কর নবপ্রভাতের আগে-প্রভাতে তাঁর চরণপদ্মে পড়ে তোমরা ধন্য হবে। আজ রাতের মধ্যে তোমার বাগানকে প্রাণভরে ফুল ফুটিয়ে সাজিয়ে রাখ—আগামীকাল মালীর ঘরে বনমালী আসবে তা কি তোমরা জান না?' বাগানের কাজ সারতে সারতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নেমে আসে। প্রভাত হয় কিন্তু তার বিশ্রাম নেই। বহুদিন পর আজ সে পরিত্যক্ত মালা গাঁথার সূঁচ সুতো কুসুমডালা হাতে তুলে নেয়—ইতিমধ্যে গতকাল সন্ধ্যার কিছু আগে সে মথুরার বাজার থেকে ফলমূল-মেওয়া মিছরী ধামাভর্তি করে ঘরে নিয়ে এসেছে এবং সযত্নে তা কুসুমবিছানো জায়গার উপর নামিয়ে রেখেছে।

আজ নবপ্রভাতের অরুনোদয়ের পূর্বেই সে পুষ্পমাল্য রচনার জন্য বাগানে গিয়ে ডালা ভরে ফুল তুলতে থাকে। তরুলতা ও তার কথামত আজ রাশি রাশি ফুলভারে অবনত প্রায়। সানন্দ হৃদয়ে ডালাভর্তি কুসুম চয়ন করে ঘরের দাওয়ায় বসে সে নিবিষ্ট চিত্তে পুষ্পমাল্য ও ভূষণ রচনা করতে থাকে। বহুদিন পর আজ সুদামা আপন শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করেছে। সুকোমল কিশলয়ের সঙ্গে সমঞ্জরী তুলসীপত্র আজ সে মালার

প্রতিটি কুসুমের সঙ্গে গ্রন্থন করছে। সে জানে না তাকে কতগুলো মালা অলংকার তৈরী করতে হবে। তৈরী করেই চলেছে...। মহান শিল্পী আজ আপন সৃষ্টিতে আত্মহারা তন্ময়। শরীরের দিকে তার হুঁশ নেই।

এমন সময় সুদামার কাছে উপনীত হলেন-বলরাম কৃষ্ণ সহ গোপসখাগণ। তাঁদের পদবিক্ষেপেও শিল্পী সুদামার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। কৃষ্ণ-বলরাম সখারা দেখতে থাকেন শিল্পীর শিল্প তন্ময়তা। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ ডাকেন-সু-দা-মা। সুদামা মুখ তুলে চায়। কৃষ্ণ বলরাম সহ সখাদের বাড়ীর অঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভাববিহ্বল হয়ে বলে,—''আমার স্বামী, আমার প্রিয়, প্রভু এসেছো'—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদামা কোনরকমে দুহাত দিয়ে পুষ্পডালা ও পুষ্পরাশিকে সরিয়ে দিয়ে সটান লুটিয়ে পড়ল দণ্ডবত প্রণামের ভঙ্গীতে দুইভাইয়ের সম্মুখে।

কৃষ্ণ বলরাম দু'ভাই নত হয়ে মাটি থেকে তুলে ধরেন সুদামাকে। যুগলে মিলিতভাবে সারা অঙ্গ থেকে ঝেড়ে দেন ধূলাবালি। পর্যায়ক্রমে করেন আলিঙ্গন। সুদামা মালীর নেত্রদ্বয় অশ্রুতে ভরে উঠে। কণ্ঠ থেকে স্বর নির্গত হয় না। ঐ অবস্থায় সে ফুলের আস্তরণ বিছিয়ে দেয় অর্থাৎ সকলের বসার জন্য ফুলের আসন তৈরী করে দেয়। দাদা ও সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ ফুলের আস্তরণের উপর বসেন। সুদামা চরণ প্রক্ষালন করেন কৃষ্ণসহ সকলের। চন্দন-ফুল-তুলসী চরণে অর্পণ করে ফলমূল মেওয়া-মিছরী তরুপত্রের উপর থরে থরে সাজিয়ে নৈবেদ্যাকারে সকলের সম্মুখে রেখে কৃষ্ণ বলরামের সামনে নতজানু হয়ে বলেন—''হে করুণা বরুনালয় এত কৃপা করে যখন অধমের ঘরে উপনীত হলেন, তখন অনুগ্রহ করে দীন সুদামার সামান্য ভোগ নৈবেদ্য গ্রহণ করুন।'' প্রেমভুখা বাসুদেব সুদামার প্রার্থনার আগেই ভোগ নৈবেদ্য তুলে নিলেন শ্রীমুখে। তাঁর দেখাদেখি সকলেই তাঁকে অনুসরণ করলেন।

প্রসন্নচিত্তে ভোগনৈবেদ্য পর্ব সমাপন হলে আচমন করলেন সকলে। সুদামা অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ আমার জন্ম সফল। গৃহ ধন্য। ধন্য আমার বাগানের কুসুমরাশি। আজ মনে হচ্ছে আমার পরম প্রেমময় প্রভু আমার মতো এক অকিঞ্চন নগণ্যজনকে আপনার বলে স্বীকার করে নিলেন। আপনার অনুগ্রহেই আপনাকে সেবা করার অধিকার পাওয়া যায়। আমি আপনার দাসানুসাদ। এবার বলুন অধমের প্রতি আপনার আদেশ কি?'

কৃষ্ণ বললেন, 'সুদামা, আমরা তোমার গৃহে এসেছি তোমার হাতে গাঁথা পুষ্পমাল্য ও অলংকার পরিধানের জন্য।'

মা-লা-, অ-লং-কার। সুদামা ভুলে যায় আজ সকাল থেকে সে এই প্রভুর জন্যই মাল্যভূষণ গ্রন্থনে নিয়োজিত ছিল। পরম অতিথিদের স্বাগত সৎকার জানাতে গিয়ে সে পুষ্পমালাভূষণ অর্পণ করতেই ভুলে গেছে। মালার প্রসঙ্গ উঠতেই সব মনে পড়ে তার। একে একে কৃষ্ণ বলরামসহ সকলকে মাল্যভূষণে সাজিয়ে দেয় সুদামা। কণ্ঠে মালা, কেশে মালা, মণিবন্ধে মালা, দুইবাহুতে মালা—সবশেষে সবার হাতে ধরিয়ে দেয় একটি করে কুসুমস্তবক। সুদামার কুসুমসাজে সজ্জিত হয়ে প্রসন্ন হন বনমালী। বলেন, 'তোমার মাল্যভূষণ বড় সুন্দর। তুমি বর প্রার্থনা কর। বল, কী চাও তুমি।' ইতিমধ্যে সুদামা সকলকে কুসুম সাজে সাজিয়ে নতজানু অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসে পড়েছে।—শ্রীকৃষ্ণ সুদামার মাথায় দক্ষিণ কর রাখলেন। তা দেখে গোপবালকরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই তো আমাদের ব্রজরাজ কুমারের যোগ্য কাজ। তারা সমবেত কণ্ঠে বলে—'মালী তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আমাদের ব্রজরাজকুমারের কিছুই অদেয় নাই।'

—'হে আমার মালিক। হে আমার স্বামী, আমাকে এই বর দাও, যেন জন্ম জন্ম তোমার চরণে আমার মতি থাকে।'

কৃষ্ণ বললেন, 'তথাস্তু!' ত্রিভুবনের অধীশ্বর সুদামার শিরে রেখেছেন অভয় দক্ষিণহস্ত। কৃষ্ণ করকমলের ছত্রছায়া যে প্রাপ্ত হয়েছে তার কি আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে?

সুদামা কী বর প্রার্থনা করল গোপসখারা তা শুনেও যেন শুনলো না। তাঁরা শুধু জানলো এ সুদামামালী বড়ই সাদা-সিধা এবং আপনভোলা। ও কোন কিছু নেওয়ার জন্য তৈরী নয়।

অভিন্ন সখা কৃষ্ণ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের পতন বা শরশয্যা গ্রহণের পর সর্বসম্মতিক্রমে কৌরবপক্ষের মহাসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন—পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। মহাসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়েই দ্রোণাচার্য প্রথম দিন অসংখ্য পাণ্ডবপক্ষীয় সেনা সংহার করলেন। আচার্যদেবের সংহার মূর্তি দেখে অর্জুন চিন্তিত। তিনি ঐ দিন যুদ্ধ শেষে রাত্রির প্রথম প্রহরে শিবিরে প্রবেশ করে কৃষ্ণের কাছে উপনীত হয়ে বললেন—''সখা, আচার্যদেবের রুদ্র রণোন্মাদ মূর্তি কি আজ লক্ষ্য করেছো?' কৃষ্ণ ঘাড় নেড়ে মৃদু হাসলেন। কোন উত্তর দিলেন না। অর্জুন কৃষ্ণের মুখপানে চেয়ে পুনরায় বললেন, 'আচার্যদেব পৃথিবীর কোন বীরযোদ্ধার চেয়ে কম নন। যুদ্ধে তাঁকে অজেয় বললেই চলে। আজ তাঁর যুদ্ধ দেখে আমার মনে হচ্ছে আগামীকাল যুদ্ধে কোনপক্ষ জয়লাভ করবে তা প্রায় অনিশ্চিত। তাই আমি জানতে চাই কালকের যুদ্ধে যদি কোন অমোঘ অস্ত্রাঘাতে আমি মারা যাই, তাহলে আমার মৃত্যুর পর তুমি কী করবে সখা?'

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম শিবিরের শয্যায় শুয়ে শুয়ে অর্জুনের কথা শুনছিলেন। কথা শেষ হতেই শয্যার উপর উঠে বসলেন এবং গম্ভীর হয়ে বললেন—'পার্থ তুমি এরকম কেন ভাবছো? আমি তোমার সঙ্গে যতক্ষণ রয়েছি ততক্ষণ ধরায় কে এমন বীর আছে যে অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করে তোমার জীবন নাশ করে দেবে? পৃথিবীতে এমন বীর এখনও জন্মায়নি—সৃষ্টিতে এমন কোন অস্ত্র নেই যা কৃষ্ণের সংকল্প বা ইচ্ছাকে ব্যর্থ করতে সমর্থ। স্বয়ং ভগবান শংকর যদি পিনাকপানি হয়ে কৌরব পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে আসে—সেও সমর্থ হবে না আমার প্রাণসখার প্রাণ নিতে—তাঁকে ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে যুদ্ধভূমি ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবী থাকুক অথবা টুকরো টুকরো হয়ে যাক, সারা সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাক, তবু পার্থ আমি সঙ্গে থাকতে কেউ তোমায় মারতে সমর্থ হবে না।'

কৃষ্ণের অভয়বাণীতে অর্জুনের মুখে হাসি ফোটে। সে স্মিত আননে কৃষ্ণকে বলে—'আমি জানি সখা, তুমি থাকতে কেউ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু সৃষ্টিতে কখনও যা হবার নয় তা যদি হয়। তোমার ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে যদি সত্য সত্যই আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার মরণের পশ্চাতে তুমি কি করবে?' অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর ক্রোধে কম্পিত হয়ে ওঠে—'শোন সখা পার্থ, যদি কখনও এ অসম্ভব সম্ভব হয় তাহলে জেনে রাখ সৃষ্টির সব নিয়ম মর্যাদা উল্টে যাবে। আমি থাকতে তোমার মৃত্যু হলে চক্র তুলে নেব হাতে। পলকের মধ্যে কৌরবপক্ষের সকল যোদ্ধা বীর ও সমর্থনকারীদের ধ্বংস করে দেব। ওদের সবাইকে সমূলে বিনাশ করে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে কপালে রাজটীকা পরিয়ে দেব। তারপর তোমার মৃত শরীর চিতায় তুলে দিয়ে নিজেও সেই চিতায় আরোহণ করবো। পার্থ, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সে তোমাকে ছেড়ে পৃথিবীতে এক দণ্ডও রইবে না। তুমি দেখে নিও পার্থ, কৃষ্ণ তোমার মৃত্যুর আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে।'' শ্রীকৃষ্ণের কথা শেষ হতেই, অর্জুন তাঁর পা দু'খানি (কৃষ্ণের) নিজের কোলে তুলে নিয়ে নয়নের অশ্রুধারায় ধুইয়ে দিলেন।

সুহৃদ পরমোদার ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তরীয় দিয়ে অর্জুনের চোখের জল মুছতে লাগলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পাদুখানি কোল থেকে নামিয়ে শয্যার উপর স্থাপন করলেন। অতঃপর নিজের মস্তক সেই চরণযুগলের মাঝে অঞ্জলি দিয়ে বললেন—'হে সখা, বেদমাতা যথার্থই বলেছেন—

''দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে।''

ন পারয়েহং

নন্দালয়ে একান্তে শ্রীকৃষ্ণ একদিন আপনমনে খেলা করছেন। সখারা এখনও কেউ এসে পৌঁছায়নি। নন্দনন্দনকে একান্তে খেলতে দেখে ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার আগমনের ফলে তাঁর খেলায় সাময়িক বিরতি পড়লো। তিনি গ্রীবাতুলে মনোহর ভঙ্গীতে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার বিরিঞ্চিদেব, তুমি এই সময় এখানে?'

—'হে আরাধ্যদেব, যদি অভয় দেন, তাহলে একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।'

মৃদু হেসে নীলমণি বললেন—'নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার যা জিজ্ঞাস্য তা ব্যক্ত কর'।

—'হে পরমপুরুষ। যে সমস্ত ব্রজবাসীরা নিজেদের ঐহিক পারলৌকিক সর্বসুখ বিস্মৃত হয়ে, আপনার সেবায় যথা সর্বস্ব সমর্পণ করেছে তাদের প্রতিদানে আপনি কী দেবেন? সব সাধনার অন্তিম লক্ষ্য বা প্রাপ্তি আপনি স্বয়ং। আপনাকে পাওয়ার চেয়ে বড় কিছু পাওয়া সৃষ্টিতে নেই। তবু আমার মন মোহিত হচ্ছে এই ভেবে যে, আপনি স্বয়ং নিজেকে ব্রজবাসীদের কাছে বিকিয়ে দিলেও ওদের দানের তুলনায় আপনার নিজেকে ওদের কাছে দান করা বা বিকিয়ে দেওয়া কী তুচ্ছ নয়? আপনি কি কখনও ওদের কাছ হতে ঋণমুক্ত হতে পারবেন? আপনার স্বরূপ অঘাসুর-বকাসুরাদি অসুররা আত্মীয়স্বজনসহ প্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি পুতনা যার বাইরের বেশ সুন্দর, অন্তর মলিনতায় ভরা, সেও বিষমাখা স্তনপান করাতে এসে আপনর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে যে ব্রজবাসীরা তাদের ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পত্তি, প্রিয়পরিজন শরীর মন-প্রাণ এককথায় সর্বস্ব আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করছে, যাদের সবকিছুই আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত সেই ব্রজবাসীরা যদি অঘাসুর, বকাসুর ও পুতনার মতো একই ফল প্রাপ্ত হয়—তাহলে ওদের কাছে আপনার ঋণ কখনও পরিশোধ হবে? আপনি ঋণী হয়ে থাকবেন ভেবে আমার মন বড়ই চিন্তিত। হে শ্যামসুন্দর! মদনমোহন এইসব ব্রজবাসীদের কাছ হতে আপনার ঋণমুক্তি কিভাবে হবে-তা যদি বলেন তবে কৃতার্থ হই।'

নন্দনন্দন ব্রহ্মার কথা শুনে কিছুক্ষণ মৌন রইলেন। তাঁকে মৌন দেখে ব্রহ্মা মনে মনে ভাবছেন, প্রভুকে এবার জব্দ করেছি। উত্তর দিতে পারছেন না। ব্রহ্মার মনের ভাব বুঝতে পেরে সর্বান্তর্যামী অখিল আত্মা শ্যামসুন্দর বললেন,—''হে ব্রহ্মাজী! তুমি পাগল-টাগল হয়ে যাওনি তো?'

—'এমন কথা বলছেন কেন প্রভু? আপনার চরণে আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে?'

—অপরাধ তো তুমি সেই একবারই করেছিলে—গোবৎস, সখাদের চুরি করে। আজ অবশ্য এই জিজ্ঞাসায় তোমার কোন অপরাধ হয় নাই তবে তুমি মনে মনে যা ভাবছো তা ঠিক নয়। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর অবশ্যই আমার আছে। আসল কথা কী জানো ব্রহ্মাজী, ব্রজবাসীদের প্রসঙ্গ উঠলেই আমি যে ভগবান, সর্বেশ্বর-একথাটা ভুলে যাই। তাই তোমার কথার উত্তর না দিয়ে মৌন ছিলাম। যাক যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। ব্রজবাসীদের সর্বস্ব সমর্পণের বিনিময়ে আমি কী কিছুই তাদের দিই নি? সাম্রাজ্য, বৈভব, অনন্ত ধনসম্পদ, সবই তো তাদের দিয়েছি। সুতরাং তোমার মনে এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আপনি যা বলছেন সবই ঠিক। কিন্তু সাম্রাজ্য, অনন্ত ধনসম্পদ আসলে কী? বিন্দু নয় কি? যদি বলেন কোথাকার বিন্দু? তাহলে বলবো অচিন্ত্য অনন্ত কৃষ্ণসুধা সিন্ধুর বিন্দু। আপনি সিন্ধু হয়ে এদের বিন্দুর প্রলোভন দিচ্ছেন। একি আপনার যোগ্য প্রতিদান প্রভু? বিন্দু দিয়ে আপনি এদের থেকে ঋণমুক্ত হতে চাইছেন?

—আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু ব্রহ্মাজী, আমি যদি নিজেকে এদের কাছে দান করে দি তাহলে তো ঋণমুক্ত হব।

—না প্রভু। আপনি নিজেকে দান করলেও ঋণমুক্ত হতে পারবেন না।

—কেন?

—আপনি তো পুতনাকেও আত্মদান করেছেন। তাহলে পুতনার থেকে ব্রজবাসীরা কী আর এমন বেশি পাবে।

—তাহলে উপায়? আচ্ছা ব্রহ্মাজী, আমি যদি ব্রজবাসীদের যত আত্মীয় কুটুম্ব আছে তাদের সবাইকে যদি আত্মদান করি—তাহলে কি ঋণমুক্ত হব না?

—হে পুরুষপ্রধান। আপনিই বলুন পুতনার কোন আত্মীয় কুটুম্বকে আপনি আত্মদান করেননি? তৃনাবর্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর এরা কি আপনার আত্মদানের করুণা থেকে বঞ্চিত? হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক, যে আপনাকে হত্যার ইচ্ছায় বুকের দুধে বিষ মাখিয়ে নিয়ে এল তাকে যে আত্মদান করলেন—সেই একই আত্মদান ব্রজবাসীদের? যারা নিজের অন্তরাত্মাকে পর্যন্ত আপনার চরণে উৎসর্গ করে দিয়েছে তাদের যদি ঐ একই আত্মদান হয় তাহলে বলবো আপনি কোনকালেই ব্রজবাসীদের কাছে ঋণমুক্ত হতে পারবেন না।

—তুমি ঠিকই বলেছো পদ্মযোনি (ব্রহ্মাজী)। আমার জন্য লোকাচার, শাস্ত্রাচার, আত্মীয়স্বজন এমনকি নিজের দেহকেও বিস্মৃত হয়ে যারা সব কিছু ত্যাগ করেছে তাদের ঋণশোধ করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তবে অঘাসুর-বকাসুর পুতনাকে আত্মদান করলেও আমার স্বরূপস্থিত যে প্রেম সে প্রেম আমি তাদের দান করি নাই। যা আমি শুধু ব্রজবাসীদের দিয়েছি। যদিও সেই প্রেম তোমার ভাষায় আমার অনন্ত প্রেমসিন্ধুর তুলনায় বিন্দুমাত্র। তবু আমার দেওয়া সেই বিন্দুমাত্র প্রেম পুনঃ আস্বাদনের নিমিত্ত আমি যে তাদের মণিময় প্রাঙ্গনে মূর্তিমান হয়ে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে নৃত্য করি, লুটোপুটি খাই—আমার সেইরূপ দেখে তাদের যে আনন্দ হয়—তাতে কি আমার ঋণমুক্তি হয় না?

—প্রভু, তোমার কথা শুনে আমার চতুর্মস্তক বিঘূর্ণিত হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—তুমিই বলে দাও—তুমি ওদের কাছে ঋণী না অঋণী।'

—দেখ ব্রহ্মাজী, রাসরজনীতে আমি ব্রজের গোপীদের বলেছিলাম "ন পারয়ে অহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।..." দেবতার আয়ু পেলেও গোপীদের বা ব্রজবাসীদের ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ গোপীরা যদি নিজগুণে আমার ঋণমোচন করে দেয় তাহলে আমি অঋণী হয়ে যাবো।

—সেটা কি সম্ভব?

—বোধ হয় না।

—তোমার পক্ষে কেন সম্ভব নয় প্রভু?

—দেখ ব্রহ্মাজী, বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের গুরু সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর গুরু অবিনাশী [পরমাত্মাস্বরূপ আমি], অবিনাশীর গুরু ব্রজবাসী। এখন তুমিই বল—নিরাকার থেকে নরাকার হয়ে—জগদগুরু থেকে শরণাগত শিষ্য হয়ে গুরুর ঋণ কি কখনও শোধ করা যায়?

ব্রহ্মা নিরুত্তর।

সব বোধের অবোধ লীলা

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের অনতিকাল পরেই নানাধরনের উপদ্রব শুরু হয়। পুতনা, তৃনাবর্তাসুর, বৎসাসুর ইত্যাদি কংসের দুষ্ট অনুচররা বারবার গোকুলে হানা দেয় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। কংসপ্রেরিত অসুর-রাক্ষসীর উৎপীড়নের হাত হতে কিভাবে অব্যাহতি লাভ করা যায় কিভাবে ব্রজের প্রাণধন নীলমণির জীবন সুরক্ষিত হবে এই বিষয়ে ব্রজবাসীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। একদিন এইরূপ এক আলোচনা সভায় নন্দমহারাজের ভ্রাতা উপানন্দ গোকুল পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বৃন্দাবন গোকুল অপেক্ষা অনেকখানি নিরাপদ। আলোচনা সভায় উপানন্দের প্রস্তাব বা পরামর্শ সাদরে গৃহীত হয়। সমস্ত ব্রজবাসী ব্রজজীবন কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য গোকুলের ঘরবাড়ি ভূমিসম্পদ সব পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। গোপপুরোহিত শাণ্ডিল্যমুনি বৃন্দাবন যাত্রার জন্য শুভদিন নির্ধারণ করে দেন। শুভদিনে তিনি (শাণ্ডিল্যমুনি) মঙ্গলময় শঙ্খধ্বনি করে বৃন্দাবন যাত্রার সূচনা করেন। শঙ্খধ্বনির শেষে ব্রজের রাজপথ অসংখ্য গোশকটে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। গোশকটের উপরে বাঁশ ও বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা নির্মিত একপ্রকার দু'মুখ খোলা ঘেরা মণ্ডপ স্থাপন করা হয় [গ্রাম বাংলার ভাষায় যাকে ছই গাড়ি বলা হয়]। সারিবদ্ধভাবে গোশকট চলেছে রাজপথ দিয়ে—আগে আগে গাভী ও গোবৎসের দল। গাভী ও গোবৎস দেখাশুনার জন্য গোপরা চলেছেন তাদের পিছু পিছু।

ধেনুর দল, গোশকটের পংক্তি অগ্রগমনের ফলে ব্রজপুরের আকাশ-বাতাস ধূলিজালে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় কে যেন শূন্যপথে অবলম্বনহীন মাটির দূর্গ রচনা করে চলেছে নিপুণ শিল্পীর মতো। শ্রেণীবদ্ধ একখানি চলমান শকটের অভ্যন্তরে যশোদা রোহিনী কৃষ্ণ বলরাম। গোশকট আরোহনের আনন্দে নীলমণি আজ বড়ই আনন্দ চঞ্চল। মাঝে মাঝে মা যশোদার কোল থেকে নেমে দু'মুখ খোলা ঘেরাটোপের বাইরে উঁকি মেরে দেখছেন রাস্তার দুপাশের দৃশ্যাবলী। নীলমণির চঞ্চলতায় যশোদা ভীতা-সন্ত্রস্তা হয়ে পড়েন—এই বুঝি আদরের ধন গো-শকট থেকে নীচে পড়ে যায়। তাঁর মাতৃহৃদয় নীলমণির ভাবী বিপদের আশঙ্কায় থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। কিন্তু নীলমণি যে বড়ই দুরন্ত। কথা শোনে না একদম। ঝুঁকে বাইরে উঁকি মারতে মা যশোদা নিষেধ করে নীলমণিকে। নীলমণি কর্ণপাত করে না সে কথায়। উল্টে মাকে প্রশ্ন করে—'মা আমরা কোথায় যাচ্ছি।' জননী যশোদা উত্তর দেন—''পুত্র! বৃন্দাবন নামান বনধামানি।'' অর্থাৎ আমার প্রিয় লাল (ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে উত্তর ভারতে লাল ও লালী বলে সম্বোধন করা হয়) আমরা বৃন্দাবনে যাচ্ছি।

নীলমণি তা শুনে কিছুক্ষণ মৌন রহিল। পরে মৌনভঙ্গ করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল মাকে—'কদা সদনমায়াস্যামঃ।' অর্থাৎ বাড়ী ফিরবো কবে? পুত্রের কথায় যশোদার অধরে মৃদু হাসি দেখা দেয়। তিনি বলেন,—'বাপনীলমণি বাড়ীঘর সব তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন যাচ্ছে।'—'বাড়ী আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে তাহলে গোকুলে আর ফিরবো না। কি মজা, কি মজা, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শ্যামসুন্দর করতালি দিতে লাগল।

নীলমণি দাদা বলরামকে জিজ্ঞাসা করল,—'দাদা, বৃন্দাবন বুঝি অনেক দূর?'

—ওটা আমি বলতে পারবো না, মাকে জিজ্ঞাসা কর।

শ্যামসুন্দর মায়ের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করেন—'মা বৃন্দাবন কোথায়? যশোদা পুত্রের কথায় উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। তা দেখে রোহিনীমাতা গোপালকে কোলে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন করতে করতে বলেন—'দুষ্টু-

মিষ্টি সোনামণি, বৃন্দাবন হচ্ছে যমুনার ওপারে।'

—'ছোট মা, যে যমুনায়—তুমি, মা আমরা স্নান করতাম, খেলা করতাম, সেই যমুনার ওপারে?'

—হ্যাঁ বাবা।

—'আচ্ছা ছোট মা, বলতো বৃন্দাবনে কী এমন আছে, যার জন্য আমরা এত কষ্ট করে গোকুলের বাড়ী-ঘর সব ছেড়ে যাচ্ছি।'

—শুনেছি ওখানে অনেক খেলার জায়গা আছে। অনেক ভালো ভালো খেলনাও ওখানে কিনতে পাওয়া যায়।

—'তুমি সত্যি বলছো ছোটমা।'

—'সত্যি! সত্যি! সত্যি!'

—'বাঃ বাঃ! কী মজা, কী মজা! কী আনন্দ'—আনন্দে ডগমগ হয়ে আনন্দময় নীলমণি ছোটমা রোহিনীর কোলে উঠে নৃত্য করছে। চুমায় চুমায় ভরে দিল রোহিনীর, যশোদার ও অগ্রজ বলরামের মুখকমল। নীলকমলের মধুর ছোঁয়ায় সব মুখকমলগুলি খিল-খিল করে হেসে ওঠে। দাদা বলরামের চিবুকটা ধরে বলে—'এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানিস দাউ দাদা?

—কি?

—'গাড়ী (শকট) হতে নেমে তোকে আর বন্ধুদের নিয়ে একছুটে চলে যাই বৃন্দাবনে। ইতিমধ্যে গাড়ীগুলো রাজপথ ছেড়ে বৃন্দাবনের ঘন বনপথ দিয়ে চলতে শুরু করেছে। পথের দুপাশে নানাধরনের বৃক্ষলতা বনের শোভাবর্ধন করে বিরাজ করছে—গাছের শাখায় শাখায় রঙ-বেরঙের পাখীরা গান করছে। বনের শোভা দর্শন করতে করতে সর্বজ্ঞ শিরোমণি আজ মায়ের কোলে বসে অবোধ বা অজ্ঞ শিশুর মতো একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলেছে। একটি নতুন বৃক্ষ দেখে কৃষ্ণচন্দ্র যশোদাকে জিজ্ঞাসা করল—'মা, ঐ যে বড় গাছটার পাতাগুলো দুলছে ঐ গাছটার নাম কি? যশোদার উত্তর—'এ অশ্বত্থ গাছ বাবা।'

—আচ্ছা মা, বলতো ঐ যে গাছটা রাস্তার ডান দিকে রয়েছে, ওটা কি গাছ?'

—কোন গাছটার কথা বলছিস সোনা?

—ওই যে গো মা, যে গাছটা অনেক অনেক ডিম প্রসব করে নিজের সারা গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছে, ঐ গাছটার কথা বলছি...

গোপালের কথা শেষ না হতেই যশোদা, রোহিনী হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠেন।

—মা, তোমরা হাসছো কেন?

—দূর বোকা! গাছ কি কখনও ডিম প্রসব করে?

—'ও গুলো তবে কি গাছ মা?'

—ও গুলো ডুমুর। ডুমুর গাছ। মা যশোদা নীলমণির নাকটা আলতো করে টিপে আদর করেন।

—আচ্ছা ছোট মা, এবার তুমি বলতো, ওই লম্বা লম্বা জটাওয়ালা গাছটার কি নাম?

—রোহিনী উত্তর দেন বটগাছ।

—আচ্ছা দাউদাদা, তুমি বলতো—এই রঙ-বেরঙের পাখীটার নাম কি?'

—ময়ূর।

—কুহু কুহু গান করছে ঐ পাখীটার কি যেন নাম।

বলরামের উত্তর—'কোকিল!'

—মানুষের মতো কথা বলে কোন পাখী?

—'শুকপাখী' (টিয়া)।

—'মাথাভর্ত্তি ডালপালা নিয়ে ছুটে আসছে ওটা কি?'

—'হরিণ।'

—ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে ওটা কি?

—'ভ্রমর'।

শকটের মধ্যে ভাই প্রশ্ন করছে—দাদা উত্তর দিচ্ছে। দুই মা ওদের কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে পংক্তিবদ্ধ শকটসমূহ বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অনতিদূরেই নীলযমুনার কলকল নাদ শোনা যাচ্ছে।

মা যশোদা কৃষ্ণবলরামকে বললেন—বাছা, তোমরা এবার কিছু খেয়ে নাও। মায়ের আদেশে দুইভাই গাড়ী হতে নীচে নেমে এলেন। অন্যান্য শকট থেকেও সখারা সব সেখানে এসে উপস্থিত হল। সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণবলরাম জলযোগে মনোনিবেশ করলেন।

বহুব্যঞ্জন বহুভাঁতি রসোই, ষটরস কে পরকার।
সূর শ্যাম হলধর দোউ ভাইয়া, ঔর সখা সব গওয়ার।। (সুরদাস)

বৃন্দাবনের ধূলিতে কুম্ভস্নান

মাঘ মাস। শীতকাল। ক'দিন পরেই প্রয়াগে কুম্ভমেলা বসবে। তাই চারিদিকে সাজ সাজ রব। বৃন্দাবনের কতিপয় বয়স্ক গোপগোপী স্থির করেছে—এবার তারা কুম্ভমেলা দর্শন করতে যাবে। যাওয়ার দিন নির্দিষ্ট করার জন্য তারা নন্দ মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানায়। নন্দ মহারাজ প্রভাতকালীন সভামণ্ডপে বসে তাদের তীর্থযাত্রার জন্য একটা শুভদিন ধার্য করে দেন। সভার কার্য শেষ হলে একজন বয়স্ক গোপ নন্দমহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কুম্ভস্নানে যাবে না?

—যাওয়ার তো খুব ইচ্ছা, দেখি কানুর মা কি বলে। ওর মা যদি রাজী হয় তাহলে যেতে পারি।

—আমরা অনেকেই যাচ্ছি তুমি আমাদের দলপতি, যদি সঙ্গে যাও, তাহলে খুব ভালো হয়।

—গৃহের ভিতরে গিয়ে একবার কানুর মাকে বলে দেখি, সে কি বলে। নন্দমহারাজ সভাগৃহ হতে বাসগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। বাসগৃহের প্রাঙ্গণে সখাদের সঙ্গে কানাই বলাই ক্রীড়ামগ্ন। সকলের অঙ্গ ধূলি ধূসরিত। মা যশোমতী রন্ধনগৃহের দাওয়ায় বসে সকলের জন্য প্রভাতী জলযোগের ব্যবস্থা করছেন। গৃহকর্তাকে প্রবেশ করতে দেখে তিনি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখকমল ঈষৎ আবৃত করলেন।

কানাই বলাই খেলা ছেড়ে পিতার কাছে উপস্থিত হয়। নন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন—'তোমাদের খেলা কি এখনকার মতো শেষ?'

—'খেলা এখনও শেষ হয়নি, আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছে, মা'ও অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছে—তাই, খেলা বন্ধ রেখে খেতে চললাম মায়ের কাছে'। কানাই বলাই একসঙ্গে উত্তর দেয়। ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে মায়ের কাছে খেতে যাও। এইভাবে ধুলোমাখা গায়ে খেতে বসলে নানা রোগ-ব্যাধি হয়।

—পিতাজী, সখারা সব আমাদের সঙ্গে এখানেই খাবে তো? কানাই পিতাকে জিজ্ঞাসা করে।

—সখারা খেলে তুমি খুশী হবে?

—হ্যাঁ পিতাজী। ওরা আমাদের বাড়ি রোজ রোজ যদি খায়, তাহলে আমি খুব খুশী হই।

—বেশ তাই হবে। এখন থেকে তোমার বন্ধুরা রোজ তোমার সঙ্গে যেমন খেলবে, তেমনি রোজ এখানেই খাবে।

ইত্যবসরে বলরাম একখানি বসার চৌকি নিয়ে এসে বলে—'পিতাজী উপবেশন করুন। তা দেখে কানুও জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে এসে বলে—'পিতাজী, হস্তপদ প্রক্ষালন করুন। নন্দমহারাজ দুইভাইয়ের অঙ্গ থেকে ধুলো ঝেড়ে দিয়ে উভয়ের শ্রীঅঙ্গ সিক্ত বস্ত্রদ্বারা মুছে পরিষ্কার করে বললেন—সখাদের নিয়ে রান্নাঘরে খেতে বসগে যাও।' সখাসহ কানাই-বলাই রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। সেখানে প্রভাতীভোজন পর্ব শেষ করে পুনরায় সকলে ক্রীড়ায় মগ্ন হল। নন্দমহারাজও জলযোগ সমাপন করে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর যশোমতী মাও এক খিলি পান বাটায় ভরে নন্দমহারাজের বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে বলেন—'এই নাও তোমার মুখশুদ্ধির পান।' যশোমতীর হাতের বাটা থেকে পানটি তুলে নিয়ে নন্দমহারাজ মুখের ভিতরে প্রেরণ করে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে চর্বন করতে লাগলেন। মা যশোমতী নন্দমহারাজের পদপ্রান্তে বসে পদসংবাহন করতে থাকেন। পান চর্বন করতে করতে নন্দমহারাজ যশোমতীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'যশোমতী, চল এবার প্রয়াগে কুম্ভস্নান করে আসি। ব্রজমণ্ডলের অনেকেই যাচ্ছে—চল, আমরাও ঘুরে আসি।

—দুরন্ত কানাইয়ের জ্বালায় আমার কি তীর্থে গিয়ে পুণ্য করার উপায় আছে? ওখানে শুনেছি জলের খুব স্রোত। কানাই যদি ওখানে চঞ্চলপনা করতে গিয়ে জলে ডুবে....আর বলতে পারেন না যশোমতি, হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেন।

—তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ যশোমতী, সঙ্গে অনেক লোক থাকবে। তাছাড়া তুমি না হয় কানুকে নদীর তীরে রোহিনী দিদির কাছে রেখে স্নান করবে—তাহলে তো আর কিছু হবে না।

—কি জানি, যা দূরন্ত ছেলে। দিদি কি ওকে সামলাতে পারবে?

—তোমার চেয়ে কানু রোহিনী দিদির কথা বেশি শোনে। তুমি একটু শাসন করলে কানু ছোটমার কাছে তোমার নামে নালিশ করে। কাজেই ওর জন্য অকারণ আশঙ্কা না করে, চল যাওয়া যাক।

—তুমি যখন বলছো, তখন চল একবার তীর্থের পুণ্যস্নানটা সেরেই আসি। দেখতে দেখতে কুম্ভস্নানের দিন এগিয়ে আসে। কানাই-বলাইও ইতিমধ্যে জেনে গেছে মা, ছোটমা, বাবা সব প্রয়াগের তীর্থস্নানে যাবে। তীর্থযাত্রার জন্য নির্ধারিত দিনের পূর্বরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করল—, শ্রীধাম বৃন্দাবনে আমার উপস্থিতির ফলে এখানে সর্বতীর্থ বিরাজিত। কিন্তু ব্রজবাসীসহ আমার মা-বাবা তা জানে না। আমার এবং আমার ভক্তের পাদস্পর্শধন্য এই বৃন্দাবন—ধামের ধূলিকণার মাহাত্ম্য কী তা ওদের কাছে আমাকেই প্রকট করতে হবে।

লীলানায়ক নতুন লীলার সংকল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল শয্যায় মায়ের পাশে। পরদিন প্রভাতে নন্দ-যশোদা-রোহিনীসহ ব্রজবাসীরা যখন তীর্থযাত্রার জন্য পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে প্রস্তুত প্রায়, তখন হঠাৎ একটি কালো ঘোড়া নন্দমহারাজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে অঙ্গনের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে থাকে। ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ার ফলে ঘোড়াটির গায়ের রঙ কালো থেকে সাদা হয়ে যায়। তা দেখে বিস্মিত নন্দ-মহারাজ মনে মনে ভাবেন—কি ব্যাপার! এর রহস্য কি? নন্দমহারাজের মনে এই প্রকার প্রশ্নের উদয় হওয়ামাত্র সেই ঘোড়া এক দিব্যসুন্দর পুরুষ রূপধারণ করে নন্দমহারাজের পায়ে প্রণাম জানিয়ে বলে—"হে মহারাজ আমি তীর্থ রাজ প্রয়াগ [এলাহাবাদ]। পাপীগণ আমার তীর্থে স্নান করে পাপ ত্যাগ করে ফলে আমার শরীরের বর্ণ কালো হয়ে যায়। আমি সেই পাপের বোঝা হালকা করার জন্য বছরে একবার এইস্থানে এসে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে যাই। এখানকার ধূলি নিষ্কাম ব্রজ—গোপগোপীদের প্রেমবারিতে সিক্ত। তাই এই ধূলিতে গড়াগড়ি দিলে আমার সর্ব অঙ্গের পাপ দূর হয়ে যায়।" এই কথা বলে সেই দিব্য সুন্দর পুরুষ অন্তর্হিত হলেন। তাঁর কথা শুনে নন্দমহারাজ ভাবলেন যদি তীর্থরাজ প্রয়াগ আমাদের ব্রজের ধূলায় পবিত্র হওয়ার জন্য এইস্থানে আগমন করে—তাহলে আমরা কেন মিছামিছি এইস্থান ত্যাগ করে প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে যাব? অতঃপর তিনি অপেক্ষমান সমস্ত ব্রজবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—"শোন শোন ব্রজবাসীরা সব মন দিয়ে শোন—আজ থেকে আমরা সবাই এই ব্রজধামের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে প্রয়াগের কুম্ভস্নানের চেয়ে অধিক পুণ্য অর্জন করবো। নন্দমহারাজের কথায় সকল ব্রজবাসী ধূলায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। মহাকুম্ভ স্নানের সূচনা হয়।

ঘরে বাইরে লুকোচুরি

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে ব্রজমণ্ডলস্থিত অধুনা পখরপুর নামক গ্রামের নিকট উপস্থিত হলেন। পথশ্রমে সখারা ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত। কিন্তু গ্রামের আশেপাশে কোথাও জলের সন্ধান না পেয়ে তারা অবশেষে কৃষ্ণকে বললেন—'কানু আমাদের প্রবল জলতৃষ্ণা পেয়েছে তুই আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর।' সখারা জলপিপাসায় কাতর শুনে শ্রীকৃষ্ণ কটিদেশে গুঁজে রাখা মুরলীটি হাতে তুলে নিয়ে তাতে মধুর তান তুললেন। মুরলীর সুরলহরীর প্রভাবে সেখানে একটি জলপূর্ণ পুষ্করিণীর সৃষ্টি হল। সখারা সেই পুষ্করিণীর মধুর জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। বাঁশীর তানে যে স্থানে পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। কৃষ্ণস্মৃতি বিজড়িত জনবসতির নাম হয় পখরপুর। এই পখরপুর হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত কামরগ্রাম। 'কামর' শব্দের অর্থ ওড়না বা উত্তরীয়। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে একদিন এইস্থানে আসেন। পথে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্দদেশ হতে কৌতুক করার জন্য উত্তরীয়টি অপহরণ করে লুকিয়ে রাখেন। গোচারণের মাঠে শ্রীকৃষ্ণ প্রায়ই নিজের উত্তরীয়টি হয় গাছের শাখায় নয়তো বা কোন তরুতলে স্কন্ধ হতে নামিয়ে রাখতেন। গোধূলি বেলায় যখন ধেনুর দলসহ গৃহাভিমুখে রওনা হতেন তখন দেখতেন কাঁধে তার উত্তরীয় নেই। তিনি তখন বলরামের কাঁধ থেকে নীল উত্তরীয়টি টেনে নিয়ে নিজের কাঁধে রাখতেন। সখারা বলতো—'কানু তুই দাউ-দাদার উত্তরীয় নিয়েছিস কেন?

—'কে বলল এটা দাউ-দাদার উত্তরীয়, এটা তো আমার।'

—দেখ কানু, মিথ্যা বলিস না, তোর উত্তরীয়ের রঙ পীত, দাউ-দাদার নীল, ভালো করে দেখ ওটা কার?

—আরে দাদার উত্তরীয় মানেই আমার উত্তরীয়। আমি আর দাদা কি আলাদা?

—দেখ কানু, তুই প্রতিদিন নিজের উত্তরীয় এখানে ওখানে ফেলে রাখিস নয়তো হারাস। পরে উত্তরীয়ের কথা মনে না পড়লে এর-ওর নিয়ে টানাটানি করিস। এই তো সেদিন ভদ্র-র [এক সখার নাম] উত্তরীয়টা কাঁধে রেখে বলেছিলি আমার। পরের দ্রব্যকে নিজের দ্রব্যবলা কি ঠিক?

—আমি কি তোদের থেকে আলাদা, তোদের সব দ্রব্যই আমার দ্রব্য। আবার আমার সবকিছুই তো তোদের। রাগ করিস না। ভুল করে না হয় 'দাউ-দাদার' টা নিয়ে ফেলেছি। ঠিক আছে আর কোনদিন এমন ভুল হবে না।' গোচারণের মাঠে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় হারানো নিয়ে সখাদের মধ্যে মধুর কলহ হত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কৌতুক করার জন্য সখারা কামর গ্রামে গোচারণে যাওয়ার পথে উত্তরীয়টি অপহরণ করে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে কামর গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হয়ে একটি তরুতলে বসে শ্রীমুখকমল হতে শ্রমজল [ঘাম] মোছার জন্য কাঁধে হাত রেখে দেখেন উত্তরীয়টি নেই। তখন তিনি সখাদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা কি কেউ তাঁর উত্তরীয়টি নিয়েছে? সখাদের মধ্যে একজন বলেন—'তুই রোজ রোজ উত্তরীয় হারাবি, আর আমাদের বলবি খুঁজে বের করে দিতে। আমরা গোচারণে এসেছি না তোর উত্তরীয় পাহারা দিতে এসেছি। তোর জিনিস তুই খুঁজে বের কর।' শ্রীকৃষ্ণ এধার-ওধার উত্তরীয়টির সন্ধানে বিচরণ করেন কিন্তু কোথাও খুঁজে পান না। সখাদের ধেণু পাহারায় রেখে তিনি সারাপথ উত্তরীয়টি খুঁজতে থাকেন কিন্তু কোথাও না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে সখাদের কাছে ফিরে এসে বলেন—'নারে, কোথাও পেলাম না, যে পথ দিয়ে এখানে এসেছিলাম। সেই পথের সবটাই ঘুরে ফিরে এলাম—কোথাও উত্তরীয়টা পড়ে থাকতে দেখলাম না। কথাগুলো একটানা বলে শ্রীকৃষ্ণ গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তাঁর হতাশ মুখ দেখে সখারা বলেন—'কানু মন খারাপ করিস না। গোচারণে আসার আগে মনে হয় ওটা বাড়িতেই রেখে এসেছিস। চল ঘরে ফেরার সময় হল, ধেণু নিয়ে গৃহে ফিরে যাই।' গোচারণ শেষে সখাসহ ধেণুর দল নিয়ে নন্দভবনে ফিরে

আসেন কৃষ্ণ। মা যশোদা সারাদিনের শ্রমক্লান্ত গোপালকে আদর আপ্যায়নের জন্য কাছে এসে দেখেন—তাঁর নীলমণির কাঁধে আজ পীত-উত্তরীয়টি শোভা পাচ্ছে না। তিনি গোপালকে জিজ্ঞাসা করেন—বাপ নীলমণি, তোমার উত্তরীয়টি কোথায়?

—গোপাল মনে মনে ভাবছে, যদি বলি হারিয়ে গেছে তাহলে মা বকবে।

কারণ উত্তরীয় হারানো নিয়ে সখারা প্রায়ই মাকে নালিশ করে। মা অন্যদিন মৃদু তিরস্কার করে চুপ হয়ে যান বিশেষ কিছু বলেন না। কিন্তু আজ যে উত্তরীয়টি হারিয়েছি মা তা এক পণ্যব্যবসায়ীর কাছে ক্রয় করে নিজের হাতে তাতে নকশা রচনা করে দিয়েছিলেন তাঁর নীলমণিকে সুন্দর দেখাবে বলে।" গোপালকে চিন্তান্বিত দেখে যশোদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—চুপ রইলে কেন? উত্তর দাও উত্তরীয় কোথায়?

—মা, গোচারণের মাঠে সখাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সময় কদমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। খেলার সময় অন্যমনস্ক ছিলাম, মনে হয় সেই ফাঁকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

—ভালো করে খুঁজে দেখেছ—হাওয়ায় উড়ে গিয়ে দূরে কোথাও পড়েনি তো?

—না মা, দূরে কোথাও পড়েনি। আমার মনে হয় ওটা চুরি হয়ে গেছে।

—সখাদের সব জিজ্ঞাসা করেছ, তারা কেউ দেখেনি কোথাও পড়ে থাকতে?

—খেলা শেষ হতে ভদ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার উত্তরীয়টা কোথায় জানিস? ও বলল হাওয়ায় উড়ে যমুনার জলে পড়ে ভেসে গেছে। বলতে বলতে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ কেঁদে ফেলেন। মা গোপালের কান্না দেখে গোপালকে বুকে চেপে ধরেন। গোপাল মায়ের বুকে মাথা রেখে উত্তরীয়টির জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। মায়ের হাতের নকশা করা উত্তরীয় গোপালের বড়ই প্রিয়—তা হারিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মা খুব দুঃখ পেয়েছে। ইত্যবসরে শ্রীদামা-অপহরণ করা উত্তরীয়টি যশোদার হাতের তুলে দিয়ে ইশারায় বলেন—চুপ! যেন কানু জানতে না পারে। যশোদা মুচকি মুচকি হাসেন—ছেলে ও ছেলের সখাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। উত্তরীয়টি যে নীলমণির সখারা লুকিয়ে রেখেছিল মজা করার জন্য তা বুঝতে যশোদার বিলম্ব হল না। তিনিও তখন গোপালকে নিয়ে আরও একটু মজা করার জন্য বললেন—"সুবল তুমি জান গোপালের উত্তরীয় কোথায়? সুবল বলে—মা গো কী বলবো—গোপাল যে পদ্মসুরভী গাভীটির দুধ খেতে ভালোবাসে, সেই গাভীটি গোপালের উত্তরীয়টি খেয়ে ফেলেছে।" তা শুনে গোপাল মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে বলে—মা, পদ্মসুরভীর অসুখ করবে না তো?

—দূর বোকা ছেলে, গাভী কখনও বস্ত্র খায়?

—মা আগামীকাল যখন গোচারণে যাবো, তখন তুমি আমাকে আর একটা ঐরকম উত্তরীয় দেবে?

—কেন ঐরকম উত্তরীয় চাইছ?

—ওতে যে তোমার ছোঁয়া লেগে আছে। মাঠে ধেণু চরাতে চরাতে মনে হয় তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছ।

গোপালের কথা শুনে যশোদার নয়নে অশ্রু দেখা দেয়। তিনি নীলমণির মুখের দিকে চেয়ে বলেন, —'আগামীকাল নয়, আমি আজই তোমাকে ঐরকম একখানা উত্তরীয় দেব কিন্তু একটা শর্ত।

ব্যাকুল নয়নে গোপাল জিজ্ঞাসা করেন,—'কি শর্ত মা?'

—সখাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তোমাকে নৃত্য করতে হবে। বল রাজী?

গোপাল সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে—সখাদের মধ্যমণি হয়ে মোহননৃত্য শুরু করে। নৃত্যশেষে যশোদা দেন উত্তরীয় পুরস্কার। গোপাল ভাবে আর একটা নতুন উত্তরীয় পেলাম।

প্রতীক্ষায় কাঁদে জননী

শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীরে লীলা সম্বরণ করে নিত্যলোকে প্রস্থান করেন। মহাপ্রয়াণ দিবসের পূর্বসন্ধ্যায় তিনি সারথি দারুককে নির্দেশ দেন, সে যেন রথ নিয়ে অবিলম্বে হস্তিনায় পৌঁছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে আসে। দ্বারুক তাঁর নির্দেশমত অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে আসেন। দ্বারকায় প্রবেশ-এর আগে অর্জুনের বুক কেঁপে ওঠে। শোকস্তব্ধ হৃদয়ে তিনি ভাবেন—কৃষ্ণবিহীন দ্বারকায় কেমন করে প্রবেশ করবেন? দ্বারকায় প্রবেশের পূর্বেই তিনি পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণসহ বলরামের মহাপ্রয়াণের বার্তাসহ যাদবদের বিনাশের সংবাদ পেয়েছেন। রথের অশ্বগুলিও বুঝতে পেরেছে—তাদের প্রিয়প্রভু আর ধরাধামে নেই। তাই নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে পড়ল। রথ থামতে দেখে দারুক অশ্বগুলিকে সঞ্চালনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অর্জুন লক্ষ্য করেন—কৃষ্ণ বিহনের বার্তা পেয়ে অশ্বগুলির নেত্র হতে অবিরাম ধারায় অশ্রু ঝরছে। তিনি দারুককে বলেন,—"রথ এখানেই থাক, আমরা এখান থেকে পদব্রজে নগরে প্রবেশ করব।"

রথ হতে অবতরণ করে তিনি ও দারুক অশ্বগুলির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। অশ্বগুলি যেন অর্জুন ও দারুকের দিকে চেয়ে বলে—"কৃষ্ণহীন নগরে প্রবেশ করতে হয়—তোমরা কর, আমরা পারব না।" দারুকও বেশ কিছুক্ষণ ধরে অশ্বগুলির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন,—'রথ নিয়ে তোরাও আমাদের সঙ্গে হেঁটে চল। তোদের প্রিয় প্রভুর বৃদ্ধ মা বাবা যে এখন বেঁচে আছেন তাঁদের দেখবে কে? কে দেবে পুত্র শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা?' দারুকের কথা অশ্বগুলি বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হল—তাই যাত্রীবিহীন রথ নিয়ে তারা মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারুক ও অর্জুন রথ-অশ্বসহ দ্বারকা নগরে প্রবেশ করলেন। রাজপ্রাসাদের আস্তাবলের নিকটস্থিত প্রাঙ্গণে রথস্থাপন করে—দারুক অশ্বগুলিকে বন্ধনমুক্ত করে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিলেন। পরে অর্জুনকে বললেন, আপনি প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন—আমি পথশ্রমে ক্লান্ত অশ্বগুলির পরিচর্যা করবো। অর্জুন বললেন—'দারুক কৃষ্ণবিহীন প্রাসাদে প্রবেশ করার আগে আমার পাদুটি এত ভারী হয়ে উঠল কেন? মাতা দেবকী পিতা বসুদেব প্রাসাদ কক্ষে বসে পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন—তা আমি কেমন করে প্রত্যক্ষ করবো। দারুক এখানে প্রবেশের পূর্বে পথে কেন আমার মৃত্যু হল না। প্রাসাদের চারিদিকে সখাকৃষ্ণের স্মৃতি...নগরের প্রতি ধূলিকণায় তাঁর পবিত্র ছোঁয়া...শুধু চির অভয়দাতা সখা নেই পাশে...ডুকরে কেঁদে ওঠেন অর্জুন।

—বীরবর। শোক সংবরণ করুন। মাতা দেবকী-পিতা বসুদেব এ অবস্থায় আপনাকে দেখলে আরও ভেঙে পড়বেন।

—জান দারুক, সখাও বলতো, শোকে মুহ্যমান হওয়া জ্ঞানীর লক্ষণ নয় কিন্তু দারুক যে কক্ষটিতে আমার প্রাণসখা থাকতো সেই কক্ষে আমি কেমন করে প্রবেশ করবো? তুমি আমাকে এ কোন দ্বারকায় আনয়ন করলে? আমাকে আবার রথে চড়িয়ে হস্তিনায় ফিরিয়ে নিয়ে চল। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিলাপ করতে থাকেন অর্জুন। অন্তরে প্রতিধ্বনি হয় সেই প্রাণপ্রিয় সখার কম্বুকণ্ঠ নিঃসৃত অমৃত-অভয় বাণী—"অস্ত্র যাকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি যাকে দগ্ধ করতে পারে না, বায়ু যাকে শুষ্ক করতে পারে না, জল যাকে আদ্র করতে পারে না—সেই অবিনাশী আত্মা আমি।" 'কে? কার কণ্ঠস্বর?' মুখের উপর থেকে দুহাত সরিয়ে দেখেন—কেউ নাই কাছে। দারুক তাকে একলা রেখে অশ্বশালায় চলে গেছে তাদের পরিচর্যার জন্য। একপা-একপা করে তিনি শ্লথ গতিতে এগিয়ে চলেন কৃষ্ণের কক্ষের দিকে। কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতেই সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। ছত্রিশ বছর আগে ফেলে আসা একখানা ছবি অর্জুনের স্মৃতিপটে ভেসে

ওঠে। যখন সে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বজনদের দেখে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে ভয়ে শোকে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল তখন সখা কৃষ্ণ তাঁকে শুনিয়েছিল—

"দেহী নিত্যম্বধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বানি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।

[গীতা ২য় অধ্যায় ৩০ নং শ্লোক]।

অর্থাৎ হে ভারত [অর্জুন], প্রাণিগণের দেহে আত্মাসদা অবধ্য। সেজন্য কোন প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়।"

অর্জুন ভাবাপ্লুত স্বরে আবৃত্তি করে সখার অভয়বাণী। 'কে? কে কথা বলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে? ও কৃষ্ণ! মা-বাবার কথা মনে করে ফিরে এলি বাবা। ইতিমধ্যে অর্জুন কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন—কক্ষের এককোণে জীর্ণ আসনে বসে 'হাকৃষ্ণ-হাকৃষ্ণ' বলে দেবকী বসুদেব বিলাপ ক্রন্দন করছেন। অর্জুন প্রণাম করেন উভয়কে। বৃদ্ধ বসুদেব-বৃদ্ধা দেবকী, তাদের দৃষ্টি ক্ষীণ, গাত্রচর্মে বলিরেখা। উভয়ের মাথায় শুভ্রকেশ। অর্জুনকে কৃষ্ণ মনে করে উভয়েই জিজ্ঞাসা করেন—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কার সাথে কথা বলছিলি বাবা?

—তা-ত, আমি কৃষ্ণ নই, আমি অ-র্জু-ন...বলতে পারে না কণ্ঠরুদ্ধ হয় তৃতীয় পাণ্ডবের।

—অর্জুন! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন বসুদেব।

—হ্যাঁ আমি অর্জুন—আপনার জামাতা, পুত্রের সখা। কোনরকমে নিজেকে শক্ত করে উত্তর দেন অর্জুন।

অর্জুনের মাথায় কম্পমান হাত রেখে বসুদেব জিজ্ঞাসা করেন—'কৃষ্ণের বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না বাবা। বলরাম কোথায় জান? প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সাত্যকি এরা সব কোথায় গেছে বলতে পারো?

—অর্জুনের সারা শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তিনি কাঁপতে থাকেন। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন।

—না, কেউ কোথাও নেই। বসুদেবের হাতদুটি নিজের হাতের মধ্যে ধরে বলেন—তাত, শান্ত হোন। কৃষ্ণকে তো আমরা এখন একরূপে, একস্থানে দেখতে পাব না। কৃষ্ণের অস্তিত্ব এখন আমাদের সকলের মধ্যে বিরাজমান। কৃষ্ণ আমাদের সকলের মধ্যেই জীবিত তাত।

—কৃষ্ণ যদি জীবিত, তাহলে এই অভাগিনীকে মা বলে ডাকছে না কেন? জিজ্ঞাসা করেন দেবকী।

—অর্জুন দেবকীর দিকে চেয়ে বলেন—'আপনি কৃষ্ণ জননী হয়ে নিজেকে অভাগিনী বলছেন কেন?'

—জগতের যে মা নিজের গর্ভের সন্তানকে বুকের দুধ পান না করিয়ে অপরের ঘরে পাঠিয়ে দেয়—সে যদি অভাগিনী না হয় তবে জগতে অভাগিনী কে? যে জননী তাঁর কচি সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখচুম্বন করতে পারে না—চন্দন, কাজলের টিপ দিয়ে সাজাতে পারে না, সেকি অভাগিনী নয়?

অর্জুন বিষাদময় পরিবেশের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন,—

'শুনেছি আপনার পুত্রকে যশোদা খুব আদরের সঙ্গে লালন পালন করেছিলেন।

—তাই তো নিজেকে বলি কেন তুই যশোদা না হয়ে দেবকী হলি? আমি তো কখনও কৃষ্ণকে তাঁর প্রিয় মাখন-মিছরী হাতে করে খাওয়াই নি। কখনও লালকে [কৃষ্ণকে] কোলে শুইয়ে পিঠে চাপড় দিতে দিতে ঘুম পাড়ানির গান শোনানোর সৌভাগ্য আমার হয়নি—হবে ও না কোনদিন....দেবকী ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করেন। 'কৃষ্ণের মতো মহান সন্তানের জননী হয়ে অমন কথা মুখে আনবেন না মা। দেখবেন আপনার হাতে মাখন-মিছরী খাওয়ার জন্য কৃষ্ণকে আবার আসতে হবে ধরণীর বুকে'—অর্জুন সান্ত্বনা দেন দেবকী মাতাকে। দেবকী কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন—'জান অর্জুন একবার আমি কৃষ্ণকে নিজের হাতে মাখন-মিছরী খাওয়ানোর জন্য জেদ করি। আমার পুত্র, আজ হস্তিনা-কাল ইন্দ্রপ্রস্থ—পরশু প্রাগ-জ্যোতিষপুর প্রত্যেকদিন কোথাও না কোথাও রাজকার্যের জন্য বের হয়ে যেত। আর্যাবর্তের জটিল রাজনীতি তাঁকে একদণ্ড দ্বারকার বাসভবনে তিষ্ঠতে দিত না। দ্বারকায় সে খুব কম সময়ই থাকত। একদিন তাঁকে দ্বারকায় অবস্থান করতে দেখে আমি নিজের ঘরে ডেকে পাঠাই। সে এলে আমি বলি—'আজ তোমাকে আমি নিজের হাতে খাওয়াবো। সে কোন কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি তার হাত ধরে ঘরের ঐ কোণটায় আসন

বিছিয়ে বসিয়ে দিই—তারপর থালাভর্তি মাখন-মিছরী নিয়ে তাঁর পাশটিতে বসে বলি,—এগুলো খেয়ে নাও বাবা। মাখন-মিছরী তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তাই ঐসব বস্তু দিয়ে থালা সাজিয়ে দিলাম। সে আরও যা যা ভালোবাসতো সব দিয়ে তাঁর ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিলাম বাবা...কিন্তু...।

—তারপর...তারপর কি হল মা? অর্জুন ব্যাকুলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

—আমার পুত্র, তোমার সখা স্বর্ণ থালায় সাজানো মাখন-মিছরীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে শুরু করে। মাথা নামিয়ে মাখন-বিছরী ভর্তি স্বর্ণ থালাটিকে বারবার প্রণাম করতে থাকে।

—এ আপনি কি বলছেন মা কৃষ্ণের চোখে জল? অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—'হ্যাঁ বাবা তাঁকে সেদিন অঝোর ধারায় কাঁদতে দেখে আমি তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রাণাধিক পুত্র, অভাগিনী জননী কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছে তাই আমার হাতের পরিবেশন করা মাখন-মিছরী মিষ্টান্ন না খেয়ে তুমি ক্রন্দন করছো? জান অর্জুন, আমাকে সেদিন সে কি বলেছিল?'

—কি বলেছিল মা? অর্জুনের সতৃষ্ণ জিজ্ঞাসা।

—চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে আমায় দেখে মুখ তুলে বললো—''মা, তুমি যেন ব্যথা পেও না, বৃন্দাবন ত্যাগ করে যখন আমি মথুরায় আসি, তখন অক্রূরের রথে ওঠার আগে আমি মা যশোদাকে কথা দিয়েছিলাম, যখন আবার আমি বৃন্দাবনে ফিরে আসবো তখন তোমার হাতেই মাখন-মিছরী খাব। যদি তোমার কাছে কোন কারণে ফিরে না আসি তাহলে জেনে রেখ আমি আর কোনদিন মাখন-মিছরী খাব না। এখন তুমিই বল—একমা তুমি, অন্যমা যশোদা আমি দুই মায়েরই পুত্র। তুমিই বলে দাও কি আমার করণীয়। আমার এই ধর্মসংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় তুমিই বলে দাও মা।''

দেবকীর কথা শেষ হতেই অর্জুন শিশুসুলভ উৎসুকতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন—তারপর কি করল কৃষ্ণ?

—যা তাঁর করা উচিত ছিল সে তাই করেছে বাবা। তাঁর প্রতি আমার স্নেহ ভালোবাসা ছিল স্বার্থ গন্ধে ভরা। যশোদার স্নেহ প্রেম ছিল নিষ্কাম, স্বার্থগন্ধশূন্য ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা। নিঃস্বার্থ হৃদয়ের প্রেম সব সময়েই উঁচুতে বিরাজ করে—বলতে বলতে দেবকীর কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। অর্জুন, যদি কখনও কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার দেখা হয় তবে তাঁকে বলো—হতভাগিনী দেবকী তাঁর প্রতীক্ষায় আছে। যদিও জানি, সে আর কোনদিন এসে আমার হাতে মাখন-মিছরী খাবে না। তবুও তাকে দেখা হলে বলো সে যেন আসে। অভাগিনী জননী দেবকী তাঁর প্রতীক্ষায় আশাপথ চেয়ে বসে আছে—থাকবেও আমরণ।

সুলভার বেদনা

পাণ্ডবরা দুর্যোধনের চক্রান্তে বারনাবতের জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন—এই খবর পেয়ে কৃষ্ণ এলেন হস্তিনায়, খবরের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য। হস্তিনায় প্রবেশ করে ভাবছেন কার নিকটে গেলে সঠিক খবর পাবেন। মনে পড়ল বিদুর ও তাঁর পত্নী সুলভার কথা। নিজেই রথ নিয়ে উপনীত হলেন বিদুরের কুটিরের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে। বিদুর গৃহে নেই। তিনি আছেন রাজসভায়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান অমাত্যমণ্ডলীর তিনি অন্যতম একজন। গৃহে আছেন তৎপত্নী ধর্মপ্রাণা মহাসতী সুলভা। স্বামীর মুখে কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে এই মহীয়সী নারীর মন কখন যে কৃষ্ণ রঙে রাঙিয়ে গেছে তা তিনি নিজেই জানেন না। পাতায় ছাওয়া কুটিরের বাইরের বারান্দায় বসে তিনি একখানি ছিন্নবস্ত্র সেলাই করছেন। ছিপছিপে, গৌরাঙ্গী, মাথায় কুঞ্চিত শুভ্র-কালো কেশদাম বন্ধনহীন হয়ে পৃষ্ঠদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। রথ হতে নেমে কৃষ্ণ দ্রুতপদে প্রবেশ করেন—কুটিরের ভেতরে। পদধ্বনি শুনতে পেয়ে সুলভা মুখ তুলে চেয়ে দেখেন—বাড়ির অঙ্গনে আজ মহা অতিথি উপস্থিত। তিনি উঠে কৃষ্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসার জন্য একখানি কাঠের চৌকি এগিয়ে দেন। কৃষ্ণ চৌকিটি সুলভার বসার জায়গার পাশে স্থাপন করে তাতে উপবেশন করেন [অর্থাৎ যে জায়গায় চৌকি পেতে সুলভা কাপড় সেলাই করছিল]। অতঃপর সুলভার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেন—এবার বলো কাকীমণি, তোমার সব কুশল তো? সুলভার মনে হয় কৃষ্ণ যেন তার কতদিনের চেনা। যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণ যেন তাঁর আপন হতেও আপনজন। তাই সে সংকোচ পরিহার করে বলে—সকল কুশলের মূল যেখানে সেখানে কি অকুশল থাকতে পারে বাবা? এবার বল—তোমার সমাচার কি? পিতামাতা বন্ধু স্বজন সব কুশলে আছেন তো?

—কাকীমণি, তোমাদের আশীর্বাদে সব কুশল। শুধু একটা খবর সত্য না মিথ্যা তা জানবার জন্য মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে।

প্রশ্ন শুনে সুলভা কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখেন—তাঁর প্রসন্ন উজ্জ্বল আননের কোথাও যেন একটা বিষণ্নতার ছাপ রয়েছে, যা বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না। কৃষ্ণকমল আননে বিষণ্নতার অস্পষ্ট ছাপ দেখে তাঁর মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে। তিনি কৃষ্ণকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন,—পাণ্ডবরা মরেনি তাঁরা মরতে পারে না। তুমি দেখে নিও কৃষ্ণ, একদিন তাঁরা দুর্যোধনের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে অফুরন্ত শ্রীসম্পদ নিয়ে আবির্ভূত হবেই হবে। আমার মন বারবার বলছে তাঁরা বেঁচে আছে, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। যদি আমি আমার স্বামী ছাড়া জগতের অন্যসব পুরুষদের পিতা বা পুত্রের দৃষ্টিতে দেখে আসি, তাহলে আমার এ কথা সত্য হবেই হবে।"

—'তাই যেন হয় কাকীমণি, তোমার কথার যেন অন্যথা না হয়।'

—'কৃষ্ণ, তোমার কী মনে হয়? পাণ্ডবরা কি মারা গেছে?'

—'কাকীমণি, অনেক সময় প্রচলিত মিথ্যাকে সত্যের মতো স্বীকার করে নিলে নিজের ও স্বজনদের কল্যাণ হয়।'

—'তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝলাম না।'

—কাকীমণি, আমরা চাই যাদের ঐ সংবাদে আস্থা আছে, তাদের সেই আস্থা অটুট থাক। আমরাও ঐ প্রচলিত সংবাদকে সত্য স্বীকার করে যদি তদনুযায়ী আচরণ করি অর্থাৎ অন্যেরা যেন বোঝে তাদের মতো আমরাও এই সংবাদে বিশ্বাস রাখি। আমাদের আচরণে তারা যেন সন্দিগ্ধ না হয়। তাহলেই নিজের ও স্বজনদের কল্যাণ।

কৃষ্ণের বলার ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ অভিনয় কলার প্রকাশ দেখে সুলভা হেসে ওঠেন।

—'তুমি হাসছো কেন? কাকীমণি, আমি কি কিছু ভুল বললাম।' বিদুরপত্নী সুলভা হাসতে হাসতে বলেন—'কৃষ্ণ তুমি সত্যসত্যই নটখট (দুষ্টু)। এখানে আমার সামনেও তুমি অভিনয় শুরু করে দিলে?'

—তুমিও এই অভিনয় কলায় পটু হয়ে যাও। এতে তোমার ও তোমাদের প্রিয় পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে। সহসা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পুনরায় অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে ওঠেন—আচ্ছা, আমি না নয় নটখট মেনেই নিলাম কিন্তু কাকীমণি, তুমিও তো দেখছি আমার চেয়ে কম যাও না?'

—'কেন আমার অপরাধ? সুলভার সবিস্ময় জিজ্ঞাসা।'

—'অনেকক্ষণ ধরে নটখট নটখট বলে যাচ্ছ। একবারও কি জিজ্ঞাসা করেছ আমার ক্ষিধে পেয়েছে কি পায়নি? তুমি কেমন মা গো? ভুলেও তো একবার জিজ্ঞাসা করলে না আমি খেয়ে এসেছি কি না? সেই কোন সকালে হস্তিনায় এসেছি, এখনও মুখে একটা দানাও পড়েনি।' কোথায় কিছু খেতে দেবে, তা না দিয়ে কেবল নটখট নটখট বলেই যাচ্ছো।

—এবারকার মতো মাপ করে দাও লক্ষ্মী সোনা আমার। আমি এক্ষুনি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। সুলভা বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন খাবার আনার জন্য কিন্তু হায় বিধি বাম!

সহসা দ্বারকা থেকে রথ নিয়ে ক্রন্দন করতে করতে সেখানে উপনীতা হলেন সত্যভামা। উন্মুক্ত কেশে একাকিনী রথ চালিয়ে তিনি চলে এসেছেন হস্তিনায়। তাঁর পিতা সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণির লোভে শতধন্বা হত্যা করে পালিয়েছে। পিতার শব সুরক্ষিত রেখে তিনি চলে এসেছেন কৃষ্ণকে নিতে। এমন বিপদে কৃষ্ণ ছাড়া সে যাবেই বা কার কাছে? তাঁর কোন ভাই নাই, পিতাও নিহত। বিপদের সময় পত্নী পতির কাছে যাবে না তো কার কাছে যাবে? শ্রীকৃষ্ণ সুলভার উদ্দেশ্যে বলেন,—'আসি গো কাকীমণি, দ্বারকায় বড় বিপদ, তোমার বৌমণি নিতে এসেছে—আমি যাই।'

সুলভা ঘর থেকে একটি কাংস্যপাত্রে কয়েকটি চিঁড়ের নাড়ু ও একগ্লাস জল নিয়ে বাইরে এসে দেখেন অতিথি বিদায় চাইছে। অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে বুকটা তাঁর কান্নায় ভরে ওঠে। ক্ষুধার্ত অতিথি খাবার চেয়ে, না খেয়ে চলে যাচ্ছে—গৃহস্থের কি কল্যাণ হবে? খাবারের পাত্র নিয়ে তিনি কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—এতখানি পথ রথ চালিয়ে এসেছো—আবার এতখানি পথ রথ চালিয়ে যাবে—তোমরা দুজনে নাড়ু খেয়ে একটু জলপান করে নাও।

কাকীমণি, আজ আসি। খাওয়াটা জমা থাক। আর একদিন আসবো। সেদিন তুমি মনের আশা মিটিয়ে আমাকে ভোজন করিয়ে দিও। বলতে বলতে কৃষ্ণ রথে চড়ে বসেন। সত্যভামাও নিজের রথে আরোহন করেন। রথ চলতে শুরু করে দ্বারকার দিকে। তাঁদের চলার পথ পানে চেয়ে সুলভা কান্নায় ভেঙে পড়ে। হাত থেকে নাড়ুর থালা ও জলের গ্লাস পড়ে যায়। সুলভা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চিৎকার করে বলে,—'হে বিধাতা তুমি কেন এই অভাগিনী সন্তানহীনা নারীর প্রতি এত নিঠুর হলে! আমার কাছে খাবার চেয়ে কৃষ্ণ সারাটা পথ...ক্ষুধা বুকে নিয়ে ফিরে গেল। আমি এমন অপয়া রমণী যে তাঁর শ্রীমুখে একটু খাবার তুলে দিতে পারলাম না। হৃদয়ের এই ব্যথা আমি রাখি কোথায়? ওকি আর কখনও আসবে আমার বাড়ী? কখনও কি ওর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সুযোগ আমি আর পাব, কাঁদতে থাকে সুলভা। সন্তানহীনার বুকের দুগ্ধ আধার থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়ে বক্ষের বস্ত্রকে ভিজিয়ে দেয়। তা লক্ষ্য করে সুলভা চুপ হয়ে যায়। এই প্রথম তাঁর জীবনে মাতৃবাৎসল্য ধারার প্রকাশ। উঠে দাঁড়ায় সে। বস্ত্র সংবৃত করে—নাড়ুর পাত্র ও জলের গ্লাস মাটি থেকে তুলে নিয়ে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করল একবুক বেদনা নিয়ে।

যাজ্ঞসেনী প্রসঙ্গে

পাণ্ডবরা যখন ইন্দ্রপস্থে রাজধানী স্থাপন করে রাজ্য শাসন করতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনও কখনও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে বনভ্রমণে বের হতেন। এইভাবে কতিপয় দিন সেখানে অতিবাহিত করে তিনি দ্বারকায় ফিরে আসতেন। দ্বারকায় ফিরে এসে তিনি মহিষীদের নিকট ইন্দ্রপ্রস্থের গল্প করতেন। কথায় কথায় তিনি পঞ্চপাণ্ডবদের পত্নী-মহারানী দ্রৌপদীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। একদিন দ্বারকায় কৃষ্ণের অন্দরমহলে রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী এবং অন্যান্য মহিষীগণ তাঁদের প্রাণপতি কৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সত্যভামা অন্যান্য মহিষীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আমাদের প্রিয়তম ভগবান বাসুদেব দ্রৌপদীর উপর এত সদয় কেন? দুর্বাসার অভিশাপ থেকে, দুঃশাসনের হাত থেকে এককথায় যখন ওই রমণী বিপদে পড়েছেন তখনই আমাদের দ্বারকাধীশ তাঁকে সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হতে উদ্ধার করেছেন। ঐ রমণীর কী এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, তিনি বিপদে পতিত হলেই আমাদের প্রভু তাঁকে উদ্ধারের জন্য বারবার ছুটে যান?"

সত্যভামা যখন উপরোক্ত কথাগুলি অন্য মহিষীদের বলছিলেন তখন সেখানে অকস্মাৎ কৃষ্ণ উপনীত হন। কৃষ্ণকে উপস্থিত দেখে রুক্মিণী সত্যভামাদি সকল মহিষীই দ্রৌপদীর প্রতি প্রভুর অহৈতুকী করুণা প্রদর্শনের কারণ কী তা জানতে চাইলেন। প্রভু সেই মুহূর্তে তাঁদের কথার উত্তর না দিয়ে পরদিন প্রভাতে রথযানে সকল মহিষীদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মহিষীদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছালেন—তখন দ্রৌপদী স্নানান্তে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকঙ্কতিকার দ্বারা কেশবিন্যাস করছিলেন। কেশগুচ্ছের মধ্যে জট জমে থাকার জন্য স্বর্ণকঙ্কতিকার সঞ্চালন পথে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি কিছুতেই কেশগুচ্ছকে জটমুক্ত করতে সমর্থা হচ্ছেন না। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ থেকে তা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ, রুক্মিণী এবং সত্যভামাকে বললেন—"তোমরা উপরের অলিন্দে গিয়ে দ্রৌপদীর কেশবিন্যাসে একটু সাহায্য কর। কেশের জটগুলি ছাড়িয়ে দিয়ে ওর মাথায় সুন্দর করে কবরী বেঁধে দাও।" কৃষ্ণের কথায় মহিষীগণ দ্রৌপদীর কাছে উপনীতা হয়ে তাঁর কেশরাশি স্পর্শ করতেই বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। দ্রৌপদীর প্রতিটি কেশ মৃদু মৃদু স্বরে কৃষ্ণনাম জপ করছে। দ্রৌপদীর কেশরাশি থেকে নির্গত কৃষ্ণনামের ধ্বনি শুনে মহিষীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নীচে থেকে কৃষ্ণ বলেন,—"কি হলো থমকে দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব? ওর কেশগুচ্ছ সুন্দর করে বেঁধে দাও।"

মহিষীরা দ্রৌপদীর কেশের জট ছাড়িয়ে সুন্দর করে কবরী বেঁধে দিলেন এবং পরে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'প্রভু এবার আমরা বুঝেছি, কেন দ্রৌপদীর প্রতি তোমার অহৈতুকী করুণা। আমরা তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তা বুঝি না—কিন্তু তোমার প্রতি দ্রৌপদীর ভালোবাসা যে ত্রিভুবনে অতুলনীয় তাতে সন্দেহ নাই।' ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকায় ফেরার পথে তাঁদের সবার অন্তরের গভীরে বারবার অনুরণিত হয়—দ্রৌপদীর কেশরাশির কৃষ্ণ নাম ভজনের কথা। ভাবতে ভাবতে তাঁদের নয়নেও দেখা দেয় অশ্রু। দ্রৌপদীর কেশগুলি যেন তাদের কেশের সঙ্গে মিশে কানের কাছে বলছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সত্যাশ্রয়ী শ্রীকৃষ্ণ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত। মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসন অলংকৃত করেছেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই। বারবার ভাবছেন, আমার জন্যই অনর্থক এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। অসংখ্য নর সংহারের কারণ আমি। অনুশোচনায় ভরে ওঠে যুধিষ্ঠিরের হৃদয়। ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েও তাঁর চিত্তকে শান্ত করতে পারছেন না। অবশেষে মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন, "হে ধর্মরাজ, যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে, তাঁদের পুনর্জীবন ফিরিয়ে দেওয়া তো সম্ভব নয়। অসংখ্য প্রাণনাশে যদি তোমার মনে অপরাধবোধের উদয় হয়ে থাকে—তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। শাস্ত্রে যুদ্ধজনিত প্রাণনাশের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তোমার পূর্বপুরুষরা তাই করতেন—অতএব তুমিও কর? ব্যাসদেবের পরামর্শ যুধিষ্ঠিরের যথার্থ মনে হল। তথাপি তিনি বললেন—"হে ভগবন্, আপনার পরামর্শ নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এইসময় আমাদের কোষাগার শূন্য। বন থেকে ফেরার পর আমাদের তো কোন সম্পত্তিই ছিল না। দুর্যোধন আমাদের সব ধন সম্পদ কপট পাশাখেলায় আত্মসাৎ করেছিল। অনেক কষ্টে যে ধনসম্পদ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম—তা যুদ্ধেই ব্যয় হয়ে গেছে।'

ভগবান ব্যাসদেব বললেন, 'অর্থের জন্য চিন্তা কোর না। মহারাজ মারুত একদা হিমালয়ের নিকটবর্তী স্থানে এক বিশাল যজ্ঞ করেছিলেন। অনেক ত্যাগী-সাধুসন্ত সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দান করার জন্য রাজা মারুত অপার ধনরত্ন যজ্ঞস্থলে একত্র করেছিলেন। ধনরত্নের প্রাচুর্য এত ছিল যে, ব্রাহ্মণদের পক্ষে তা বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে সাধুসন্তরা ছিলেন সংসার ত্যাগী পুরুষ। তাই ঐ স্থলে এখনও ওইসব ধনরত্ন রাশীকৃত হয়ে পড়ে আছে। বর্তমানে তা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে—তুমি ঐ স্থলে গমন করে ধনরত্ন সমূহ সংগ্রহ করে নিয়ে এস।'

যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে ধনসংগ্রহের জন্য হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। যাওয়ার আগে রাজ্যশাসনের ভার ধৃতরাষ্ট্র ও অমাত্যদের হাতে সঁপে দিলেন। পাণ্ডবরা ব্যাসকথিত যজ্ঞস্থানে উপনীত হয়ে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা হস্তিনাপুরের দিকে আসতে থাকেন, ফলে রাজধানী পৌঁছাতে তাঁদের বিলম্ব হয়।

পাণ্ডবরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করছে এই সংবাদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দিলেন দেবর্ষি নারদ। সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি (কৃষ্ণ) হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রথে চড়ে পাড়ি দিলেন। পাণ্ডবরা রাজধানীতে পৌঁছানোর আগেই তিনি হস্তিনাপুরে পৌঁছে গেলেন। তাঁর আগমনবার্তা পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রসহ অমাত্যবর্গ নগরের বহির্দ্বারে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে নিয়ে সপরিবারে উপস্থিত হতেই সমগ্র হস্তিনা যে নবজীবন ফিরে পেল। অন্যদিকে পাণ্ডবরা ধনরত্ন নিয়ে ফিরে আসছে এ সংবাদও রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে সমগ্র নগরী আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল। দ্বারকার মহিষীদের দেখে কুন্তীদেবী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রসন্ন হলেন। বিরাটরাজের কন্যা অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা ছিলেন আসন্নপ্রসবা। তাঁর প্রসব বেদনা উঠতেই রাজপ্রাসাদ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই সেই মঙ্গলধ্বনি বিষাদে পরিণত হল। মহলের অভ্যন্তর থেকে বিষাদের সুর ভেসে আসে। তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করলেন। মুক্তকেশী কুন্তী কৃষ্ণকে আসতে দেখে চীৎকার করে বলেন—'হে কেশব, হে বাসুদেব তাড়াতাড়ি আগমন কর-বলতে বলতে তিনি কৃষ্ণের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন—তাঁর পিছু পিছু দ্রৌপদী, সুভদ্রাসহ কুরুকুলের সমস্ত মহিলাও দৌড়াতে দৌড়াতে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে এলেন। কুন্তীদেবী কৃষ্ণের কাছে এসে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলেন—"বাসুদেব আমাদের পরম আশ্রয়, আশাভরসার অবলম্বন তুমি। তুমি পাণ্ডবকুলের রক্ষক ও

পরিত্রাতা। তোমার আদরের ভাগ্নে অভিমন্যুর মৃত পুত্র প্রসব হয়েছে। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নবজাতকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তুমি তো বলেছিলে, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে কুরুবংশের প্রদীপকে রক্ষা করবে। সূতিকাগৃহে নবজাতকের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। তুমি সেখানে ওই প্রাণহীন দেহের উপর তোমার অমৃতদৃষ্টি প্রদান কর। ওই শিশু যদি না বাঁচে আমার পুত্র সহ আমি ও বধূরা কেউ বাঁচবো না। আমার পুত্ররা ওই শিশুর অবর্তমানে না বাঁচলে শ্বশুরকুলের পিণ্ডলোপ পাবে। তোমার ভাগ্নেও পূর্বেই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছে। অতএব হে কৃষ্ণ, তুমি আমার বংশের শেষ প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে দাও।'

শ্রীকৃষ্ণ নিরুত্তর। তাঁকে নিরুত্তর দেখে সুভদ্রা বললেন—'উত্তরাকে একদিন অভিমন্যু বলেছিল, কল্যাণী, তোমার আমার পুত্র মামার বাড়ী গিয়ে মামার ছেলে প্রদ্যুম্নর কাছে ধনুর্বিদ্যা ও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা গ্রহণ করবে। দাদা, তুমি তোমার পরলোকগত ভাগ্নের কথাকে সত্যে পরিণত কর। ইতিমধ্যে কুন্তীদেবী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে মাটি থেকে তুলে বসিয়ে বললেন—'পিসীমা, তুমি শান্ত হও।' সুভদ্রা বললেন—'দাদা আমার একমাত্র পুত্র অভিমন্যু যদিও যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে, তবু আমার সান্ত্বনা ছিল, যে সে তোমার সেবা করেছে, স্নেহ পেয়েছে কিন্তু তাঁর বালিকাপত্নী উত্তরার বেদনা সহ্য করা আমার পক্ষে দুঃসহ। অভিমন্যুর পুত্র তোমার চরণ দর্শন করতে পারবে না—এই অপযশ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তোমার সখারা এখনও ফিরে আসেনি। ফিরে এসে তাঁরা যদি শোনে তুমি উপস্থিত থাকতে —অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র তাঁদের বংশপ্রদীপের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে, তাহলে তাঁরা কি কষ্ট পাবে না? আমি তোমার পৌরুষকে জানি। জগতে এমন কিছু অসম্ভব নেই যা তুমি সম্ভব করতে পার না। আমার শ্বশ্রুমাতা, মহারানী পাঞ্চালী তোমার পদতলে পড়ে ক্রন্দনরতা। আমিও তোমার অনাথা ভগ্নী। কোনদিন তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করিনি। আজ হাত জোড় করে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, তুমি তোমার পুত্রহীনা ভগ্নীর পৌত্রের জীবন দান কর। যদি আমার পৌত্রের জীবন ফিরে না পাই তাহলে আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে প্রাণ বিসর্জন দেব।'' শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নী সুভদ্রাকে বললেন—'তুমি ও এত নিরাশ, ব্যাকুল হয়েছ। চল, আমাকে উত্তরার কাছে সূতিকা গৃহে নিয়ে চল। আমি ঐ মৃত শিশুকে দেখতে চাই। শ্রীকৃষ্ণের কথা কুন্তী-দ্রৌপদী সবার কানে যেন সুধা ঢেলে দিল। সবার সঙ্গে কৃষ্ণ উত্তরার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করলেন। উত্তরা বস্ত্র সংবৃত করে উঠে বসার চেষ্টা করতেই দ্রৌপদী তাঁকে নিবৃত্ত করে শুয়ে থাকতে বললেন। শোকসন্তপ্তা ব্যথিতা বালিকাবধূ শুয়ে শুয়ে হাত জোড় করে কৃষ্ণকে বললেন—'আপনি এসে গেছেন। এখন আমি আপনাকে দর্শন করতে করতে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করব। আপনার ভাগিনেয়, আমাকে ত্যাগ করে পূর্বেই চলে গেছে। তাঁর সন্তানও মৃত। বংশের দীপ স্তিমিত। এখন আমি বেঁচে থেকে কী করবো?''

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ''মা উত্তরা শোকে ভেঙ্গে পড় না। তুমি অভিমন্যুর পুত্রকে লালন পালন করার জন্য বেঁচে থাকবে।''

শ্রীকৃষ্ণ যদি এইকথা বলে সান্ত্বনা না দিতেন, তাহলে উত্তরা ওই মুহূর্তেই প্রাণত্যাগ করতেন। কাতরকণ্ঠে উত্তরা বললেন—''মনে ইচ্ছা ছিল পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম জানাব। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র সে ইচ্ছায় জল ঢেলে দিয়েছে। এখন অবশ্য আমি আপনার আদেশ পালন করব। কিন্তু তার আগে আপনি আমার পুত্রের জীবন দান করুন।'' বলতে বলতে উত্তরা অচৈতন্য হয়ে গেলেন। দ্রৌপদী ও অন্যান্য নারীরা তার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি মৃত শিশুর দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকেন—''বৎস, তুমি ধর্মজ্ঞ পিতার পুত্র। তোমার নিকটে সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তোমার পিতার এবং সমগ্র পাণ্ডবদের পূজনীয়। তুমি উঠে তাঁকে প্রণাম করছ না কেন? ওঠ! পুরুষোত্তমের চরণে মাথা রেখে প্রণাম নিবেদন কর।'

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ইশারায় দ্রৌপদীকে একটি পাত্রভরে জল আনতে বলেন। জল আনার পর তিনি আচমন করে মৃত শিশুর পাশে বসলেন। নবজাতকের মৃত শরীরে নিজের অভয় বরদ শ্রীকর স্থাপন করে বললেন —''যদি আমার, ধর্ম-ব্রাহ্মণ-সাধুসন্ত ভক্ত বিশেষ প্রিয় হয়। যদি আমি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের সমান

চোখে দেখে থাকি, যদি আমার মধ্যে শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে, হে অভিমন্যুর পুত্র তুমি জীবিত হও। যদি আমি কেশী নামক দৈত্য ও কংসকে ধর্মপূর্বক সংহার করে থাকি। আমার মনে যদি শত্রুর প্রতি স্নেহ সতত বিদ্যমান থাকে তাহলে এই মৃত শিশুপুত্র পুনর্জীবন লাভ করুক।"

কৃষ্ণর কথা সমাপ্ত হতেই মৃত শিশু ধীরে ধীরে নেত্র উন্মোচন করে অপলক দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। পুনর্জীবন প্রাপ্ত শিশুকে কোলে তুলে নেন কৃষ্ণ। মৃত শিশু প্রাণ ফিরে পেতেই সমবেত সকলেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন—"জয় ভগবান বাসুদেবের জয়।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের ডেকে আনার জন্য আদেশ দিলেন। পিতা অভিমন্যু পরলোকবাসী। পিতামহ অর্জুনও নগরে অনুপস্থিত, অতএব তিনিই পুত্রের জাত কর্মসংস্কার সম্পন্ন করলেন। উত্তরা কৃষ্ণের কাছ হতে পুত্রকে কোলে নিলেন। পুত্রকে অঙ্গে রেখে উত্তরা কৃষ্ণচরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুমূল্যবান ধনরত্ন জাতকের উদ্দেশ্যে দান করলেন। অনন্তর সকলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—'এই নবজাতক অভিমন্যুতনয় কুরুকুল পরিক্ষীন হয়ে যাওয়ার পর জন্ম লাভ করেছে-তাই এর নাম পরীক্ষিত। সুভদ্রা বললেন—দাদা, এর নামকরণ তুমি ঠিকই করেছ। কিন্তু নামের কারণ ব্যাখ্যা করে বলবে—পৌত্রের পিতামহী সুভদ্রা, আমার দাদা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এই পরিক্ষীন জীবন কুরুবংশের প্রদীপকে পুনরায় রক্ষণ করেছে—অতএব এর নাম পরীক্ষিতই যথার্থ হয়েছে। উত্তরা আনন্দে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তাই মনে মনে উচ্চারণ করে পিতার অবর্তমানে পুত্রের নাম রাখার অধিকার আমার। কিন্তু গর্ভে থাকার সময় এই পরমপুরুষ যদি পুত্রকে পরিরক্ষণ না করতেন তাহলে শিশু থাকতো কোথায়? অতএব পরীক্ষিত নাম রাখাই উচিত কর্ম হয়েছে।

ইতিমধ্যে পাণ্ডবরা ফিরে এলেন। একশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন শিশুর নামকরণ সংস্কার উৎসবের সময় উপনীত হয়, তখন যে কেউ শিশুর সামনে উপস্থিত হয় তাঁর দিকে চেয়ে শিশু যেন পরীক্ষা করে সে পূর্ব পরিচিত কি না, যাঁকে সে গর্ভে থাকার সময় রক্ষাকর্তার বেশে দেখেছে। অতএব শিশুর নাম পরীক্ষিত রাখাই যথার্থ হয়েছে। আসলে শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া নাম বদলায় এমন সাধ্য কার?

ননীচুরির সূচনা

কানাই বলাই বড় হয়েছে। তাঁরা এখন আর সবসময় বাড়ীতে থাকতে চায় না। সখাদের সঙ্গে ব্রজের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে খেলা করে বেড়ায়। প্রভাত হলেই মা যশোমতি দুই ভাইকে স্নান করিয়ে বস্ত্র-অলংকারে সুসজ্জিত করে দেন। তারপর মাখন-মিছরী রুটি খাইয়ে দিয়ে সখাদের সঙ্গে খেলতে পাঠান। সখাদের মধ্যে মধুমঙ্গল, বসন্ত, অর্জুন, সুদামা, সুবল, তোককৃষ্ণ, মনসুখা, বরুথপ, ঋষভ, ভদ্রাদি প্রভাত হতেই কানুকে খেলার জন্য ডাকতে আসে। অন্যান্য দিনের মতো একদিন সখারা যশোমতির অঙ্গনে এসে সমবেত হয়েছে কানাই-বলাই-এর সঙ্গে খেলার জন্য। মা যশোমতি তখন কানাই-বলাই দুইভাইকে কোলে বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। খাওয়া শেষ হলে কানাই-বলাই সখাদের সঙ্গে নিজেদের বাড়ীর অঙ্গনে খেলতে শুরু করে। মনসুখা নামে সেদিন এক নতুন কিশোর কানাইদের বাড়ী খেলতে এসেছে। সহসা তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই কানু জিজ্ঞাসা করল,—'তোমার নাম কি ভাই?' নবাগত কিশোর উত্তর দেয়, 'আমার নাম মনসুখা।'

তোমার শরীর যা দুর্বল রোগা, তাতে তোমার মনের সুখ তো দূরের কথা, শরীরেও সুখ থাকবে না দেখছি। তোমার বাড়ী কোথায় ভাই? কৃষ্ণ নবাগতকে জিজ্ঞাসা করে।

সে উত্তর দেয়—'আমার বাড়ী ব্রজের প্রান্তসীমার ঘোষপল্লীতে।'

—'দেখ ভাই, কিছু মনে কোরো না, তোমার মতো রোগা-দুর্বল ছেলেকে খেলার সাথী করা আমার পছন্দ নয়। যদি তুমি আমার খেলার সাথী হতে চাও, তাহলে একটু ভালো করে খাওয়া-দাওয়া কর। স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হও। আমাকে এবং আমার সখাদের দিকে চেয়ে দেখ—আমরা কেমন সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী।''

কৃষ্ণের কথা শুনে মনসুখা বলে—'তোমরা তো স্বাস্থ্যবান হবেই, কেননা তোমাদের ঘরে প্রচুর গাভী আছে, তোমরা পেট ভরে দুধ-মাখন খেতে পাও। আমার বাবার ঘরে মাত্র দু' তিনটি গাভী আছে। তার মধ্যে একটি দুধ দেয়, সেই দুধ বেচে কোনরকমে আমাদের সংসার চলে। অতএব তোমাদের মতো আমি বলবান স্বাস্থ্যের অধিকারী কেমন করে হব ভাই।''

—'কেন তোমাদের আশপাশের প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গাভী নেই? নিশ্চয়ই আছে, যদি থাকে তবে সেখানে চেয়ে খাও না কেন? মনসুখাকে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ।

—'রোজ রোজ চাইলে কেউ কি দেয়? দু-একদিন না হয় দিতে পারে।

—'ও তাও তো বটে, এটা তো ভেবে দেখিনি, শোন মনসুখা, যদি তুমি আমাদের খেলার মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে বলবান ও স্বাস্থ্যবান হতেই হবে। তাই আমি তোমাকে একা পরামর্শ দিচ্ছি শোন—

মনসুখা কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে বলে—'বল কি তোমার পরামর্শ'?

কানু মনসুখার দিকে চেয়ে ধীর গম্ভীর সুরে বলে—'এখন থেকে তুমি সবার বাড়ী থেকে চুরি করে মাখন-দুধ-দই খাবে।'

—'বাঃ ভাই বাঃ, সুন্দর তোমার পরামর্শ। চুরি করতে গিয়ে যখন ধরা পড়বো তখন আমার হয়ে পিঠ পেতে প্রহার খাবে কে? তুমি তো জানো না ভাই ব্রজের গোপীদের গায়ে কি অসীম শক্তি। বাব্বা। যা মোটামোটা লাঠি দিয়ে তাঁরা দুধ মন্থন করে! ধরা পড়লে সেই লাঠি দিয়ে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে। কাজ নেই ভাই তোমার খেলার সঙ্গী হয়ে—আমি ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাচ্ছি।''

মনসুখা প্রস্থানোদ্যত হতেই মধুমঙ্গল তাঁর হাতখানি চেপে ধরে বলে—'চলে যাচ্ছ যে, তুমি বোধ হয় জান না, আমাদের কানুর খেলার দলে যে একবার সদস্য হওয়ার জন্য আসে তাকে কানু সদস্য না করে ছাড়ে

না।' মনসুখা বলে—'তোমাদের কানুর দলের সদস্য হতে হলে তো জীবন বাজী রাখতে হবে। ও আমি পারব না।'

—'ঐ কথা বললে তো চলবে না ভাই! কি রে কানু, তুই চুপ করে আছিস কেন? কিছু একটা বল?' মধুমঙ্গল কৃষ্ণকে কটাক্ষ করে।

কৃষ্ণ বলে—'ভাই মধুমঙ্গল, কি বলি ভেবে পাচ্ছি না।'

—'শোন কানু, তোর যদি মনসুখাকে খেলার সঙ্গী করার ইচ্ছা হয়, তাহলে তুই এক কাজ কর।

—কী কাজ? কী কাজ? কানু জিজ্ঞাসা করে মধুমঙ্গলকে।

—'তুইতো আমাদের সবাইকে ভালোবাসিস।'

—'হ্যাঁ বাসি।'

—'তাহলে মনসুখাকেও ভালোবেসে আমাদের খেলার দলের সদস্য করে নে।'

—'কিন্তু ওযে বড্ড রোগা-দুর্বল।'

—'রোগা বলে এতই যখন তোর অপছন্দ তখন এক কাজ কর না, তুই সবার বাড়ি থেকে দুধ-দই-মাখন চুরি করে ওকে খাওয়া, তাহলে তোর আর ও রোগা দুর্বল থাকবে না।'

—'কেন? ওর জন্য আমি লোকেদের বাড়ি থেকে দুধ-দই-মাখন চুরি করবো কেন?' মধুমঙ্গল, তোর এ কেমন বিচার।'

—'হ্যাঁ এই আমার বিচার। ওর জন্য তোকেই চুরি করতে হবে। আমার মনে হয় সকল সখারও সেই অভিমত।

—কানু সখাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন—'মধুমঙ্গল যা বলল তাই কি তোদের সবার অভিমত? আমি মনসুখার জন্য ব্রজের ঘরে ঘরে ননী-মাখন চুরি করবো, এতে তোদের সমর্থন আছে কিনা একসঙ্গে আমাকে মুখফুটে বল।'

সবাই সমস্বরে বলে—'আছে-আছে—আমরা সবাই চাই, তুই ব্রজের ঘরে ঢুকে দুধ-দই-মাখন চুরি কর এবং আমাদের তা খাইয়ে আনন্দ দান কর।'

—'বেশ তবে তাই হোক। ব্রজবাসী যে মাখন-ছানা-কংসকে কররূপে পাঠায়—আজ থেকে তা পাঠানো বন্ধ। গ্রামের দুধ-দই-মাখন গ্রামের লোকের অগ্রাধিকার। মনসুখা, তুই দুঃখ করিস না। আমি তোকে ও অন্যান্য সখাদের রোজ চুরি করে দুধ-দই-ছানা-মাখন খাওয়াব। তোদের সবাইকে বলবান-শক্ত সমর্থ করে গড়ে তুলবো। কংস কররূপে দুধ-দই-ছানা-মাখন গ্রহণ করে—দুষ্টদের খাওয়ায়। তারা ব্রজবাসীদের উপর অত্যাচার করে, আমাদেরই পাঠানো দুধ-ছানা-মাখন খেয়ে। এখন থেকে আর তা হতে দেব না। গ্রামের জিনিস গ্রামের লোকেই খাবে।'

নতুন মিত্র মনসুখা বলল—''আমার জন্য রোজ রোজ মাখন চুরি করতে গিয়ে যদি তুমি ধরা পড়ো তাহলে তোমার মা নিশ্চয়ই তা জানতে পারবে এবং তোমাকে আচ্ছা করে পিটবে, তখন কী হবে?''

—'ধরা পড়লে তো পিটবে।'

—'কেন? তুমি কি যাদু জান, যে ধরা পড়বে না।'

—'ভাই মনসুখা, আমার গুরু আমায় এক মন্ত্র শিখিয়েছে—ঐ মন্ত্র জপ করে চুরি করতে গেলে কেউই আমাকে দেখতে পাবে না। যদি ধরাও পড়ি তাহলে ঐ মন্ত্রের বলে আমি ঠিক ছাড়া পেয়ে যাব।'

মনসুখা বলে—'ভাই কানু, কি সেই মন্ত্র?'

কানু—'চুরি করার সময় কফল্লম্ কফল্লম্ মন্ত্র জপ করতে হয়। কফল নামে এক ঋষি এই মন্ত্র প্রথম প্রচার করে। গুরু পরম্পরায় এই মন্ত্র আমি পেয়েছি। অতএব দেরী না করে আজ থেকেই শুরু হয়ে যাক—মাখন-ননীচুরির প্রথম পর্ব।'

মিত্রবর্গ বলল,—কানু, মাখন ননী চুরির আগে আমাদের একটা উদ্বোধন পর্ব হয়ে যাক।'

'কি পর্ব?'—কানু জিজ্ঞাসা করল।
মিত্রবর্গ বলল,—'নৃত্যপর্ব।'
'উত্তম প্রস্তাব, হয়ে যাক।' সখারা মনসুখাকে বলে—'কৃষ্ণকে ঘুঙুর পরিয়ে দাও।' মনসুখা কৃষ্ণের পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দেয়। কৃষ্ণসহ সখাগণ নৃত্য শুরু করে। নৃত্য শেষ হলে কৃষ্ণ বলে—'এবার ঘুঙুর খুলে দে, ননী-মাখন চুরি শুরু হবে।' ঘুঙুর পরে মাখনচুরি করতে গেলে সব গড়বড় হয়ে যাবে। ধরা পড়ে যাব।'
মনসুখা কৃষ্ণের পায়ের ঘুঙুর খুলতে যায়। ঘুঙুর কেঁদে ওঠে। নতুন সখা মনসুখাকে বলে—''একবার যখন তোমাদের কৃপায় কানুর 'চরণে ঠাঁই পেয়েছি, তখন এই পদ থেকে খুলে আমায় সরিয়ে দিও না।'' তা শুনে মনসুখা কৃষ্ণকে বলে—'বন্ধু! তোমার পায়ে যে একবার আশ্রয় পায় তাকে তুমি সরিয়ে দিতে চাইছ কেন? তোমার অন্যসখাদের মুখে শুনেছি যে একবার তোমার চরণে ঠাঁই পায় তাকে আর প্রত্যাবর্তন করতে হয় না। চরণ থেকে ঘুঙুরকে কেন সরাতে চাইছ?
কৃষ্ণ—'না সরিয়ে রাখলে যে আমি ধরা পড়ে যাব? মায়ের কাছে প্রহার খাব।''
মনসুখা বলল,—ধরা পড়ে প্রহার খাও খাবে ক্ষতি নেই। তোমার মা যত প্রহার করে করুক। তুমি পিঠ পেতে নিও। কিন্তু যে তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে তাকে চরণ ছাড়া কোর না কিছুতেই।'
কৃষ্ণ বলল,—'বেশ, তবে তাই হোক।'

যদি ব্রজে যাও, অভিমান শূন্য হও

গন্ধর্ব শিল্পী তুম্বুরু সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছেন বৃন্দাবনের গোচারণের মাঠে। সুরলোকের সংগীতগুরু ও দেবর্ষি নারদের সহচর তিনি। শিব-পার্বতীর কৃপাধন্য। স্বয়ং মহাদেব তাঁর সংগীতগুরু। পরমপুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, অপ্সরারা সব ব্রজভূমে উপনীত হয়ে স্তব, সংগীত, নৃত্য বাদ্যদ্বারা ব্রজরাজ কুমারের সেবায় নিজেদের সঁপে দিয়েছেন। তুম্বুরু দেবলোকে সংগীত শিক্ষার কার্যে ব্যস্ত থাকেন। কোথাও যেতে বড় একটা সময় পান না কিন্তু যখন দেবর্ষি নারদের কাছে শুনলেন—'আনন্দময় পরমপুরুষ ব্রজভূমে গোপবালকবেশে আবির্ভূত হয়ে পরমানন্দে বনে বনে গোবৎস চারণ করতে করতে বিচরণ করছেন'—তখন তিনিও আর না এসে থাকতে পারলেন না। গন্ধর্ব দেহ নিয়ে ভৌম বৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না—তাই তিনি মানবরূপ ধারণ করে সবার অগোচরে বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। উদ্দেশ্য ব্রজরাজকুমার নন্দনন্দনকেও তাঁর সখাগণকে একটু সংগীত কিংবা সুর-বাদ্য শিক্ষা প্রদান করবেন। নন্দনন্দন ও তাঁর সখাদের শিক্ষাদানের ছলে তিনি একটু সেবা করবেন—এই মনোগত অভিলাষ। বৃন্দাবনের যে স্থলে নন্দনন্দন সখাগণসহ গোবৎস চারণ করেন, তিনি সেই স্থলে উপনীত হয়ে তরুলতার অন্তরালে আত্মগোপন করে দেখতে থাকেন—ব্রজরাজকুমার ও তাঁর সখাগনের দিব্যমধুর গোবৎসচারণলীলা। সখারা উক্তস্থলে গোবৎসের দল নিয়ে উপস্থিত হল। সবার কাঁধে উত্তরীয়। মাথায় রঙ-বেরঙের পাখীর পালক, হাতে রত্নখচিত বৎস চারণের যষ্টি। সবার হাতে শৃঙ্গ শোভা পাচ্ছে। শুধু ব্রজরাজকুমারের কটিবস্ত্রে ছোট্ট একটা বাঁশের মুরলী গোঁজা রয়েছে। তাঁদের শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য-সুষমার ছটায় সারাবন আলোকিত। গন্ধর্ব শিল্পী অন্তরাল থেকে নয়নপথে ব্রজরাজকুমার সহ সখাগণের সৌন্দর্য্য সুধা পান করছেন। মনে মনে ভাবছেন—"এরা এত সুন্দর। সুরলোকে, গন্ধর্বলোকে, এমনকি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অনন্তলোকে এই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ স্বপ্নেও দর্শন করা যাবে না।" সখাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন বৃক্ষ থেকে পত্র চয়ন করে পত্রকে ভাঁজ করে পিঁ পিঁ আওয়াজ এমন বাদ্য তৈরী করল। সেই পত্র উদ্ভূত বাদ্যধ্বনি গন্ধর্ব শিল্পীর কর্ণে বেসুরো লাগছে। তিনি ভাবেন—"এই সুযোগে প্রকট হয়ে গোপকুমারদের সংগীত কলার শিক্ষা প্রদান করি। এই সুযোগে যদি ওদের সবাইকে সুরবাদ্য ইত্যাদি শিক্ষাপ্রদান করি—তাহলে আমার গন্ধর্ব্য জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যদি সে রকম সুযোগ উপস্থিত হয় তাহলে আমি আমার সমস্ত সংগীতকলা বিদ্যা ব্রজরাজকুমার ও তাঁর সখাদের প্রাণ উজাড় করে শিখিয়ে দেব। কিন্তু এরা যে সব ক্রীড়া চঞ্চল। ক্রীড়ার মধ্যে মধ্যে একবার শৃঙ্গ বাজাচ্ছে—উচ্চ নিনাদে, আবার পরক্ষণেই পাতার তৈরি বাঁশী বাজাচ্ছে পিঁ পিঁ করে। এদের ক্রীড়ার কোন ক্রমও নেই। হবেই বা কি করে—সব গোপকুমার ছাড়া তো অন্য কিছু নয়। তুম্বুরু ভুলে গেলেন তিনি কোথায় বসে ভাবছেন—এইসব ভাবনা। আত্মতন্ময় হয়ে তিনি দেখছেন—আকাশপথে পাখী উড়ছে, নীচে পড়েছে সেই পাখীর ছায়া। এক সখা সেই বনভূমে পতিত পাখীর ছায়ায় ছায়ায় পা রেখে দৌড়াচ্ছে। কেউ ময়ূরের সাথে তাল দিয়ে নৃত্য করছে। কেউ মণ্ডুকের (ব্যাঙ) মতো বসে বসে লাফাচ্ছে, কেউ বন্য হরিণ বা খরগোশের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে। কেউ কেউ বানরদের সঙ্গে গাছের ডালে উঠে এডাল-ওডাল করছে। কেউ বা বানরের লেজ ধরে ঝুলছে। বানর ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ বিকৃত করলে তারাও প্রত্যুত্তরে মুখ বিকৃত করছে। কোন কোন সখা পাখীর ডাক অনুকরণ করে পাখীর মতো ডাকতে শুরু করে। কেউ জোরে জোরে চীৎকার করছে প্রতিধ্বনি ফিরে এলে তা শুনে সবাই খিল খিল করে হাসছে। একে অপরের হস্তধৃত শৃঙ্গবেত ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়—কখনও বা তা হাতে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে বেড়ায়। যাঁদের হস্ত হতে বেত-শৃঙ্গ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাঁরা ছিনতাইকারী সখাদের পিছু পিছু দৌড়ায়।

খেলা চলতে থাকে। অন্তরালে থেকে দেখতে থাকেন তুম্বুরী। ইতি মধ্যে যশোদা সেবিকা পাঠিয়ে কানাই-বলরামকে গৃহে ডেকে পাঠান, খাবার খেয়ে যাওয়ার জন্য। ক্রীড়ামত্ত কানাই-বলাই সহ সখাগণ সেবিকার কথা কানেই তোলে না। ফলে যশোদা খাবার মাঠেই প্রেরণ করতে বাধ্য হন। সেখানে কানাই-বলাইকে মধ্যমণি করে গোপকুমাররা গোল হয়ে বসে খাবার খেতে শুরু করে। একে অন্যের মুখে খাদ্যবস্তু তুলে দেয়। পশু-পাখী-বৎসদেরও খাবার খাইয়ে দেয়। নন্দনন্দন যা করে যা বলে, তা সবার প্রিয় লাগে। তাঁদের ক্রীড়া কৌতুক দেখে তুম্বুরু মোহিত হয়ে যান। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি তাঁদের বিনোদ-পরিহাস উপভোগ করতে করতে ভাবেন—''আমি তো এদের ক্রীড়া-বিনোদ দর্শনের জন্য বনভূমে উপনীত হইনি। আমি এসেছি এদের সুরবাদ্যকলা শিক্ষা দিতে। খেলায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে সে সুযোগ কি আমি পাব?'' খাওয়া শেষ করে ঐ তো ওরা সব পাতার বাঁশী বাজাচ্ছে। এই সময় ওদের সামনে প্রকাশ হয়ে বলব যে, তোমাদের বাঁশী ঠিকমত তাল লয়ে বাজছে না, আমার কাছে শিখে নাও। তুম্বুরু যখন ভাবছেন আত্মপ্রকাশ করবেন কি করবেন না, তখন শ্যামসুন্দর সহসা কটিবস্ত্রে গোঁজা বাঁশীটি হাতে নিয়ে সুবলের কাছে এসে বললেন—'সুবল তুই বাঁশী বাজাবি?''

সুবল—'বাজাব, যদি তুই শিখিয়ে দিস।' সুবল শ্যামসুন্দরের কাছে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। শ্যামসুন্দর সুবলের হাতে বাঁশীটি তুলে দিয়ে তাঁর পাশে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—নিচের ছিদ্রে আঙুল স্থাপন কর, তারপর উপরের ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে ফুৎকার দে? কোমল দুই বাহুলতায় সুবলকে ঘিরে শ্যাম শিক্ষা দিতে থাকে। তাঁর সহজ সরল শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখে তুম্বুরু অবাক হয়ে যান। সম্পূর্ণ বাঁশীটি কিভাবে শ্রীকরে রেখে ফুঁ দিতে হয় তা তুম্বুরু যেন নিজেই শিক্ষা নেন—শ্যামসুন্দরের কাছে। শিক্ষাদানের এই অভিনব পদ্ধতি—তিনি সুরগুরু হলেও তাঁর জানা নেই। হঠাৎ ভদ্র এসে সুবলের বাঁশীটি কেড়ে নিয়ে বলে—''সুবল শৃঙ্গ বাজাবে, বাঁশী তুই বাজা কানু।'' ভদ্রের এই বাধাদান তুম্বুরুর ভালো লাগে না। বংশীবাদনের শিক্ষাগ্রহণ তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। ''চুরি করে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা বোধ হয় কলাদেবী ভারতীর অভিপ্রেত নয়—তাই ভদ্রের এই বাধাদান'—তুম্বুরু অন্তরালে অব্যক্ত থেকে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেন উপরোক্ত কথাগুলি। সুবলের হাত থেকে বাঁশী ছিনিয়ে নিয়ে ভদ্র তখন দাঁড়িয়ে আছে কানাইয়ের সামনে। কানাই ভদ্রকে লক্ষ্য করে বলেন,—''তবে তুই বাঁশী বাজা, আয় কাছে আয়, আমি তোকে শিখিয়ে দিই।''

—'আমার মেয়েদের মতো পিঁ পিঁ করে বাঁশী বাজানো ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে শৃঙ্গ নয়তো শঙ্খ বাজাতে।' ভদ্র উত্তর দেয় কানাইকে।

—'বেশ শঙ্খ না হয় সন্ধ্যাবেলায় যখন ঘরে ফিরবি তখন বাজাবি, এখন বাঁশী তো বাজা।' ভদ্রকে কাছে ডেকে কৃষ্ণ বাঁশী বাজানো শেখাতে শুরু করল। ভদ্র বার কয়েকের চেষ্টায় ব্যর্থ—বিরক্ত হয়ে বলল,—'এই ছোট্ট বাঁশীতে কী স্বর বেরোয়?' তুম্বুরু ভাবেন,—'এইবার কি আত্মপ্রকাশ করবো?' ওদিকে ভদ্র তখন বলল,—''তুই বাঁশী বাজা কানু, ও তোর হাতেই মানায়। ঐ তমাল বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে তুই বাঁশীতে সুর তোল, আমরা শুনি।'' অন্তরাল থেকে অস্ফুট স্বরে তুম্বুরে বলেন,—'উত্তম প্রস্তাব, আগে সুর শুনি পরে না হয় ওদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে শিক্ষাদান করবো। আগে না শুনে, না বুঝে ওদের শিক্ষা দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক নয়।' ভদ্রের কথামত কানাই হাতে বাঁশী নিয়ে তমাল তরুমূলে দাঁড়াল। সখারা সব দৌড়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। ললিত ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে নন্দনন্দন বাঁশীতে অধর স্পর্শ করে সুর সংযোজন করল। কৃষ্ণের কুঞ্চিত কেশদামে ময়ূর পাখা, নবকিশলয়ের গুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা হার, আভূমি লম্বিত মনোহর বনমালা, কপালে কস্তুরী তিলক, করে কঙ্কন, বাহুতে রত্নবলয়, পদকমলে স্বর্ণনূপুর, বক্ষদেশে কৌস্তুভমনিসহ মুক্তা ও শ্বেত স্ফটিক মালা দৃপ্ত মহিমায় শোভা পাচ্ছে। স্কন্ধদেশে পীত উত্তরীয় হাওয়ার তালে তালে নৃত্য করছে। বংশীর ছিদ্রের উপর স্থাপিত রক্তাভ নীল অঙ্গুলির পংক্তি বিন্যাস, নখচন্দ্রিমার গোলাপী কিরণ ছটায় স্নাত পরিধানের মহিমা প্রকাশে উদ্যত। পদনখের কিরণছটায় দৃষ্টি পড়তেই তুম্বুরু ভুলে যান নিজেকে। বাঁশীর সুর কানে প্রবেশ করতেই নিজেকে ফিরে পান তিনি। সুর শুনে তাঁর মনে হল, তিনি যেন রূপসাগরের তলদেশ

থেকে উঠে এলেন। বাঁশীর স্বর যে এত সুধাবর্ষণ করতে পারে তা তুম্বুরুর পূর্বে জানা ছিল না। বাঁশীর অমৃতবর্ষী সুরে যে এত মাদকতা, এত যাদু যা জগৎ সংসার—দেহ-গেহ সব ভুলিয়ে দেয়—তুম্বুরু যেন এই প্রথম অনুভব করলেন। কিন্তু অনুভবকে ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি অক্ষম। অবাক চোখে তিনি দেখেন বনভূমের আশপাশের শৈলশ্রেণী হতে শৈলখণ্ড তরলিত হয়ে স্রোতধারায় বয়ে চলেছে। সৃষ্টির অনুতে অনুতে সুর সুধার সিঞ্চন। গোবৎস, মৃগ, বানর, সিংহ সব জড়বৎ স্থির! তরুশাখায় অর্দ্ধনেত্রে স্থির হয়ে বসে আছে বিহঙ্গকুল। গাছের একডাল থেকে অন্যডালে লাফ দেবে বলে যে বানর হাত উপরে তুলে লাফ দেওয়ার ভঙ্গী করে উদ্যত হচ্ছিল—সে সেই মুদ্রায় স্থির হয়ে যায়। পাখী পাখা বিস্তার করতে ভুলে যায়। যে পাখা মেলে উড়ছিল নীলাকাশে সে পাখী পাখা গুটাতে ভুলে ঐ গগনেই স্থির হয়ে যায়। হরিণ মুখে তৃণ নিয়ে স্তব্ধবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। গাভীর স্তনে মুখ লাগিয়ে নিশ্চল হয়ে স্থানুর দাঁড়িয়ে পড়ে বৎসগুলি—তাদের চোয়ালবেয়ে দুধ মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। সারিবদ্ধ পিপীলিকার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তরুমূলে শাখায় পত্রে--পুষ্পে রসস্রাব শুরু হয়। যমুনা উজান পথে তমাল তরুমূলে এসে ঢেউ নিয়ে আছড়ে পড়ে। ঢেউ-এর ধারায় রাশি রাশি পদ্মফুল কৃষ্ণচরণে এসে লুটিয়ে পড়ে। প্রকৃতি নীরব। ভ্রমর মৌমাছির গুঞ্জন বন্ধ হয়ে যায়। সব শান্ত, সমাধিস্থ। "কিন্তু অভাগা তুম্বুরু তুমি বঞ্চিত কেন?"—নিজের মনকে প্রশ্ন করেন সুর গন্ধর্ব সংগীত গুরু তুম্বুরু। ঐ সুর লহরীর অমৃতস্পর্শে কেন তার পাষাণ হৃদয়-গন্ধর্বদেহ যা মানবরূপে বৃন্দারন্যে গোপনে প্রবেশ করে এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা কেন গলিত হয়ে রসময় স্রাবে পরিণত হল না? তবে কি আমার হৃদয়-দেহ সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন বস্তু? ধিক-শতধিক আমাকে। ইচ্ছা হয় এই বনভূমে পাষাণে মাথা ঠুকে প্রাণ বিসর্জন করি কিন্তু আমি যে গন্ধর্ব। দেবতাদের মতো গন্ধর্বরাও যে অমর। "তাছাড়া এমন কঠিন পাথর কি ব্রজভূমিতে আছে—যেখানে আমি মাথা ঠুকে প্রাণ বিসর্জন দেব?" নিজের দেহ-মন-হৃদয়কে পাষাণ অপেক্ষা কঠিন মনে হচ্ছে তাঁর। ব্রজভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে পাষাণ অপেক্ষা কঠিন ভাবা তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সবার অগোচরে ত্বড়িৎগতিতে বনভূমি ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকের দিকে পাড়ি দিলেন। যাওয়ার পথে স্বর্গলোকের দিকে চেয়ে দেখলেন—দেবতারা নন্দন কাননের পারিজাত বৃক্ষতলে পুষ্পাঞ্জলি বদ্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয় ব্রজরাজ কুমারের বাঁশীর ধ্বনি সেখানেও প্রবেশ করেছে। নৃত্যরতা, অপ্সরীরা, বাদ্যরত কিন্নর গোষ্ঠী, গীতরত গন্ধর্বরা মূর্তিবৎ স্থির হয়ে দেবলোকে বিরাজ করছেন। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোকের অধিবাসীদের অবস্থাও তদ্রুপ। যমলোকে, শিবলোকের অবস্থাও বৃন্দাবনের মতনই দেখলেন তুম্বুরু। সমস্ত লোক পরিভ্রমণ করতে করতে একসময় তুম্বুরু ব্রহ্মলোকে উপনীত হলেন।

তুম্বুরুকে দেখে ব্রহ্মাজী পদ্মাসন থেকে উত্থিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ব্রহ্মলোকের এক মুহূর্ত সমান ধরা ভূমির অনেকগুলি বছর। বংশীর স্বর এই মুহূর্তে বৃন্দাবনে থেমে গেছে। তাই ব্রহ্মাজী এখন কিছুটা প্রকৃতিস্থ। তিনি তুম্বুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি তো সংগীতের পরমাচার্য্য। বলতে পারো কিছুক্ষণ পূর্বে বংশীতে যে ধ্বনি শুনলাম তা কোন রাগের অন্তর্ভূক্ত? আমার সমগ্র সৃষ্টিকে যা পলে পলে পরিবর্তন করে দেয় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সেই রাগের কৌশল কি তোমার জানা আছে? আমি তো চারমাথার বুদ্ধি নিয়ে ঐ রাগের তত্ব কৌশল আজও ধারণা করতে সক্ষম হলাম না, বৃদ্ধ হয়েছি তো, মনে হয় স্মৃতি ঠিক কাজ করছে না।" এমন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ—সেখানে উপস্থিত হলেন। নারদকে দেখে তুম্বুরু তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন—"আমি কি পাষাণের চেয়েও কঠিন?" ব্রজভূমে উপনীত হয়ে পরমেশ্বরের বংশীধ্বনি শুনেও আমার দেহমন বিগলিত হল না। নারদ তুম্বুরুকে বুকে তুলে জড়িয়ে ধরে বললেন—'হে সংগীত আচার্য্য ব্রজভূমিতে তুমি শিক্ষক হওয়ার অভিমান নিয়ে গিয়েছিলে। তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে যে, ব্রজভূমিতে কখনও অভিমান বা অহংকার নিয়ে প্রবেশ হওয়ামাত্র তোমার অন্তরস্থিত অহংকারের কমপক্ষে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়াই শ্রেয় ছিল। নারদের কথা শুনে তুম্বুরু নিরুত্তর। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে থাকেন তুম্বুরু।

নামের বাঁধনে বাঁধা ভগবান

পার্থসারথি বিনা পার্থ অচল। ভগবান পার্থসারথি হস্তিনাপুরে থাকলে অর্জুনও হস্তিনায় থাকতেন। পার্থসারথি বাসুদেব দ্বারকায় থাকলে, তিনিও তাঁকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে দ্বারকায় উপনীত হতেন।

একবার বাসুদেব যখন দ্বারকায়, তখন পার্থ রথ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। লীলা সংবরণের আগে এটাই পার্থের অন্তিম দ্বারকায় আগমন। পার্থ অন্দর মহলে প্রবেশ করতেই বাসুদেব তাঁকে নিয়ে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করে পালঙ্কের উপর পাশাপাশি বসে কুশলাদি বিনিময়ের পর বার্তালাপ শুরু করেন। পরস্পর বার্তালাপ করতে করতে পথশ্রমে ক্লান্ত পার্থ একসময় পালঙ্কের উপর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। পার্থ ঘুমিয়ে পড়তেই শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন—এই সুযোগ ভক্তের সেবা করার। জাগ্রত অবস্থায় পার্থ কোনদিনই আমার সেবা গ্রহণ করবে না। আজ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—এই সুযোগে ওর পদসেবা করি। অর্জুনের পায়ের কাছে বসে তাঁর পদসেবা করতে থাকেন কৃষ্ণ।

অন্দর মহলের অন্যকক্ষে তখন সৎসঙ্গ সভা বসেছে। রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ইত্যাদি মহিষীরা নারদসহ অন্যান্য ঋষিমুনিদের ডেকে ভগবানের কথামৃত শ্রবণ করছেন। প্রভু যখন সামনে থাকেন তখন নয়নভরে দর্শন করেন। নয়নের বাইরে চলে গেলেই তাঁরা মুনি ঋষিদের ডেকে কথা প্রসঙ্গ করেন। অন্দর মহলের একদিকের বৃহৎকক্ষে কথাপ্রসঙ্গ চলছে—অন্যকক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পায়ের কাছে বসে তাঁর পদসেবা করছেন। কথাসভায় কথার শেষে প্রধানা মহিষী রুক্মিণী ঋষিমুনিদের এবং ব্রাহ্মণদের কিছু রত্ন-মণিমাণিক্য দান করবেন,—কিন্তু পতি-পত্নী যুগলে উপস্থিত হয়ে দান করতে হয়, তাই রুক্মিণীজি নারদকে ইশারায় বললেন,—"প্রভুকে ডেকে নিয়ে আসুন।"

নারদ রুক্মিণীর কথানুযায়ী প্রভুর কক্ষে প্রবেশ করেই চমকে ওঠেন। বিস্মিত নয়নে দেখেন কৃষ্ণ অর্জুনের পদসেবা করছেন। নারদ কিছু বলার আগেই কৃষ্ণ তাঁকে ইশারায় কোন কথা বলতে নিষেধ করেন। কারণ কথা বললে সদ্য নিদ্রিত অর্জুনের ঘুম ভেঙে যাবে। নারদ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কানে মুখ রেখে মৃদুস্বরে বলেন,—"অন্দরমহলে আপনার ডাক পড়েছে।" তা শুনে অশ্রু ছলছল নয়নে কৃষ্ণ বললেন,—'পার্থকে ছেড়ে আমি কেমন করে যাই বলো তো নারদ।'

—কেন, যেতে পারবেন না কেন?

—যে ভক্ত, আমাকে ধরে থাকে তাঁকে ছেড়ে যাই কেমন করে।

পার্থ তো শুয়ে রয়েছে, সে তো আপনাকে ধরে নেই।

—সংসারের দৃষ্টিতে পার্থ শুয়ে আছে সত্য কিন্তু দেবর্ষি, পার্থ শুয়েও জেগে আছে। তাঁর শরীরের সমস্ত রোমকূপের ছিদ্র পথে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! নাম অবিরাম গুঞ্জরিত হচ্ছে। তুমি পার্থর শরীরে কান পেতে দেখ আমার কথা সত্য কিনা! কৃষ্ণের সম্মতি পেয়ে নারদ পার্থের পায়ে কান রাখেন। শুনতে পান অখণ্ড কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ—ধ্বনি। হাতে কান রাখেন সেখানেও কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ধ্বনি শুনতে পান। শেষে মাথার চুলে কান রাখেন—সেখানেও কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ধ্বনি শুনতে পান। পার্থর শরীরের যেখানেই কান রাখেন সেখানে কৃষ্ণ ধ্বনি শুনতে পান নারদ। আনন্দে তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে, গদগদ স্বরে তিনি বলেন—ধন্যপার্থ! তুমি ধন্য। কৃষ্ণ নামে তোমার এত প্রেম! নারদ বীণা নিয়ে বসে পড়েন। ভুলে যান তিনি কেন এসেছেন! কি করতে এসেছেন? বীণার সুরে তিনিও নামের ঝংকার তুলে তাতে ডুবে যান।

ওদিকে রুক্মিণী তখন কৃষ্ণ'র আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন—নারদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে তিনি সত্যভামাকে বললেন,—"মনে হয় দেবর্ষি ওখানে গিয়ে প্রভুকে ডাকতে ভুলে গেছেন। তিনি বোধ হয়

ওখানে গল্পে মশগুল হয়ে প্রভুকে ডাকার কথা ভুলে গেছেন। অতএব বোন, তুমি গিয়ে প্রভুকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এস।'' সত্যভামাও ওই কক্ষে প্রবেশ করতেই নারদের দশা প্রাপ্ত হন। তিনিও পার্থর শরীরের রোমকূপ হতে কৃষ্ণ নামের ধ্বনি শুনতে শুনতে ভাববিহ্বল হয়ে ঐ স্থানেই বসে পড়েন এবং ধীরে ধীরে হাততালি দিতে শুরু করেন। রুক্মিণী ভাবেন যাঁকেই পাঠাচ্ছি সেই ওখানে গিয়ে মজে যাচ্ছে—ব্যাপার কি? নিজে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসি এবং প্রভুকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি দ্রুতপদে কথা সভা হতে উঠে গিয়ে প্রভুর ঘরে প্রবেশ করলেন, সেখানে গিয়ে দেখেন, নারদ বীণা বাজিয়ে কৃষ্ণ নাম করছেন সত্যভামা করতালি দিচ্ছেন। প্রভু আনন্দে আবেশে দুলছেন—অর্জুনের শরীরের রোমপথ দিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি নির্গত হচ্ছে। সবার নয়নে অশ্রু। আনন্দ বিহ্বল পরিবেশে এসে তিনিও ভুলে গেলেন নিজেকে। রুক্মিণীকে ভাবাবিষ্ট দেখে কৃষ্ণের অধরে মৃদু হাসি দেখা দেয়। তিনি নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে যেন বললেন—''দেখ, আমি কেন তোমার ডাক শুনেও যেতে পারি নাই তা নিজের চোখে চেয়ে দেখ, হৃদয় দিয়ে অনুভব কর।'' রুক্মিণী যখন পার্থর শরীরের দিকে ঝুঁকে রোমকূপ হতে নির্গত 'কৃষ্ণ'-'কৃষ্ণ' ধ্বনি শুনতে পেলেন তখন তাঁর এত আনন্দ হল যে, তিনি দুবাহু তুলে নৃত্য শুরু করে দিলেন। রুক্মিনীকে নৃত্য করতে দেখে কৃষ্ণও পার্থর পদসেবা ছেড়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলেন। নারদ বীণা বাজাচ্ছেন, সত্যভামা করতালি দিচ্ছেন, কৃষ্ণ-রুক্মিণী নৃত্য করছেন। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ তো নিত্যই নৃত্য করেন। আজ দ্বারকায় কৃষ্ণ—রুক্মিণী নৃত্য করছেন। এ দৃশ্য বিরল। বড়ই মনোরম! দুজনকে নাচতে দেখে কথাসভার কক্ষ থেকে নির্গত হয়ে সবাই সেখানে উপনীত হলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন। খবর পেয়ে ব্রহ্মা সাবিত্রী—শিবপার্বতী ও সেখানে উপস্থিত হয়ে নামসংকীর্তন শুরু করে দিলেন। উচ্চকণ্ঠের সংকীর্তনে পার্থর নিদ্রা ভেঙে গেল। পালঙ্ক থেকে উঠে উপবেশন করে এবং চোখ মেলে তাকায়। সংকীর্তনের আনন্দে তখন সবাই মাতোয়ারা। পার্থ কৃষ্ণর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''সখা, তোমার বাড়িতে বুঝি আজ কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে? আমাকে জাগাও নি কেন? আমিও তাহলে তোমাদের সাথে যোগদান করতাম।''

কৃষ্ণসহ উপস্থিত সকলে মুচকি মুচকি হাসছেন।

প্রথম গো-দোহন

প্রভাত সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ ব্রজভূমিতে হালকা সোনালী পর্দার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গোপরাজ নন্দের গোশালায় এক বৃদ্ধ গোপ গোদোহনের স্বর্ণপাত্র দুই হাঁটুর মধ্যে ধরে গোদোহন করছেন। নীলমণি আজ ঘুম থেকে উঠে মায়ের কাছে না গিয়ে চুপিসাড়ে গোশালায় প্রবেশ করে ঐ বৃদ্ধ গোপের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীলমণিকে দেখে গাভীগুলো সমস্বরে 'হাম্বা' রবে স্বাগত জানায়। সচকিত হয়ে বৃদ্ধ গোপ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখেন—নীলমণি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর গোদোহন বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নীলমণিকে অপলক নেত্রে দেখতে থাকেন। বৃদ্ধ গোপ নন্দরাজের বাল্যসখা। বিয়ে থা করেননি। নন্দমহারাজার বাড়িতেই থাকেন। দুগ্ধ দোহন ও গোশালা পরিচর্যার কাজ করেন। গোদোহন, গোসেবার কাজ করলেও, নন্দ মহারাজ তাঁকে প্রীতির চোখে দেখেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁকে সম্মান করেন। ব্রজের সমস্ত গোপকুমারের তিনি প্রিয় তাউজী। তাউজী সম্বোধনের অন্তরালে তাঁর আসল নাম হারিয়ে গেছে। নন্দনন্দন নীলমণি তাউজীর পাশে এসে দাঁড়াল। কচি কোমল হাত দিয়ে তাঁর গলা বেষ্টন করে বলেন—''তাউজী, আমায় গাভীদোহন শিখিয়ে দেবে?'' বৃদ্ধ তাউজীর মনে হল কে যেন তাঁর কানে সুধা ঢেলে দিল। তাঁর হাত হতে অর্ধপূর্ণ দোহনপাত্র স্খলিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়ে দিতে দিতে পুনঃজিজ্ঞাসা করল,—'তাউজী, তুমি কাঁদছ কেন? আমাকে গোদোহন শিখিয়ে দেবে না?'

গো-দোহনের মতো একটা তুচ্ছ কাজ শেখার জন্য তাঁর কাছে কেউ প্রার্থনা করবে—একথা স্বপ্নেও ভাবেননি তাউজী। তাই তাঁর নয়নে অশ্রু। কৃষ্ণের অযাচিত করুণায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। হাত হতে দুগ্ধ দোহনের পতিত পাত্র ভূমি থেকে তুলে নিয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে-গোপালের শিরদেশে হাত রেখে বললেন,—'আজ সমস্ত গাভী দোহনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। প্রিয় লাল, আমি আগামীকাল তোমাকে গো-দোহন শিখিয়ে দেব।' আনন্দে উল্লসিত হয়ে গোপাল বলেন—''কাল যেন শিখিয়ে দিতে ভুলে যেও না—আমি না আসা পর্যন্ত অন্ততঃ একটা গাভীকে অদোহন অবস্থায় রেখ।'' কৃষ্ণের মধুনিসন্দী কণ্ঠরবে বৃদ্ধ গোপের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি নীলমণি কৃষ্ণের কথার কোন উত্তর দিতে পারেন না। তিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে থাকেন—নন্দনন্দন ব্রজকিশোরকে। কৃষ্ণ তাউজীর হাতদুটি নিজের কচি হাতে ধরে পুনরায় বলেন—'তাউজী, আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি। এই সময় নিজের গাভী নিজেকেই দোহন করতে হয় তাই না?'' আচ্ছা তাউজী, আজ সন্ধ্যার সময় যদি শিখিয়ে দাও তাহলে কেমন হয়?' বৃদ্ধ তাউজী উত্তরে কিছু বলার আগেই কৃষ্ণ পুনরায় বললেন—'তাউজী, ভেবে দেখলাম, সন্ধ্যায় গো-দোহন শেখা সম্ভব নয়।'

—সম্ভব নয়! কেন লাল?' তাউজী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণকে।

—'সন্ধ্যার সময় মা গোশালায় আসতে দেবে না। তুমি কালই আমায় গোদোহন শিখিয়ে দিও। কাল প্রভাতে যখন তুমি গোশালায় গাভী দোহন করতে আসবে, তখন আমাকে ডেকে নিও...পরে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পুনরায় বললেন—না, তোমাকে ডাকতে হবে না, আমি নিজে নিজেই যথাসময়ে গোশালায় হাজির হয়ে যাব কিন্তু তুমি যেন কাল আসতে ভুলে যেও না।' বৃদ্ধ গোপকে আগামীকাল আসার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ গোশালা ছেড়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

পরের দিন প্রভাত হতেই গোপাল গোশালায় বৃদ্ধ গোপের কাছে পৌঁছে গেল। আজ সঙ্গে দাদা বলরাম আছে। গোশালায় প্রবেশ করে কৃষ্ণ তাউজীর হাত হতে দোহনী-পাত্র নিজের হাতে নিয়ে বললেন—'চলো,

তাউ! আমায় দোহন শিখিয়ে দেবে চল।' বলরামও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠল—'হ্যাঁ হ্যাঁ তাউজী, আজ ভাইয়াকে গো দোহন অবশ্যই শিখিয়ে দাও।' তাউজী কৃষ্ণের হাত থেকে বড় দোহনী পাত্রটি নিয়ে তাঁর হাতে একটি ছোট দোহনী পাত্র ধরিয়ে দিলেন। তারপর কৃষ্ণকে দেখিয়ে দিলেন—কিভাবে গো-দাহনের পাত্র দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে-গাভীর স্তন হতে অঙ্গুলি সঞ্চালন যোগে দুগ্ধ দোহন করতে হয়। নীলমণিও তাঁকে অনুকরণ করে গো-দোহনের মুদ্রায় গাভীর স্তনের পাশ্বস্থিত ভূমিতে উপবেশন করলেন। তাউজী শিক্ষা শুরু করলেন—নীলমণির হাতের আঙুল আপন হাতের আঙুল দিয়ে আলতো করে ধরে গাভীর স্তনে লাগিয়ে দিয়ে বললেন—''বেটা নীলমণি, গাভীর স্তনে আঙুলের চাপ দিতে দিতে স্তনকে আকর্ষণ কর।'' তাউজীর কথানুযায়ী তা করতেই গাভীর স্তন হতে দুগ্ধ অঝোর ধারায় ক্ষরিত হতে থাকে। কিন্তু দুধ দোহন পাত্রে না পড়ে নীলমণির উদর-দেশে পতিত হল। কখনও বা মাটিতে, আবার দু'চার ফোঁটা দোহনীপাত্রেও পড়ে জমা হয়। তা দেখে কৃষ্ণ উল্লাসে ফেটে পড়ল। দোহনী পাত্র নিয়ে উঠে নাচতে নাচতে বলরামের কাছে গিয়ে বলল, 'দাউদাদা, দাউদাদা, দেখ আমি গাভী দোহন শিখে গেছি।' বৃদ্ধ গোপ নীলমণির আনন্দ উল্লাসভরা নৃত্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যান।

পরদিন প্রভাত হতেই কৃষ্ণ যখন নতুন গাভী দোহন শিক্ষার আনন্দে পুনঃদোহন পাত্র হাতে নিয়ে গোশালার দিকে যেতে থাকেন তখন মা যশোদা গোপালকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে গোপালকে গো-দহন হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। গোপালের জেদও কম নয়। সে গাভী দোহন না করে কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না। তখন যশোদা বাধ্য হয়ে গোপালের হাত হতে দোহনী পাত্রটি কেড়ে নিয়ে বলেন —'ওরে ও সোনামণি, কেন বুঝিস না, তুই একটা ছোট্ট অবোধ শিশু, কোন গাভী যদি তোকে লাথি ছোঁড়ে কিংবা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দেয় তখন তোর দশাটা কি হবে তা ভেবে দেখেছিস।' যশোদা যত বোঝান গোপালের জেদও তত বেড়ে যায়। শেষে নিরুপায় হয়ে যশোদা বললেন—'শোন নীলমণি, প্রথমে তুই তোর বাবার কাছে ভালো করে দোহন শিখেনে; শিখে নেওয়ার পর আমি আপত্তি করবো না। তখন নিজের হাতে দোহনীপাত্র তোর হাতে তুলে দেব। তুই দুগ্ধ দোহন করে নিয়ে আসবি আমার কাছে, কি এবার খুশী তো?

—'ঠিক আছে মা, তাই হবে! আমি এখনই চললাম বাবার কাছে।'

নন্দ মহারাজ তখন গৃহে আপন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গোপাল সেখানে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে —''বাবাজু! মোহি দুহন শিখওয়াও।'' মহারাজ নন্দ এক শুভ মুহূর্ত দেখে লালাকে গোদোহন শিখাবেন— এই প্রতিশ্রুতি দেন। শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরা নীলমণির পক্ষে সম্ভব নয়। সে চায় এখন এই মুহূর্তে গোদোহন শিখতে। অবশেষে নন্দমহারাজও নিরুপায় হয়ে উপানন্দের পরামর্শে গৃহদেব নারায়ণকে স্মরণ করে আজই নলমণির সাধ পূরণের জন্য সচেষ্ট হলেন। কৃষ্ণও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জননীর কাছে এসে বলল :

''সুবর্নদোহনী পাত্র মাতা, দাও মোর হাতে।
গোশালায় গোদোহনে যাব আমি পিতৃদেবের সাথে।।''

জননী যশোদা গোপালের হাতে ছোট দোহনী পাত্র ধরিয়ে দিলেন। গোপালের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও গোশালার দিকে এগোলেন। তাঁর পিছু পিছু চলেন ব্রজের যত রমনী, ব্রজের নীলসুন্দরের গো-দোহন লীলা দর্শনের জন্য। গোশালায় নন্দমহারাজ আপন ইষ্টদেব নারায়নকে স্মরণ করে পুত্রের শিরদেশের আঘ্রান গ্রহণ করলেন। অনন্তর গো-দোহন শিক্ষাপর্ব শুরু হল। নীলমণি বাবার কাছ হতে গো-দোহন শিক্ষা মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ঐ দিন মঙ্গলগীত-বাদ্যধ্বনিতে সমগ্র ব্রজপুর আনন্দে মেতে উঠল। মণিদীপমালায় সজ্জিত ব্রজপুরে সে সময় দিবস-রজনীর পার্থক্য বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠল।

রাখাল রাজা

ব্রজের মাঠে ধেণুগুলি নব তৃণ চর্বন করতে করতে মনের সুখে বিচরণ করছে। তা দেখে সখাগণ কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে উঠল। সুবল বলল, আয় সবাই চোর-চোর খেলি।' সুদাম বল, 'চোর-চোর তো খেলবি কিন্তু চোর হবে কে?' রাধারাণীর ভাই কানুর সখা শ্রীদামা বলে,—'চোরের রাজা কানাই থাকতে অন্যজনের চোর সাজার প্রয়োজন কি?' ভদ্র বলে, 'তাহলে কানাই তুই চোর হয়ে লুকিয়ে পড় আমরা তোকে খুঁজে বের করে ধরে আনবো।' বলরাম বলে—'কানাই চোর হয়ে লুকোলে, ওকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। ও ইচ্ছে করে ধরা না দিলে কেউ-ই ওকে ধরতে পারে না।' কানাই বলে—'ও নিয়ে তোরা চিন্তা করিস না। আমি চোর হয়ে লুকোলে তোরা যদি খুঁজে না পাস কিংবা যদি আমায় খুঁজতে খুঁজতে তোরা ক্লান্ত হয়ে পড়িস—তাহলে আমি নিজেই ধরা দিয়ে দেব। এখন তোরা চোখ বন্ধ কর—আমি তোদের শৃঙ্গ, বেত, উত্তরীর চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে পড়ি।'

কৃষ্ণের কথায় বলরামসহ গোপসখারা চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে পড়ে। কৃষ্ণ তাদের বেত, শৃঙ্গ, উত্তরীয় ইত্যাদি নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। কিছুক্ষণ পর গোপসখারা চোখমেলে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে কৃষ্ণকে খুঁজতে আরম্ভ করল। খুঁজতে খুঁজতে তারা শুনতে পেল দূরের বনে বংশীধ্বনি হচ্ছে। সখারা বলরামসহ সেইদিকে ছুটল। কিন্তু যে বন থেকে বংশীধ্বনি ভেসে আসছিল সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কৃষ্ণকে ধরা গেল না। পরক্ষণেই আবার অন্যবনে বংশীধ্বনি শোনা গেল কিন্তু সেখানে গিয়েও কৃষ্ণকে পাওয়া গেল না। ভাইয়াকে না পেয়ে বলরাম শঙ্কিত হয়ে উঠল। সখাদের সে বলল—'ভাইকে কেন তোরা মিছিমিছি চোর সাজালি। এখন যদি সে বনে হারিয়ে যায় তাহলে বাড়ী ফিরে গিয়ে যশোদা মাকে মুখ দেখাব কেমন করে? ভাইকে না দেখতে পেলে বড়মা, ছোটমা দুজনেই খুব কাঁদবে। নন্দবাবাও মুষড়ে পড়বে।' বনে মনে বাঁশীর সুর শুনে ও অনেক ছুটোছুটি করেও যখন কৃষ্ণকে পেল না তখন সবাই হতাশ হয়ে একটি বৃক্ষের তলে উপবেশন করল। বলরাম কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল,—'কা-না-ই, প্রাণাধিক ভাই আমার-আর লুকিয়ে না থেকে বেরিয়ে পড়, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না।'

—''দাউদাদা, আমি এখানে''—বলেই কৃষ্ণ সহসা বনের বৃক্ষের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল।'' কানাইকে দেখতে পেয়ে সবার বুকে যেন প্রাণ ফিরে এল। বলরাম কৃষ্ণকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বলল—'ভাই কানু, আর তোকে চোর হয়ে লুকোতে দেব না।'

তখন কৃষ্ণ বলল,—'তাহলে দাউদাদা, এস আমরা সবাই এখন একটা নতুন খেলা শুরু করি।'—'কি খেলা?'—সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

—তোদের মধ্যে কেউ একজন আমার চোখ বেঁধে দে। তারপর আমি যখন চোখ বাঁধা অবস্থায় থাকবো তখন তোরা সব একে একে এসে আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবি—আর ও অবস্থায় যে স্পর্শ করবে আমি তাঁর নাম বলে দেব। যদি ঠিক হয় তাহলে তাঁর চোখ আমার মতো বাঁধা পড়বে, এবং তাঁকেও সব একের পর এক হাত দিয়ে স্পর্শ করতে থাকবে। সেও সবার নাম বলতে বলতে যার নাম ঠিক বলবে তখন তার চোখও বাঁধা হবে। এইভাবে খেলা চলতে থাকবে।

—বাঃ খুব সুন্দর খেলা তো—ভদ্র বলে ওঠে।

সুবল কৃষ্ণের চোখ উত্তরীয় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল, যাতে সে দেখতে না পায়। তারপর খেলা আরম্ভ হল। তোক-কৃষ্ণ কৃষ্ণকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে, গলার স্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করে—'আমি কে? বলতো কানাই?'

সরল কানাই বলে—'কে আবার! তুই?'

—'তুই বললে তো হবে না ভাই, নাম বলতে হবে'।

কৃষ্ণ বলে—'নাম ; না-আ-ম—আচ্ছা তুই বল না তোর নাম কি?'

—'আমি তোককৃষ্ণ।'

—'দূর বোকা নাম বলে দিলি?' ভদ্র ঝাঁঝিয়ে উঠল তোককৃষ্ণ'র ওপর।

—'আচ্ছা কানু, এবার বল তো, তোকে কে ছুঁয়ে দিল।'

—'মধু-মধুমঙ্গল।' কৃষ্ণ-চোখ বাঁধা অবস্থায় উত্তর দেয়।

—সখারা সমস্বরে বলে উঠে—'ঠিক! ঠিক! ঠিক!'

এবার মধুমঙ্গলের চোখ বেঁধে দিল কৃষ্ণ। সে কানাইয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে বলে 'তুই যখন আমাকে স্পর্শ করবি তখন নামটা যেন চুপিচুপি বলে দিস।'

—'না ভাই, তাহলে খেলার মজাটা নষ্ট হয়ে যাবে। বন্ধুরা সব রাগ করবে।'

—'কিন্তু আমি যে ছেলে মানুষ, সরল বোকা ব্রাহ্মণ সন্তান।'

মধুমঙ্গলের কথা শুনে সখারা টিপ্পনী কেটে বলে—'আহা-আহা মরে যাইরে। বাছা আমাদের ছেলেমানুষ, ধেড়ে মরদ! আর ক'দিন পর গোঁফ গজাবে। চোখ বাঁধতে যদি অতভয় তবে কাল থেকে আমাদের সাথে মাঠে আসবি না। আমরা তোকে খেলতেও নেব না। যা ভাগ এখান থেকে।

কৃষ্ণ বলল, 'তোরা ওকে বকিস না ভাই। দেখছিস না ওভয়ে কেমন জড় হয়ে গেছে। মধুমঙ্গল কাছে আয়, তোর চোখ খুলে দিই।'

কানু মধুমঙ্গলের চোখের বাঁধন খুলে দেয়। মধুমঙ্গল বলে—'এতক্ষণ তোকে না দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল রে কানু!' কৃষ্ণ সে কথায় কান না দিয়ে বলরামকে বলল,—'দাউদাদা, তাহলে তোমার চোখ বেঁধে দি।'

—'নারে ভাই তুই আমার চোখ বাঁধিস না।'

—'কেন?'

—'তাহলে যে তোকে দেখতে পাব না।'

সুবল-সুদাম, ভদ্র সবাই বলে—'তাহলে এ খেলা বাদ দিয়ে নতুন খেলা শুরু কর।'

কৃষ্ণ বলে—'কি খেলা খেলব তোরাই স্থির কর।'

সবাই আলোচনা করে স্থির করে রাজা-প্রজা খেলা হোক।

কৃষ্ণ বলে—'বেশ তাই হোক কিন্তু রাজা সাজবে কে?'

ভদ্র বলে—'কানাই, তুই আমাদের রাজা।'

কৃষ্ণ বলে—'দূর বোকা! বড় দাদা-দাউজী থাকতে ছোটভাইকে কি রাজা হওয়া সাজে? দাউ-দাদা রাজা হোক—আমি হব সেনাপতি।'

বলরাম বলে—'না, কানু, তুই রাজা হ, আমি সেনাপতি সাজি।' বলরামের কথা শেষ না হতেই সখাগণ সমস্বরে চীৎকার করে বলে ওঠে ''কানু, তুই আমাদের রাজা হ', রাখালরাজা। আমরা কেউ হব কোটাল, কেউ হব প্রজা।' সবার অনুরোধে কানাই রাজা সাজতে বাধ্য হয়।

কদমতলায় মাটির ঢিপি তৈরী করে সিংহাসন তৈরী করা হল। বন থেকে ফুলপাতা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তা দিয়ে তৈরী হল রাজমুকুট। গোচারণের যষ্টি হল রাজদন্ড। বলরাম উত্তরীয় দিয়ে ছত্র তৈরী করে রাজার মাথায় ধরল। অন্যসব সখারা বনফুলের মালা গেঁথে রাখাল রাজার গলায় পরিয়ে দিল। নবরাজ-বেশে কৃষ্ণচন্দ্র মাটি দিয়ে নির্মিত সিংহাসনে আরোহন করল। কোটাল বেশে ভদ্র, উচ্চরবে শৃঙ্গধ্বনি করে প্রজারূপী সখাদের সমবেত করল। চারণকবি—'বন্দীগণ—রাজার বন্দনাগীতি শুরু করল। উপস্থিত প্রজাবেশী তরুণগোপ কিশোররা বন থেকে নানা ফলমূল সংগ্রহ করে রাজাকে উপহার প্রদান করল। রাজা ফলমূল কিঞ্চিৎমাত্র গ্রহণ করে উপস্থিত প্রজাদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করল।

সবশেষে বসল বিচার সভা। যারা অপরাধী তাদের দণ্ড প্রদান করা হবে। প্রহরীবেশী একজন সখা, জনৈক সখারূপ অপরাধীকে লতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, রাজার সম্মুখে হাজির করে বলল,—'মহারাজ এ আপনার বিনানুমতিতে গাছ থেকে পাকা আমলকী পেয়ে খেয়েছে,' রাজা হুকুম দিল,—'ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে যমুনার যেখানে অল্প জল আছে সেখানে নিক্ষেপ কর।

রাজাদেশে প্রহরীরা তাঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় যমুনার জলে নিক্ষেপের জন্য। প্রহরী দ্বিতীয় অপরাধীকে উত্তরীয় দ্বারা বন্ধন করে রাজার সম্মুখে পেশ করল।

রাজা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করল,—'এর অপরাধ কি?'

—'মহারাজ এ গোচারণে ফাঁকি দিয়ে গাছের নীচে শুয়েছিল।

—'একে যমুনার তপ্ত বালুকনায় দুদণ্ডের জন্য শুয়ে থাকার দণ্ড দিলাম।'

এইভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন অপরাধীকে বন থেকে ফল সংগ্রহ করে আনার শাস্তি প্রদান করছে, কাউকে বলছে—বসে বসে পুষ্পমালা রচনা কর। কাউকে বলছে দোনা (পাতার তৈরী ঠোঙা) ভর্তি করে যমুনা থেকে জল আনয়ন কর। কাউকে রাজ সন্নিধান হতে কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাসন দণ্ডপ্রদান করা হচ্ছে—এর চেয়ে কঠোর সাজা বৃন্দাবনের বনরাজ্যে অপরাধীদের দেওয়া সম্ভব ছিল না। খেলতে খেলতে সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নগগনে উদিত হলে মা যশোদার নির্দেশে সেবিকারা মধ্যাহ্নকালীন ভোগ নৈবেদ্য নিয়ে উপস্থিত হলে রাজসভা ভেঙ্গে যেত। সকলে যমুনার শীতল সলিলে অবগাহন করে যশোদা ও অনান্য ব্রজময়ীদের প্রেরিত সুস্বাদু-উপাদেয় ভোগ গ্রহণ করে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে কোন ছায়াঘন বৃক্ষতলে পত্রশয্যা রচনা করে তার উপর রাজাকে শুইয়ে দিত। বলরাম গাছের ভগ্ন ডাল দিয়ে রাখালরাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ব্যজন করত। ভদ্র সুবলাদি অন্যসখারা পর্যায়ক্রমে মহারাজের হস্তপদ কিছুক্ষণ মর্দন করে নিকটেই উত্তরীয় বিছিয়ে শুয়ে পড়তো। অপরাহ্নের পড়ন্তবেলায় সখারা ম্রিয়মান হয়ে পড়ত—রাখালরাজের সঙ্গে রাত্রিকালীন ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায়। বেলা পড়লেই তারা সূর্য্যের দিকে বিষণ্ন নয়নে চাইত। কানুর অগোচরে সূর্য্যের দিকে চেয়ে তাঁরা প্রার্থনা করত—''হে দেব দিবাকর, আর কিছুক্ষণ গগনে বিরাজ কর। আমরা কানুর সাথে আর একটু খেলা করি। তুমি অস্ত গেলে রাত্রি নামবে ব্রজের বুকে। কানুকে ছেড়ে সারা রাত আমরা নিদ্রাহীন চোখে বিছানায় পড়ে পড়ে ছটফট করি তা কি তুমি দেখতে পাও না?''

অভিনব মুক্তালীলা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মদিন। নন্দ মহারাজের বাড়ীতে সকাল হতেই গোপ-গোপীদের সমাগম। সখারাও নব বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে জমা হয়েছে। গোপীরা মঙ্গলগীত গাইছে। গীতের তালে তালে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। মা যশোদা কৃষ্ণকে ফুলের মুকুট-গহনা, চন্দন-কুঙ্কুম-নবপীতধরা চূড়ায় মনোহর বেশে সাজিয়ে দিয়েছেন। মুশকিল হল কৃষ্ণকে এই উৎসবের দিনে বাড়ীর মধ্যে আটকিয়ে রাখা। মাঙ্গলিক কর্ম নির্বিঘ্নে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে যেতে নেই একথা নীলমণি বোঝে না। মা যশোদা অনেককষ্টে গোপালকে ধরে রেখেছেন। তাঁকে ধরে রাখা যে কী কঠিন কর্ম তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। গোপালকে কোলে বসিয়ে বলছেন—'বাবা নীলমণি, এই দেন তোমার জন্য একটা কী সুন্দর মণি নির্মিত ময়ূর কিনে রেখেছি, জন্মদিনের পূজা অনুষ্ঠান চুকে গেলে, তুমি ওটা নিয়ে নাচাবে। এই দেখ, তোমার জন্য একটা হীরের তৈরী গো-বৎস ও সংগ্রহ করে রেখেছি, তুমি এটা নিয়ে বলরাম দাদার সঙ্গে খেলা করবে।' এইভাবে নানারকম খেলনার প্রলোভন দিয়ে যশোদা নীলমণিকে আটকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেন।

অপরাহ্নের মধ্যে কৃষ্ণের জন্মদিনের উৎসব সমাপ্ত হল। দধি-হরিদ্রার মিশ্রণ গোপালের অঙ্গে মাখিয়ে দেওয়া হল। মহর্ষি শাণ্ডিল্য পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

বৈদিক শান্তি পাঠ; গো-পূজা, বিপ্রপূজা, অতিথিআপ্যায়ন আত্মীয় বন্ধু-পরিজনদের ভুরিভোজন—এককথায় সব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পর যশোদা গোপালকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

জননীর অনুমতি পেতেই কৃষ্ণচন্দ্র নাচতে নাচতে গৃহের তোরণদ্বারের নিকট উপস্থিত হল। সেখানে ভোজনান্তে গোপকুমাররা অপেক্ষা করছিল। আজ কোন গোপীর ঘরে ননীচুরি কিংবা অন্য উপদ্রব করার অভিপ্রায় তার নেই। ছায়াঘন রাজপথ ধরে সখাদের সাথে কৃষ্ণ এক গোপবালার ঘরে উপনীত হল।

গোপবালা বাড়ীতে একাকিনী বসেছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসবে তারও নিমন্ত্রণ ছিল। গোপীরা তাকে গৃহকর্ম দ্রুতসম্পন্ন করে নন্দভবনে যেতে বলেছিল কিন্তু ঐ গোপমালা কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে আজ যে কৃষ্ণের জন্মদিন একথা ভুলে যায়। বাড়ীতে বসে চোখের সামনে সে যেন দেখতে পায়, কৃষ্ণ তাঁর বাড়ীতে এসে খেলা করছে, খেলতে খেলতে নাচছে, লাফাচ্ছে। এটা যে তাঁর মনের কল্পনায় ভাসছে এ বোধও তার নেই। তাকে বোধ দেওয়ার জন্যই কৃষ্ণচন্দ্র আজ জন্ম-উৎসব সমাপ্ত হতেই আর কোথাও না গিয়ে ঐ গোপবালার বাড়ীতেই এসে উপনীত হয়েছে।

সখাদের নিয়ে আনন্দ কলরব করতে করতে কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তাঁদের কল-ধ্বনিতে গোপবালা সম্বিত ফিরে পেল। চোখ মেলে দেখল, যার চিন্তা করতে করতে সে এতক্ষণ আত্মবিস্মৃতা ছিল, —সেই নবনীরদবরণ কৃষ্ণচন্দ্র আপনরূপে তাঁর গৃহ আলো করে সখাসহ উপনীত হয়েছে। গোপবালা বুজে উঠতে পারে না—'এটা স্বপ্ন না সত্যি?' আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল তার হৃদয়-মন-প্রাণ। কৃষ্ণচন্দ্র কাছে এসে বীণা বিনিন্দিত মধুরাতি মধুর কণ্ঠে বলল,—'এই গোপী, আজ আমার জন্মদিনে আমাদের বাড়ী যাসনি কেন? অন্যসব গোপীরা গিয়েছিল। আমার জন্মদিনের কথা তোর কি মনে ছিল না?'

কৃষ্ণ কণ্ঠ কর্ণপুটে প্রবেশ করতেই গোপবালা আনন্দে উন্মাদিনী হয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যায় কৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণপালানোর চেষ্টা করার আগে গোপবালা তাঁর একখানি হাত ধরে ফেলল। ধরা পড়ে কৃষ্ণের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। ভাবছে—''গোপী আমাকে ধরল কেন?'' বেঁধে রাখবে নাতো?' কৃষ্ণ হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে এবং গোপীকে বলল,—'তুই আমার হাত ধরলি যে? ছেড়ে দে, বাড়ীতে আমার অনেক কাজ আছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কি রে হাসছিস কেন? ছেড়ে দে!' গোপবালা না ছাড়ে হাত, না দেয় কৃষ্ণকথার

উত্তর। তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করল। কৃষ্ণ গোপবালার কণ্ঠে শোভমান মুক্তাহারটি অন্য হাত দিয়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে দিল। ফলে মুক্তার দানা সূত্র-মুক্ত হয়ে প্রাঙ্গণময় ছড়িয়ে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে গোপবালা ছড়িয়ে পড়া মুক্তাদানা কুড়িয়ে তুলতে যেতেই কৃষ্ণচন্দ্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

গোপবালার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। কৃষ্ণ গোপবালা দু-চারটি মুক্তারদানা কুড়িয়ে সবেমাত্র আঁচলে রেখেছে—এমতাবস্থায় কৃষ্ণকে হাত ফসকে পালিয়ে যেতে দেখে তাঁর যেন মনে হল —''আমার মনরূপ মুক্তারত্ন চুরি করে কৃষ্ণ পালিয়ে গেল।' ভাবতে ভাবতে গোপবালা ছেঁড়া মুক্তাহার হাতে নিয়ে কৃষ্ণের পিছনে পিছনে দৌড় লাগিয়ে নন্দভবনে উপনীত হল। নন্দভবনে তখনও গোপীদের ভীড়।

মা যশোদা গোপবালাকে তাঁর লালার পিছুপিছু ছুটে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। গোপবালা যশোদার কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ''যশোদা মা, যশোদা মা আমার মুক্তার হার ছিঁড়ে দিয়েছে এই দেখ।'' ছিন্ন মুক্তাহার যশোদামাকে দেখায়। কৃষ্ণও ইতিপূর্বে সেখানে এসে পৌঁছে গেছে। তাঁর দিকে চেয়ে যশোদা জিজ্ঞাসা করলেন—'নীলমণি, তুমি এই মেয়ের মুক্তাহার ছিঁড়ে দিয়েছ?' কৃষ্ণমায়ের কাছে সত্য গোপন করলে না—অপরাধ স্বীকার করল, তাঁর অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গীতে উপস্থিত ব্রজগোপীরা আনন্দিত হল। জননী যশোদার অধরেও হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। তিনি অপরাধীপুত্রকে কলে তুলে নিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস স্বরে তাঁকে কিছু একটা বোঝাতে প্রয়াসী হন। পরে নিজের কণ্ঠের বহুমূল্য মুক্তাহার খুলে গোপালের হাতে তুলে দিলেন। গোপাল কোল থেকে নেমে মায়ের দেওয়া মুক্তাহারটি নিয়ে গোপবালার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'শোন গোপী, আমি যদি তোর মুক্তাহার ছিঁড়ে দিয়ে অপরাধ করে থাকি, তবে তার বদলে আমার মায়ের 'হার' তুই নিয়ে যা।' এইরূপ বলে কৃষ্ণ মায়ের মুক্তাহারটি গোপবালার হাতে ধরিয়ে দিল। অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে আর না দাঁড়িয়ে মায়ের দেওয়া জন্মদিনের উপহার 'রত্নময়ূর'টি হাতে নিয়ে সখাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।

যশোদা মুক্তাহারটি গোপবালার হাত থেকে নিয়ে তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। তা দেখে সমবেত ব্রজগোপীদের দেহের শিরায় শিরায় আনন্দের শিহরণ জাগল। তাঁদের সবার হৃদয়ের গভীরে এক সংকল্পের উদয় হয়—''আহা শ্যামসুন্দরের শ্রীকরপল্লবের পরমাধন্য মুক্তার দু'একটা দানা যদি আমরা পেতাম —''ভাবতে ভাবতে গোপীরা স্ব স্ব গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

জন্মদিনের পরের দিন প্রভাতে এক রত্নব্যবসায়ী ব্রজপুরে এলেন। পান্না-চুনী-মুক্তা-প্রবাল ইত্যাদি রত্নাদিতে ভর্তি একটি পেটিকা মাথায় নিয়ে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ব্রজপুরে আগমন। সাধু সন্তরা বলেন, 'কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলাশক্তি মা যোগমায়া ঐ ব্যবসায়ীকে ব্রজপুরে ডেকে এনেছেন।' পথে পথে ফেরী করতে করতে সে নন্দের রাজভবনের সম্মুখে উপনীত হল। মহারাজ নন্দের ঐশ্বর্য্য দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রত্নমণিখচিত রাজপ্রসাদ দেখে রত্নব্যবসায়ীর নয়ন যেন তৃপ্ত হয় না! মনে মনে ভাবে যেখানে এমন রত্নখচিত প্রাসাদ বিদ্যমান, সেখানে কি আমার এই তুচ্ছ পান্না-মুক্তা বিক্রী হবে? রত্নপেটিকা মাথায় চাপিয়ে স্বীয় গৃহের উদ্দেশ্যে যে পা বাড়ায়। এমন সময় কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে উপনীত হয়ে পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। রত্নব্যবসায়ী মাথা থেকে পেটিকা ভূমিতে নামায়। কৃষ্ণচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করল,—'কি বিক্রী করতে এসেছ?''

—'রত্ন বিক্রী করতে এসেছি বাবা।' উত্তর দিয়ে অপলক নয়নে নন্দ নন্দনের রূপসুধা পান করতে থাকেন রত্নব্যবসায়ী। তার অন্তস্থলে কে যেন বলে ওঠে—''জগতের মহারত্ন যদি তোমার কাছে রত্ন ক্রয় করে— তাহলে হে রত্নবণিক তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'' কৃষ্ণচন্দ্র পেটিকা থেকে কতিপয় মুক্তাদানা হাতে নিয়ে সেগুলি নিরীক্ষণ করতে লাগল। কৃষ্ণ দৃষ্টি দেওয়ার পর মুক্তাদানার জ্যোতি পূর্বাপেক্ষা বহুগুন বৃদ্ধি পায়। যশোদাসহ গোপীরা সেখানে উপনীত হয়ে মুক্তাদানার জ্যোতি দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে পড়েন। রত্নবণিক নির্নিমেষে নয়নে নন্দনন্দনকে দেখতে দেখতে একটি মুক্তাদানা তাঁর করপল্লবে তুলে দেয়। ব্রজেশ্বরী যশোদা মুক্তাদানার মূল্য কত জিজ্ঞাসা করেন। রত্নবণিক চড়া দাম হাঁকেন। গোপালের যে জিনিস পছন্দ, মূল্য

তার যতই হোক যশোদা কিনে দিতে কুণ্ঠিত নন। মূল্য মিটিয়ে দিতেই রত্নবণিক চলে যায়। যেতে যেতে বার বার পিছু ফিরে চেয়ে দেখতে থাকে নন্দনন্দনকে। মুক্তা হাতে নিয়েও কৃষ্ণচন্দ্র নিজভবনে ফিরে এসে এক আশ্চর্য্য কর্ম শুরু করল। সখাদের দিয়ে যমুনার তীর থেকে গুঁড়োমাটিও জল সংগ্রহ করে আনল। মুক্তাদানাটি প্রাঙ্গনের একপাশে পুঁতে দিয়ে, তার চারদিকে ঐ মাটির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে একটা গোল বাঁধের মত বেড়া তৈরী করল। তারপর প্রোথিত মুক্তাদানার উপর জল সিঞ্চন করল। যশোদা লক্ষ্য করছিলেন গোপালের ক্রিয়াকর্ম। মুক্তাদানার উপর গোপালকে জলসিঞ্চন করতে দেখে তিনি হেসে উঠলেন—

হুঁসতি জমোমতি মাত, কহতি করত মোহন কহা।
য়হ নহিঁ জানতি বাত, যে করতা সব জগত কে।।

অর্থাৎ যশোদা মাতা হাসছেন গোপালের কৌতুক দেখে, ভাবছেন মোহন এসব কি করছে। কিন্তু যশোদা জানেন না যে গোপাল তাঁর জগৎ-কর্তা।

কিছুক্ষণ পর যশোদা আশ্চর্য হয়ে যান। নীলমণির মুক্তাদানার উপর জলসিঞ্চনের কর্ম শেষ হতেই মুক্তাদানার অঙ্কুরোদগম হল, দুটি পত্র বিকশিত হল। ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখাসহ মুক্ত তরু বৃহৎআকারে তাঁর বাড়ীর অঙ্গনে শোভা বিস্তার পূর্বক প্রকাশিত হল। ফুল-ফল দেখা দিল। শাখায় শাখায় রাশি রাশি মুক্তাফল জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে। যশোদা মুক্তা ফলভারে নত মুক্তাতরু দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। দেখতে দেখতে এ সংবাদ সমস্ত ব্রজপুরে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে গোপরমণীরা সেখানে এসে ভীড় জমান। যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হয়। চোখে দেখেও তাঁদের যেন বিশ্বাস হয় না। না হোক তাতে কৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দ উল্লাস স্তিমিত হয় না। নাচতে নাচতে মুক্তাদানায় অঞ্জলিপূর্ণ করে কৃষ্ণ উপস্থিত গোপরমণীদের আঁচলে ঢেলে দিল। পূর্বদিন অর্থাৎ কৃষ্ণ জন্মদিনে যে সব গোপরমণীরা কৃষ্ণকর স্পৃষ্ট দু'একটি মুক্তাদানার জন্য লালায়িত হয়েছিলেন—তাঁদের সবার অঞ্চল কৃষ্ণচন্দ্র আজ রাশি রাশি মুক্তাদানায় পূর্ণ করে দিল। ব্রজরাজ নন্দ সহ অগণিত গোপও এই মুক্তাতরু দর্শন করেন। নন্দরাজ ভাবেন—ঐ রত্নব্যবসায়ী নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী সিদ্ধপুরুষ অথবা সবটাই আমার ইষ্টদেব নারায়নের মায়া। ব্রজেশ্বরী যশোদার ভাবনাও তাই। ব্রজগোপীরা ওই মুক্তাদানা দিয়ে হার তৈরী করে গলায় পরলেন। কৃষ্ণ স্পর্শ অনুভব করলেন। মুক্তার প্রতিটি দানায় তাঁরা কৃষ্ণের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। তাই ওই মুক্তানির্মিত হার তাদের জীবন হার হয়ে গেল।

কৃষ্ণের বাঁধন

এক গোপীর নতুন বিয়ে হয়েছে। চারমাস আগে সে ব্রজের এক গোপ তরুণের বধূ হয়ে এসেছে। অন্যান্য গোপবধূদের চেয়ে সে বয়সে ছোট। নন্দের বেটা কানাইকে তার ভালো লাগে। মনে মনে ভাবে, বিয়ের আগে যদি কানাইয়ের দেখা পেতাম। এখন শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর ঘর করতে এসেছি—এখান থেকে তো আর যখন তখন কানাইকে দেখতে যাওয়া চলে না। সেটা উচিতও নয়। হাজার হোক শ্বশুর বাড়ী, কথা উঠবেই। খুব ভালো হয় কানাই যদি একবার তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে মাখনচুরি করতে আসে। তাহলে সে কানাইকে ধরে বেঁধে রাখবে—তারপর যশোদাকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনবে। যশোদা এসে কানাইকে তিরস্কার করে যখন মারতে যাবে, তখন সে যশোদাকে আটকাবে। তাহলেই কানাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়ে যাবে।

ভগবান অর্ন্তযামী। ভক্তের অন্তরের ইচ্ছা-তাঁর কাছে গোপন থাকে না। একদিন কানাই ওই নব গোপবধূর শ্বশুর গৃহে মাখন চুরি করতে এল যে ঘরে ননী মাখন থাকে সেই ঘরে ঢুকে মাখনের হাঁড়িতে যেই হাত ভরেছেন—অমনি নবীনা গোপবধূটি এসে তাঁকে ধরে ফেলল। কানটি কষে মলে দিয়ে বধূটি জিজ্ঞাসা করল, —''এই নটখট কি করছিস? মাখনচুরি? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা।' গোপবধূটি কানুকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় এবং থামের সাথে রেশমের দড়ি দিয়ে বেঁধে বলে,—''থাক এখানে, বাঁধা থাক-আমি এখনি তোর মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।'' গোপবধূটি যশোদাকে ডাকার জন্য গৃহ থেকে বের হয়ে যায়। যাওয়ার আগে গোপালকে ঠিকমতো বাঁধতে সে ভুলে যায়। গোপালের ভীত মুখপানে চেয়ে সে এমন মুগ্ধ হয়ে যায় যে গোপালকে ঠিকমতো থামের সাথে বাঁধতে পারে না। কোনরকম গোপালের চারদিকে দড়িটা থামের সাথে ঘুরিয়ে সে চলে যায় যশোদাকে ডাকতে। কৃষ্ণ ঐ বাঁধন সহজেই খুলে ফেলল এবং দড়িটা যথাস্থানে রেখে পালিয়ে গেল। ওদিকে গোপ-বধূটি যশোদার বাড়ী গিয়ে বলে—''মাইয়া, একবার আমাদের বাড়ী যাবে চল।'

যশোদা জিজ্ঞাসা করেন—'কেন রে?'

—'তোমার আদরের লালা, আমাদের ঘরে মাখন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আমি তাঁকে থামের সাথে বেঁধে রেখে তোমাকে ডাকতে এসেছি। অন্য গোপীদের কথা শোন আর না শোন, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার গোপালের হাতে এখনও মাখন লেগে আছে—গিয়ে দেখবে চল।'

যশোদা জিজ্ঞাসা করেন,—''চার মাস আগে তোর বিয়ে হয়েছে না? তুই তো সবে নতুন বউ হয়ে এসেছিস। আসতে না আসতেই আমার ছেলের পিছনে লেগেছিস।''

—'মাইয়া, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি না। অন্যেরা হয়তো তোমার কাছে মিথ্যা নালিশ জানাতে আসে কিন্তু আমি মিথ্যা নালিশ নিয়ে আসিনি।

আমার নালিশ যে সত্য তা তুমি আমাদের বাড়ী গেলেই বুঝতে পারবে।'

যশোদা মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা বলছিস যখন চল। পায়ে পায়ে যশোদা নবগোপবধূটির সাথে তাঁর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়ে বলেন,—''দেখা, কোথায় আমার কানাইকে বেঁধে রেখেছিস, আমি নিজের চোখে দেখি।''

কোথায় কানাই! কানাই তখন হাওয়া। বধূটি থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় কানাইকে দেখাতে না পেরে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। যশোদা বলেন,—''কোথায় আমার কানাইকে বেঁধে রেখেছিস দেখা?''

—'এইখানে থামের সাথে তো বাঁধা ছিল। কোথায় যে গেল?'

—'শোন, নতুন বউ হয়ে এসেছিস তাই ভাবতাম, তুই বোধ হয় ভাল মেয়ে—এখন দেখছি তুইও আর পাঁচজনের মত মিথ্যাবাদিনী। যাই তোর শাশুড়ীকে বলে আসি যে তোমার বউটি একটি মিথ্যুক। মিথ্যুক। মিথ্যুক।

—'মাইয়া, বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যা বলিনি। এখানে এই থামটার সাথে কানাইকে বেঁধে রেখে তোমায় ডাকতে গিয়েছিলাম।'

—'বেঁধেই যদি রেখেছিলি, তো আমার লালা গেল কোথায়? ব্রজের গোপীরা মিছামিছি তাঁর নামে নালিশ করতো, এখন দেখছি তুইও তাদের দলে ভীড়েছিস। ব্রজের গোপীদের দেখছি সারাদিন একটাই কাজ, শুধু আমার ছেলের পিছনে লাগা।' যশোদা গোপবধূটিকে মৃদু তিরষ্কার করে নিজের বাড়ী চলে যান।

নতুন গোপবধূটির লজ্জায় মাথা কাটা যায়। সে যশোদার কাছে মিথ্যাবাদিনী প্রতিপন্না হয়। যশোদার কাছে তাঁর মান মর্যাদা বলতে কিছুই অবশেষ রইল না। পরের দিন গোপবধূটি যমুনার জল নিয়ে বাড়ী ফিরছে, পথে দেখা হয়ে যায় কানাইয়ের সঙ্গে। কানাইকে দেখে বধূটি বলে,—'এই নটখট শোন দাঁড়া!' কানাই দাঁড়িয়ে পড়ে। বধূটি জিজ্ঞাসা করল, কাল যে তোকে থামের সাথে বাঁধলাম, পালিয়ে এলি কি করে?' কানাই উত্তর দেয়—''পালাব না তো ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকব, মায়ের পিটুনী খাওয়ার জন্য।''

—আমি যে তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম। বাঁধন খুললি কি করে?

—'তুই বাঁধতেই জানিস না। দড়ি এদিক-ওদিক করে ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেলি মাকে ডাকতে। এমন সহজ করে বেঁধে রাখলে দড়ি জড়িয়ে কখনও কি কাউকে বেঁধে রাখা যায়? তুই বাঁধতেই জানিস না।''

—'কানাই, তুই বুঝি খুব ভাল বাঁধতে জানিস।'

—'হুঁ। আমি যাকে বাঁধি, সে পালাতেই পারে না।'

—'আমাকে তোর মতন 'বাঁধন দেওয়া' শিখিয়ে দিবি?'

—''কেন শেখাবো না, নিশ্চয়ই শেখাব। চল এখুনি তোর বাড়ী গিয়ে তোকে কেমন করে বাঁধতে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছি।''

গোপবধূটি কানাইয়ের কথায় খুশী হয়ে কানাইকে বাড়ীতে নিয়ে এল। জলের কলসীটি যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বলল,—''আমায় বাঁধন শিখিয়ে দে?'' কানাই বলে,—'কালকের সেই রশিটা (দড়ি) নিয়ে আয়।' গোপবধূ রশি নিয়ে এসে কানাইয়ের হাতে দেয়। কানাই রশিটি হাতে নিয়ে বলে—''এবার থামের কাছে দাঁড়া। তারপর দুইহাত যুক্ত কর।'' বধূটি দুইহাত যুক্ত করে দাঁড়ায়। কানাই রশি দিয়ে যুক্ত দুই হাত শক্ত করে বেঁধে পরপর কয়েকটাগ্রন্থি দিয়ে বধূটিকে বলেন 'বুঝলি প্রথমে দুই হাত এমনি করে বেঁধে রশিটাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে চক্কর লাগিয়ে দুইহাতের বাহু কোমর দিয়ে নিয়ে এসে পাদুটো জড়ো করে ফের রশিটার কয়েকটা পাক দিয়ে পরপর কয়েকটা গ্রন্থি দিবি—তারপর রশির বাকী অংশটা থামের চারধারে শরীরের সঙ্গে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে গেরো দিয়ে দিবি।'' বলতে বলতে কানাই গোপবধূটিকে থামের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর বলল, বুঝলি গোপী এইভাবে শক্ত করে বাঁধতে হয়। তোর তো শেখা হয়ে গেল—এখন তাহলে আমি চলি, কেমন?''

—'কোথায় যাচ্ছিস? আমার বাঁধন খুলে দে?'

—দেখ গোপী। তোর সঙ্গে আবার বাঁধন শেখানোর কথা ছিল। বাঁধন খোলা শেখানোর কথা ছিল না। সুতরাং আমি চললাম। কানু গোপবধূটিকে থামের সাথে বেঁধে বাড়ীর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে খিড়কীর দরজা খুলে পালিয়ে গেল। দুপুরের কিছু আগে বধূটিকে বেঁধে রেখে কানাই চলে গিয়েছিল। বেচারা বাকী সারাদিন বন্ধনরতা অবস্থায় কাটায়। তাঁর স্বামী গরু চরাতে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় গরু নিয়ে ফিরে এসে দেখে বাড়ীর দরজা বন্ধ। চীৎকার করে করে বলে—''দরজা বন্ধ রেখেছ কেন খুলে দাও।'' ভেতর দিকে বধূটি বাঁধা অবস্থায় উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলে—''খিড়কীর দরজা দিয়ে এস।''

স্বামী জিজ্ঞাসা করে—''খিড়কীর দরজা দিয়ে যেতে বলছ কেন?''

''আগে এস তারপর বলছি।'' বধূটির স্বামী খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করে দেখে তাঁর বউ থামের সাথে বাঁধা।

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—'কি ব্যাপার? তুমি বাঁধা কেন?'

—বলছি বলছি আগে এক পাত্র জলপান করাও আমাকে।

স্বামী বেচারা জল এনে দেয়। গোপবধূটির জলপান শেষ হলে স্বামী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—'কে তোমাকে বেঁধেছে বললে না তো?'

—আগে আমাকে বাঁধন খুলে মুক্ত কর। তারপর সব বলছি।

স্বামী বাঁধন খুলে দিল। বাঁধন মুক্ত হয়ে বধূটি বলল—''বড্ড গরম, আমায় একটু হাওয়া কর না গো?'' স্বামী পাখা এনে হাওয়া করতে করতে আবার জিজ্ঞাসা করল,—'এবার বল, কে তোমাকে বেঁধেছে?'

বধূটি বলে,—'কেউ আমাকে বাঁধে নি গো।' 'তবে তুমি বাঁধা কেন?' স্বামী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল,

—আমি 'বাঁধন দেওয়া' শিখছিলাম।

'কার কাছে?'

বধূটি বলল—''যশোদার বেটার কাছে।''

বধূর কথা শুনে স্বামী হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে।'' আমি তো তোমাকে ফুলশয্যার রাতেই বলেছিলাম—'যশোদার ঐ লালা থেকে সাবধানে থেকো। যতটা পার ওর থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখ। ও খুব দুষ্টু।''

কিন্তু কানাই যাকে একবার বাঁধে, কার সাধ্য তা থেকে মুক্ত করে? গোপবধূটি চিরদিনের জন্য কানাই-এর স্নেহরজ্জুতে বাঁধা পড়ে গেল।

তপস্বী কৃষ্ণ

দ্বারকার নিভৃত প্রাসাদকক্ষে পালঙ্কোপরি শয়নে আসীন শ্রীকৃষ্ণ। পদপ্রান্তে বসে পদসেবা করছেন মহারানী রুক্মিণী। সেবা করতে করতে তিনি সলজ্জভাবে কৃষ্ণকে বললেন—'আপনি শ্রীচরণে স্থান দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন কিন্তু....!'

কোন কিন্তু না রেখে তুমি যা বলতে চাও নিঃসঙ্কোচে বল। তোমার ইচ্ছা আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো।' শ্রীকৃষ্ণ আস্বাস দিয়ে বলেন রুক্মিণীকে।

—আপনি দেব-দেবেশ্বর। মহান পুরুষোত্তম। আমি চাই আপনার অনুরূপ গুণবান, বীর্যমান, সুন্দর, শাস্ত্রজ্ঞ, সন্তান আমার কোল আলো করুক।'

— দেবী, আমি বুঝেছি, তুমি কি চাও! কিন্তু ঐরূপ পুত্রের জন্যে প্রত্যেক দম্পতির দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করা উচিত। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি কৈলাশ যাব। সেখানে গিয়ে তপস্যা দ্বারা আশুতোষকে সন্তুষ্ট করে পুত্রের জন্য বর চাইব।''

—তুমি পুরুষোত্তম ভগবান সর্বেশ্বর, পুত্রের জন্য তোমাকে আশুতোষের তপস্যা করতে হবে কেন?

—নরলীলার উদ্দেশ্য জীবকে শিক্ষাদান করে কল্যান পথ নির্দেশ করা। ভগবান নররূপে অবতীর্ণ হলে তাঁকে নরের মর্যাদা পালন করতে হয়। তাছাড়া ভগবান আশুতোষ আমারই আত্মা দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বরূপ। জীব কল্যানে তিনি সদা তপোমগ্ন—তাই তাঁর আরাধনা জীব মাত্রেরই কাম্য।'

পরদিন প্রাতে কৃষ্ণ যাদবদের অন্তরঙ্গ রাজসভায় আহ্বান করে বললেন,—''আমি সন্তান প্রাপ্তির জন্য তপস্যার উদ্দেশ্যে কৈলাশ যেতে চাই। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দ্বারকানগরীর একটিমাত্র দ্বার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অন্যান্য দ্বারসমূহ বন্ধ থাকবে। এইসময় নগরের বাইরে শিকারভ্রমণ নিষিদ্ধ। যাঁরা আমার সাক্ষাৎ চাইবে তাঁদের বলবেন, আমি বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি। এখন সাক্ষাৎ হবে না। শত্রুপক্ষের লোকেরা বা বিরোধী নৃপতিরা যেন কোনভাবেই বুঝতে সমর্থ না হয় যে আমি দ্বারকার বাইরে অবস্থান করছি।' বলরাম ও উদ্ধবের উপর বিশেষ ভার অর্পন করে সাত্যকিকে বললেন,—আমার অনুপস্থিতিতে তুমি নগররক্ষার কাজে বিশেষ ধ্যান দিও।''

এইভাবে যোগ্যব্যক্তির উপর উত্তর দায়িত্ব অর্পণ করে ওইদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করলেন। গরুড় উপনীত হতেই তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশে আরোহন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই হিমালয়ের বদ্রীনাথে অবতরণ করলেন। বদ্রীক্ষেত্র নরানারায়নের নিত্য তপোভূমি। উচ্চস্তরের ঋষি, মুনি, তপস্বী, ও সাধকদ্বারা বদ্রীধাম সবসময়ই পূর্ণ থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে আন্তরিক স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন সেখানকার ঋষি-মুনি-তপস্বীরা। তাঁদের সমবেত সাদর অভ্যর্থনা গ্রহন করে স্নান সমাপন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর পূণ্যসলিলা অলকানন্দের উত্তর তটস্থিত নারায়ণ আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তিনি তপস্যায় বসলেন।

তিনি তপস্যায় মগ্ন হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সহসা সেখানে মহাকোলাহল ধ্বনি ভেসে আসে। যেমন —''বন্য শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া কর—শিকার যেন ফস্কে না পালায়—বন্য পশুদের পিছু চিৎকার করতে করতে এগিয়ে চল—পশুদের মার।'' কোলাহলের মধ্যে এইসব চিৎকারধ্বনি কৃষ্ণের কানে ভেসে আসে-তাঁর তপস্যা ভঙ্গ হয়। কোলাহলের মধ্যে তিনি এও শুনলেন—'ভগবান বাসুদেবের জয় হোক! দেবের দেবভক্তবৎসল ভগবান পুরুষোত্তমের জয়! করুণাবরুণালয় জনার্দন ধন্য! তুমি ধন্য!''

কোলাহলের মধ্যে ভেসে আসা ওইসব চীৎকার ধ্বনি শুনে কৃষ্ণ আশ্চর্য্য হলেন। তিনি ভাবলেন এই পবিত্র তীর্থভূমিতে একদিকে যেমন পশু শিকারের ন্যায় ক্রূর কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে

তাঁর জয়ঘোষও উচ্চারিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাণভয়ে ভীত বন্য পশুর দল (বাঘ, সিংহ, হরিণ, খরগোশ) শিকারীদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে কৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত হল। করুণ নয়নে পশুর দল কৃষ্ণের কাছে নির্ভয় শরণ চায়। পশুদের পিছু পিছু আসে শিকারী কুকুরের দল। অসংখ্য জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে কুকুরের পিছু পিছু ভয়ংকর-দর্শনধারী, পিশাচ-পিশাচিনী ভূত প্রেতের দল। এদের মধ্যে কেউ কেউ সদ্যমৃত পশুদের কাঁচা মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। ভীত বন্যপশুরা কৃষ্ণকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভূত পিশাচ-পিশাচিনীর দল সংকুচিত হয়ে ইতস্ততভাবে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান। শ্রীকৃষ্ণ ভাবছেন,—"এখানে তপোধন মুনিঋষিরা রয়েছেন। স্বয়ং আমিও উপস্থিত রয়েছি—এখানে ভূত, প্রেত, পিশাচিনীর দল তৎসত্বেও আসতে সমর্থ হল কি করে? এরা কারা? কিছুক্ষণ পর আরও দুজন ভয়ংকর বিকট দর্শনধারী পিশাচ সেখানে উপস্থিত হল। বিশাল লম্বা দেহ তাদের। শরীরময় পিঙ্গল-বর্ণ রোমরাজি। সারাশরীরে মৃত পশু ও নর-নারীর নাড়ীভূড়ি জড়ানো। হাতে ত্রিশূল, ত্রিশূলের অগ্রভাগে বিদ্ধ নরমুণ্ড। তাদের হা-হা-হি-হি অট্টহাসি ধ্বনিতে তপোভূমি বদ্রীধামে যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে তারা দুজন মৃত শবদেহের মাংস ভক্ষণ ও রক্তপান করছে। রাশি রাশি পশুও মানবের শবদেহ স্নায়ুতন্ত্রে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, মাংসভক্ষণ ও রক্তপান শেষ হলে দুই পিশাচ উদ্দাম নৃত্যসহ সংকীর্তন শুরু করে দেয়—'

জয় নারায়ণ, 'জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ।
জয় ভগবান, বাসুদেব পরমানন্দ।।

কীর্তন করতে করতে দুই পিশাচ কখনও কখনও কেঁদে ওঠে এবং বলে, 'আমরা দুরাচারী অধম পাপী সবসময়ই দুষ্কর্ম করি, হে ভগবান বাসুদেব তুমি কবে আমাদের দর্শন দিয়ে উদ্ধার করবে?' কীর্তন করতে করতে তারা কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে—"আপনি কে? কার পুত্র? কোথা থেকে আসছেন? পর্বতের উপরে ঘোর অরণ্যে আপনি কেন এসেছেন?"

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পরিচয় প্রদান না করে শুধু বললেন—"যদুকুলে আমার জন্ম। আমি এখান থেকে কৈলাশ যাব। বদ্রীধাম পুণ্যতীর্থক্ষেত্র-কৈলাশ যাওয়ার পথে তাই এই স্থান দর্শন করে, এখানে কিছুদিন তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধ ঋষি-মুনি তপস্বীরা এখানে থাকেন। দুষ্ট-অসৎরা এখানে অবস্থান করতে পারে না। আজকের মতো কুকুরের দল নিয়ে তোমাদের মতো মাংসভক্ষণকারীরা কোনদিন এই পবিত্র স্থানে আগমন করেনি। পুণ্যভূমি বদ্রীধামে পশুবধ করা উচিত কর্ম নয়। আমি এই পুণ্যতীর্থের সংরক্ষক। তোমরা দুজন কে? কোথায় থাক, এই বিশাল ভূত পিশাচ সৈন্য কার? তোমরা আর একপাও অগ্রসর না হয়ে এখান থেকে ফিরে যাও। তোমাদের উন্মত্ত কোলাহলে ঋষিমুনিদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটবে। সুতরাং তোমরা এই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ কর।"

ভয়ংকর দর্শনাকার বিশিষ্ট দুই পিশাচের মধ্যে একজন কৃষ্ণের কথা শোনার পর বলল,—'আপনি হয়তো আমাদের নাম শুনে থাকবেন। আমি ঘণ্টাকর্ণ নামক প্রসিদ্ধ পিশাচ। মহেশ্বরের অনুচর। ধনাধিপতি কুবেরের সখা। আর একজন যাকে আমারই মতো দেখছেন—ও হল কালের ও কাল আমার ছোটভাই। কোনও স্থান আমাদের অগম্য নয়। ভূত পিশাচ সেনার দল আমারই, কুকুরও আমার। ভগবান বাসুদেব নারায়ণের জন্য আমি শিকার সংগ্রহে বের হয়েছি।' কৃষ্ণ সকাশে পিশাচ আপনার পরিচয় প্রদান করল। "ভগবান বাসুদেব নারায়ণের অর্চনা তোমরা কেন করতে চাও? তোমার উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত কর আমার কাছে, "কৃষ্ণ অগ্রজ পিশাচকে জিজ্ঞাসা করলেন। পিশাচ উত্তরে বলল, "আপনার গন্তব্যস্থল যে কৈলাশভূমি, আমি দলবল নিয়ে সেখান থেকেই এসেছি। একসময় আমি বিষ্ণু নারায়ণের ভীষণ নিন্দুক ছিলাম। দুই কানের উপরে ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতাম-যাতে বিষ্ণুনাম আমার কানে প্রবেশ না করে। আমি নৈষ্ঠিক শিবভক্ত ছিলাম। কৈলাশে আমি ভগবান আশুতোষের আরাধনা করতাম। মঙ্গলময় আশুতোষ আমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে বর দিতে চাইলেন। আমি বললাম,—'হে ভূতনাথ, তুমি আমায় মুক্তি দাও। আশুতোষ আমার বর প্রার্থনা শুনে সন্তুষ্টচিত্তে বললেন—"মুক্তি তোমায় দিতে পারতাম কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমার আরাধ্য ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণু

নারায়ণের প্রতিদ্বেষ জমে আছে। অতএব তুমি নর-নারায়নের ক্ষেত্র বদ্রীধামে যাও এবং ঐখানেই জনার্দন বাসুদেবের তপস্যা করে তাঁর কাছ থেকে 'মুক্তির' বরপ্রাপ্ত হও। দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে আমি এখানে এসেছি। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন—পশ্চিম সমুদ্রের তটস্থিত সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নগরীতে এই সময় শ্রী বিষ্ণু নারায়ন কৃষ্ণনামে গার্হস্থ্য লীলারস আস্বাদনকরত অবস্থান করছেন। আমি আমার অনুচরদের নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে দ্বারকায় যাচ্ছি। আপনিও ইচ্ছা হলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। কারন বিষ্ণু নারায়ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার পরিচয় পেয়ে জানলাম আপনিও যদুবংশী এতদকারণে আপনিও আমাদের পরম সম্মানীয়। অর্ধেক রাত্রি অতিক্রান্ত প্রায়। এইসময় আমরা (ভূত-পিশাচরা) আরাধনা করি। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে দ্বারকায় যেতে সম্মত না হন তাহলে যেখানে আপনার অভিরুচি, আপনি সেইস্থানের উদ্দেশ্য গমন করুন। আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কোন ভয়ের কারণ নেই।

শিবসেবকের পক্ষে কোন তপোবন বা পুণ্যভূমি অগম্য নয়। মানুষ, পশু সবার ক্ষেত্রে ওরা ভয়ংকর ত্রাসসঞ্চারকারী। কিন্তু ওদের বিষ্ণু ভক্তি নিষ্ঠা? ভক্তি তো কখনও কুল, আচার-বিচার-আহার কর্ম দেখে না। যে কোন হৃদয়ে ভক্তি যখন-তখন প্রকট হতে পারে। ভক্তি যদি একবার হৃদয়ে প্রকট হয় তাহলে কি কৃষ্ণ দূরে থাকতে পারে? যে হৃদয়ে ভক্তি প্রকট হয় সেখানে না এসে কি তিনি থাকতে পারেন! পিশাচকে কৃপা করবেন বলেই তিনি কি পুত্রের জন্য শিবের তপস্যা করা উচিত এই অজুহাতে বদ্রীধামে উপনীত হয়েছেন? সেই ভগবানই বা কেমন যে পিশাচের প্রতি প্রসন্ন হয় না? তাকে আপনার করে নিজের কাছে টেনে নেয় না? পিশাচ কি ভগবানের সৃষ্টির বাইরে?

'স্বধর্মম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য'—পিশাচের ধর্মে স্থিত হয়েই ঘণ্টাকর্ণ স্বধর্ম পালন করছে। উপরের কথাগুলি কৃষ্ণের করুণারসপূর্ণ হৃদয়ে জলবিন্দুর মত ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। তিনি কোথাও না গিয়ে এইখানেই শান্ত হয়ে বসে রইলেন। পিশাচ আপন ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী আরাধনায় মগ্ন হল। খালি পেটে আরাধনা করা পিশাচের পক্ষে সম্ভব নয়। আকণ্ঠ রক্তপান ও মাংস ভোজন করে নাড়ীভূঁড়ি পাশে রেখে সে পশু চর্মের আসন বিছিয়ে উপবেশন করে, আচমন করে। কুকুরের দলকে দূরে সরিয়ে দেয় তারপর আসলে উপবিষ্ট হয়ে যুগলনেত্র বন্ধ করে স্তুতি করে—"হে আরাধ্য ভগবান বাসুদেব, আমার মন প্রতিক্ষণ তোমার শ্রীপাদপদ্মের অনুধ্যান করে। আমার মনের সমস্ত পাপ তাপ-মালিন্য তুমি নষ্ট করে দাও। তোমার চরণে আমার ভক্তি অচল হোক। অধম পিশাচ ঘণ্টাকর্ণকে তুমি কৃপা করো-দয়াময়। কৃপা কর"....স্তুতি করতে করতে ঘন্টাকর্ণের কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। নেত্র দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকে। শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ভগবান বাসুদেবের ধ্যান স্তুতি করতে করতে সে সমাধিস্থ হয়ে পড়ে। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির। শ্বাসে শ্বাসে প্রণবসহ বাসুদেব মন্ত্রের মানসিক জপ চলতে চলতে প্রাণ স্থির হয়ে যায়। ভগবান পিশাচের হৃদয়ে আজ চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকট হন।

পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের সমাধিভঙ্গ হয়। নয়ন মেলে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখে আনন্দে নৃত্য করতে করতে সে বলে, "এই তো আমার সন্মুখে ইষ্টদেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাকে কৃপার অমৃতধারায় স্নান করানোর জন্য। হে ভক্তবৎসল, করুণার অনন্ত পারাবার-আপনিই আমার হৃদয়ে চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকট হয়েছিলেন, আমি আপনাকে চিনেছি প্রভু। আপনি এই অধমাধম ঘণ্টাকর্ণকে করুণা করবে বলেই এখানে এসেছেন।'

আনন্দে উল্লসিত হয়ে নৃত্যের তালে তালে সংকীর্তন করতে করতে পিশাচ ঘণ্টকর্ণ কৃষ্ণচরণে লুটিয়ে পড়ল। কৃষ্ণ পিশাচকে চরণ থেকে তুলে বুকে চেপে ধরেন এবং মধুরাতিমধুর আলিঙ্গন দ্বারা তাঁকে কৃতকৃতার্থ করেন। পিশাচআলিঙ্গনমুক্ত হয়ে আনীত শবদেহের মধ্য হতে একখানি বিশেষ শবদেহ কর্তন করে তা থেকে কিছুটা মাংসখণ্ড একটি ধৌত তরুপত্রে স্থাপন করে কৃষ্ণের সম্মুখস্থিত ভূমিতে নিবেদন করে বলল, "হে আমার প্রাণপ্রিয় প্রভু, পবিত্র সংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শবদেহের মাংস সংগ্রহ করা পিশাচদের পক্ষে

বড়ই দুর্লভ। এরূপ মাংস পিশাচদের উত্তম আহার রূপে গণ্য হয়। আমি সেই পবিত্র মাংস আপনার সম্মুখে নিবেদন করেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন।

"যদন্নং পুরুষোভবতি তদন্নং তস্য দেবতা।" যে অন্ন সাধকের নিজের প্রিয়, সেই অন্নই সে আপন ইষ্টদেবকে নিবেদন করে। আমি অধম পিশাচ। ভক্তি-আচার বিচারের শুদ্ধতা আমার জানা নেই। উন্নত-পবিত্র-সাধন মার্গের পথিকও নই। হে প্রভু, দয়া করে নিজগুনে আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে নৈবেদ্য গ্রহণ করুন।"

কৃষ্ণ বললেন,—'ঘণ্টাকর্ণ, যে ভোগ তুমি আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করেছ—তা আমার স্পর্শ করার যোগ্য নয়। তুমি ওই ব্রাহ্মণের শবদেহ আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাঁকে পুর্নজীবন দান করব'।

ঘণ্টাকর্ণ ব্রাহ্মণের শবদেহ কাছে আনতেই কৃষ্ণ অমৃতদৃষ্টিদানে সেই প্রাণহীন দেহে প্রাণসঞ্চার করলেন। ব্রাহ্মণ সুস্থ শরীরে নবজীবন লাভ করলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে কৃষ্ণ বললেন,—'হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আপনার মঙ্গল হোক। তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের উচিত নয় তপস্যা থেকে বিরত হয়ে তমোগুণের আশ্রয় করা। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের কথাশুনে নত শিরে লজ্জাবশত হয়ে ভূমিপরে বিরাজিত কৃষ্ণচরণকমলে মনে মনে প্রণাম জানান। কৃষ্ণকৃপায় তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আসনে উপবেশন করে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে যান। সেই কারণে পিশাচের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞ চিত্তে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আর একবার মনে মনে প্রণাম জানিয়ে সেইস্থান ত্যাগ করে চলে যায় আপন গন্তব্যস্থলে।

ব্রাহ্মণ চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণ ঘণ্টাকর্ণের শরীরে আপন অভয়বরদ হস্ত কমল স্থাপন করে বললেন,—'আমি তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন হয়েছি।' কৃষ্ণের করকমলের স্পর্শ পেতেই ঘণ্টাকর্ণের শরীর পরিবর্তন হয়ে যায়। সুন্দর সুকুমার কুঞ্চিত কেশদাম কমল নয়নযুক্ত যেন আর এক কৃষ্ণ সেখানে পিশাচের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর রূপ কৃষ্ণ রূপেরই প্রতিরূপ। পিশাচ পরমগতি প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধ দেহ লাভ করল। কৃষ্ণ সদ্য সিদ্ধ দেহলাভকারীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'তুমি এখন স্বর্গধামে গিয়ে অবস্থান কর। তোমার ভাই ও অন্যান্য অনুচর সবাই স্বর্গধামে তোমার সঙ্গেই থাকবে। বর্তমান ইন্দ্রের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তুমি ও তোমার ভাইসহ সমস্ত অনুচরের দল আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে। এছাড়া তোমার যদি আর কোন প্রার্থনা থাকে, তবে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কর, আমি তা পূরণ করব।' সদ্য সদ্য সিদ্ধদেহধারী ঘণ্টাকর্ণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন,—'হে পরমপুরুষ, আপনার চরণে যেন আমার অচল ভক্তি থাকে। এই অধম পিশাচকে আপনি যে অনুগ্রহ করলেন তা আপনার পক্ষেই সম্ভব। হে সর্বাভীষ্ট পূর্ণকারী পতিতপাবন আমায় এই বর দিন—যাঁরা আমার প্রতি আপনার এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রসঙ্গকে শ্রবণ-স্মরণ-চিন্তন করবে তাদের অন্তরের সমস্ত পাপ যেন নষ্ট হয়ে যায়। অন্তিমে তাঁরাও সকলে যেন আপনার চরণে ভক্তি লাভ করে ধন্য হয়।'

মেঘগম্ভীর স্বরে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বললেন—"এবমস্তু'! 'তাই হবে। কল্যাণীয়, এখন তোমরা দুইভাই অনুচরসহ স্বর্গে গমন কর। ওই দেখ দূরে পুষ্পবিমান নিয়ে দেবেন্দ্র তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে? দুইভাই অনুচরসহ কৃষ্ণচরণে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে পুষ্পবিমানে আরোহন করল।

ঘণ্টাকর্ণকে অনুগ্রহ করে কৃষ্ণচন্দ্র রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তের মধ্যে নারায়ণ আশ্রমে ফিরে এলেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে স্থানীয় মুনিঋষিদের শ্রীপাদ বন্দনা করে গরুড় আসনে আরোহণ করলেন। অন্তরীক্ষ পথে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কৈলাশের নিকটবর্তী মানসসরোবরের উত্তরতটে অবতরণ করলেন। অতঃপর শুরু করলেন তপস্যা।

প্রতিদিন মানস সরোবরে স্নান, জটা ও চীরবস্ত্র (অর্থাৎ কৌপীনমাত্র) ধারণ এবং শাকাহার গ্রহণ করে ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষ থেকে তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। গরুড় সাথেই থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সব অস্ত্রশস্ত্রও সেখানে মূর্তিমান হয়ে তাঁর সেবায় তৎপর হয়। গরুড় হোমের জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু হিমালয়ের ঐ অংশ বারমাস বরফাচ্ছাদিত থাকার ফলে বৃক্ষ জন্মায় না—এখানে ওখানে দু'চারটে কণ্টকময় গুল্মলতা দৃশ্য হয় এবং কাঁচা অবস্থাতেই অগ্নিসংযোগে জ্বলতে থাকে। তাতে সমিধের কাজ

(হোমের কাঠের) সম্পন্ন হবে না। তাই মনোবেগ সম্পন্ন বিনতানন্দন হিমালয়ের ওই স্থান থেকে দূরে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হোমের জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আনেন। সুদর্শন চক্র আরাধনার জন্য প্রতিদিন পুষ্পচয়ন করে প্রভু কৃষ্ণের সেবা করে, কিন্তু ঐস্থানে সুগন্ধি পুষ্প না থাকায় তাঁকেও দূর থেকে গরুড়ের মতো পুষ্প সংগ্রহ করে আনতে হয়। কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ তপস্যায় পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে, শঙ্খ পাঞ্চজন্য রক্ষা কার্যে নিযুক্ত থাকলেও সে কিন্তু কাউকে আঘাত করে না। কৈলাস ভূমি শিবক্ষেত্র। কাজেই শিবের অনুচর ভূত-প্রেতের দল সেখানে বিচরণ করবেই। কিন্তু শঙ্খধ্বনি তাদের সহ্য হয় না। পাঞ্জজন্য তাই ধ্বনি দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করে। ধ্বনি শুনে ভূত প্রেতরাও সেখানে যেতে সাহসী হয় না।

কৈলাশে কুশ দুর্লভ। সমগ্র হিমালয়ে কোথাও কুশ দেখা যায় না। তাই কৃষ্ণের খড়গ নন্দক প্রতিদিন নবীন দূরের সমতল ভূমি হতে কুশ সংগ্রহ করে আনে। কুশ ছাড়া যে আর্য ভারতের উপাসনা কিছুতেই সম্ভব নয় —এটা সে ভাল করে জানে। শ্রীকৃষ্ণ আহারের জন্য নিকট হতে সামান্য কিছু শাকসংগ্রহ করে নেন। ত্রিসন্ধ্যা মানস সরোবরে স্নান করেন। জপ-তপ-রুদ্রাষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করেন। প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত কাষ্ঠ আহুতি দেন। সর্বলোকশ্বরেশ্বর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক কৃষ্ণের তপস্যার কি প্রয়োজন? বিশ্বের সন্মুখে আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁর এই লীলা নাটক রচনা।

কামসুখের দ্বারা প্রাপ্ত সন্তান কখনও সদগুণের অধিকারী হয় না। কুলের মান মর্যাদা যশ গৌরব বৃদ্ধি করবে যে সন্তান তাঁর জন্য বিশ্বের প্রতিটি দম্পতির তপস্যা করা প্রয়োজন। সন্তান-সন্ততি যদি কামবাসনা চরিতার্থতার পরিণতি হয় তবে সেই সন্তান-সন্ততি কখনও উচ্চস্তরের হয় না এবং মহান হৃদয়ের অধিকারী হয় না। সন্তান-সন্ততি সৃষ্টির মূলে যদি সংযম তপস্যা থাকে তবে জগৎ সংসারে জীবের কল্যাণ হয়। উত্তম সন্তানের জন্য ভগবান শিবের আরাধনা করা কৃষ্ণের কি প্রয়োজন? শঙ্কর কি কৃষ্ণ থেকে আলাদা? গীতার দশম অধ্যায়ে 'বিভূতি যোগে' তিনি নিজমুখে অর্জুনকে বলেছেন—''রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাসিম''—অর্থাৎ একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর। তিনি ইচ্ছা করলে শিব স্বয়ং দ্বারকায় গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারতেন। দ্বারকায় গার্হস্থ্য লীলারসে মর্যাদা তা তিনি লঙ্ঘন করতে চান না, তাই এসেছেন লোক শিক্ষার্থে কৈলাশে তপস্যা করতে।

লীলাময় কৃষ্ণের যতক্ষণ তপস্যা করার অভিরুচি ছিল ততক্ষণ তপস্যা করতে থাকেন। তপস্যার অন্তে হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতেই ভগবান আশুতোষ উৎসুক হয়ে উঠলেন কৃষ্ণদরশনের জন্য। পূর্ণাহুতি অনুষ্ঠান সমাপ্তির পূর্বেই তিনি (মহাদেব) বৃষবাহনে আরূঢ় হয়ে কৃষ্ণের সন্মুখে আবির্ভূত হলেন। মহেশ্বরের পিছু পিছু ভূতাদিগণও সেখানে উপনীত হলেন। আপন পার্যদদের সঙ্গে সমবেত স্বরে তিনি জয়ঘোষ করে বললেন —''হে জনার্দন, আপনার জয় হোক।'' শ্রীকৃষ্ণ শিবকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম জানালেন। শিব বৃষবাহন থেকে অবতরণ করে কৃষ্ণকে বক্ষসংলগ্ন করলেন। দুজনা দুজনার দিকে চেয়ে অশ্রুবর্ষণ করেন। উভয়ের দিব্যশরীরের রোমে রোমে অপূর্ব আনন্দের অভিব্যক্তি। শিবের অনুচররা উভয়ের অদ্ভুত মিলন দৃশ্য সানন্দে উপভোগ করেন। ইতিমধ্যে অন্তরীক্ষপথে দেবগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে এই অনুপম দৃশ্য দর্শন করতে থাকেন। শিব-কৃষ্ণ দুজনেই পৃথক পৃথকভাবে দু'জনের উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি করেন। অবশেষে ভূতনাথ শঙ্কর অভিযোগের স্বরে বললেন—'হে পুরুষোত্তম, আপনি তপস্যারত হয়েছেন কেন?'

কৃষ্ণ বললেন, 'দেবী রুক্মিণী আপনার অনুগ্রহে পুত্রবতী হতে চান।'

শিব বললেন,—'কামদেবকে আমি একদা ভস্ম করে অনঙ্গ করে দিয়েছিলাম। তৎপত্নী রতি ক্রন্দনরতা অবস্থায় আমার কাছে স্বামীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করলে আমি বরদান করেছিলাম, তাঁর পতি কামদেব বৈবস্বত মন্বন্তরে আঠাশতম দ্বাপরের অন্তে বাসুদেবের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আপনি আমার বরদানের বাণীকে সত্য করার জন্য তপস্যাকে নিমিত্ত করে আমায় কৃপা করার জন্য এখানে পদার্পণ করেছেন। কামদেব আপনার জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।'' শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বরকে আর একবার প্রণিপাত করলেন। কৃষ্ণকে হৃদয়ে সংলগ্ন করে মহেশ্বর বললেন—''এখন আপনি দ্বারকায় ফিরে যান। আপনার দিব্যাঙ্গে

পীতাম্বরই শোভা পায়। চীরবস্ত্র বা কৌপীনখানি অঙ্গ থেকে খুলে আপনার প্রিয় ভোলানাথের জন্য রেখে যান।"

শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্যুহাস্যে শিবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে গরুড়াসনে সমাসীন হয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

দর্পচূর্ণ

দর্পকারীর দর্পনাশক শ্রীমধুসূদন। আশ্রিত ভক্তের অন্তরে বিন্দুমাত্র দর্প বা অভিমানের সঞ্চার হলে তিনি তা নাশ করে ভক্তের কল্যাণ বিধান করেন। তৎআশ্রিত গরুড়, সুদর্শন চক্র এবং সত্যভামার মনে অহংকার দেখা দেয়। গরুড় ভাবে—আমি বিশ্বম্ভর কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করি অতএব আমার চেয়ে বলবান ত্রিভুবনে কেউ নেই। সুদর্শন চক্রের গর্ব, সে কৃষ্ণের হাতে শোভা পায়। কত শত্রু নাশ করে তাঁর মতো অমোঘ ও সুন্দর অস্ত্র বিশ্বজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। সত্যভামা ভাবেন—কৃষ্ণ মহিষীদের মধ্যে আমি সবচেয়ে সুন্দরী, তাই প্রভু আমার মনোরঞ্জনের জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকেন। আশ্রিত তিনজনের হৃদয় হতে গর্ব রূপ মল নাশ করার জন্য লীলানাট্যকার নতুন নাটকরচনায় মনোনিবেশ করলেন।

একদিন গরুড়কে ডেকে বললেন—'হে খগরাজ, তুমি একবার গন্ধমাদন পর্বতে যাও। ওখানে পবনপুত্র হনুমান বিরাজ করছেন। তুমি তাঁকে দ্বারকায় আহ্বান করে নিয়ে এস। মারুতিকে বলবে, তাঁর আরাধ্য দেব তাঁকে দ্বারকায় আসার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

গরুড় যথাদেশ বলে গন্ধমাদনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। গরুড় চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণ সুদর্শনচক্রকে বললেন—'দ্বারে পাহারা দাও। কেউ যেন কিছুতেই ভেতরে প্রবেশ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে না পারে। আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাউকেই ভেতরে প্রবেশ করতে দেবে না। সুদর্শন বলল,—'যে আজ্ঞে প্রভু।'

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বললেন, 'অন্দরে গিয়ে রুক্মিণীকে বল সে যেন এখনই সীতারূপ ধারণ করে আমার কাছে এসে পাশের সিংহাসনটিতে বসে। আমি পবনপুত্র হনুমানকে আনতে গরুড়কে গন্ধমাদন পর্বতে প্রেরণ করেছি। ওর সম্মুখে আমাকে শ্রীরামেররূপ ধারণ করতে হবে।'

—হে প্রিয়তম, এর জন্য রুক্মিণীকে বলার কী প্রয়োজন। আমি কি সীতার চেয়ে কম সুন্দরী? সে যুগের আরাধ্যা অথবা মিথিলার মহিলাদের মতো বস্ত্র অলংকার পরিবর্তন করলেই তো হবে। এরজন্য আপনি অনর্থক চিন্তা করবেন না। আমি এখনই বস্ত্র অলংকার বদলে সীতারূপ ধারণ করে আপনার পার্শ্বস্থিত স্বর্ণসিংহাসনটি অলংকৃত করছি।

শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন,—'আমি যা বলার বলেছি, এখন প্রিয়তমে, তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।'

ওদিকে গরুড় গন্ধমাদন পর্বতের উপরে অবতরণ করে দেখাল, হনুমানজী রাম-নাম কীর্তনে তন্ময় হয়ে ভজন করছে—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম।' গরুড় হনুমানজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল,—'নমস্তে রাম! রামজী।' গরুড়ের কণ্ঠস্বর শুনে কীর্তন থামিয়ে হনুমানজী জিজ্ঞাসা করেন, —'বিনতানন্দন, আপনি এখানে! কী সমাচার?'

—আপনাকে দ্বারকায় যেতে হবে।'

—কেন?

—আপনার আরাধ্য আপনাকে ডেকেছেন।

—ঠিক আছে, আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

—আপনি আমার পিঠে আরোহন করে বসুন। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ আছে।' গরুড় বলল হনুমানজীকে।

—আমার কোন সময় বাহনের প্রয়োজন হয় না। আপনি চলতে থাকুন, দেখবেন আপনার আগেই আমি দ্বারকায় পৌঁছে গেছি।

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বিনতানন্দের গতিবেগ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই। আপনি কি জানেন, আমার গতি শক্তি আপনার পিতা পবনদেব অপেক্ষা অনেক বেশী। ত্রিভুবনে আমার গতিবেগ তুলনাহীন।

—হে খগরাজ, আমি ওসব জানতে চাই না, জানার স্পৃহাও নাই। আপনি গমনোদ্যত হন। আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

—আপনি যদি আমার পৃষ্ঠে আরোহন করে দ্বারকায় না যান, তাহলে আমি বাধ্য হব শক্তিপ্রয়োগ করে আপনাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে। মনে রাখবেন আমার গতির সমান আমার শক্তিও অতুলনীয়। সুর-অসুর সকলের মিলিত পরাক্রম আমার পরাক্রমের সামনে সর্ষপতুল্য। আসুন, অনর্থক বাক্য ব্যয় না করে আমার পিঠে এসে উঠে বসুন।' গর্বদৃপ্তকণ্ঠে হনুমানকে এতসব কথা বললেন গরুড়জী।

—'ও আচ্ছা এই কথা।'

প্রকৃত ভক্ত বা সেবকের প্রভুর মনের অভিপ্রায় কী তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। গরুড়-এর আস্ফালন দেখে হনুমান বুঝতে পারলেন যে তাঁর লীলাময় কৌতুকীপ্রভু কেন গরুড়কে তাঁর কাছে প্রেরণ করেছেন। তিনি গরুড়কেলাঙ্গুল (লেজ) দিয়ে জড়িয়ে ধরে দ্বারকার নিকটস্থ সমুদ্র-গর্ভে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। এত জোরে নিক্ষেপ করলেন যে গরুড়জী ডুবতে ডুবতে সমুদ্রের গভীর তলদেশে পৌছে গেলেন। অতঃপর একলাফে দ্বারকার বহির্দ্বারে পৌছে গেলেন পবনপুত্র বীরহনুমান। ভেতরে ঢুকতেই বাধা দিল সুদর্শন চক্র। হনুমানজীর প্রবেশ পথ অবরোধ করে সুদর্শন চক্র বলল, 'এখন কারও ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নাই।'

হনুমানজী বললেন—'ত্রেতাযুগে দশানন রাবণকে পরাজিত করে প্রভু যখন অযোধ্যায় এসে সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন আমাকে বলেছিলেন—''মারুতি সর্বযুগে তোমার জন্য আমার অন্তঃপুরের দ্বার খোলা থাকবে। আমার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের জন্য কেউ তোমাকে কোন সময় বাধা দেবে না।''

হনুমানের কথা শুনে সুদর্শনচক্র বিকৃত মুখভঙ্গী করে রোষদৃপ্ত কণ্ঠে বলল,—'ত্রেতাযুগে কোন বানরকে প্রভু অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন এবং আমাকে তা মানতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। যাও ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা না করে, এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়।'

হনুমান গরুড়ের সঙ্গে দেখা হতেই বুঝতে পেরেছিলেন প্রভু আজ কী নাটক করতে চান। যিনি জন্মলগ্নে উদিত সূর্যকে পাকাফল মনে করে মুখের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সুদর্শনচক্রের রোষ-কষায়িত নেত্র অগ্নির জ্বালা তাঁর কি ক্ষতি করবে? সুদর্শনচক্রকে তিনি টুক করে তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে বামগালে চেপে রাখলেন। অতঃপর অন্দর মহলে প্রবেশ করে দেখলেন—আজানু লম্বিত, করে ধনু শোভিত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রামচন্দ্র হয়ে সিংহাসনে বিরাজ করছেন। হনুমানজী রামরূপী কৃষ্ণকে সাভূমিনত হয়ে প্রণাম জানালেন। প্রণামান্তে বীরাসনে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে নত মস্তকে প্রভুর চরণের নিকটে বসলেন। নতমস্তকে প্রভুর চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন—'দীন সেবকের একটি নিবেদন আছে।'—

—'কী নিবেদন, বল মারুতি। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন।'

—''আপনার দর্শন হল কিন্তু মা জানকীর তো দর্শন হল না। তিনি কোথায়? হে সর্বসমর্থ প্রভু আপনার পাশের সিংহাসনটি বুঝি কোন গৃহদাসীকে কোন সুকর্মের জন্য পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেছেন।'' হনুমানের মুখে এই কথা শুনে লজ্জায় পাশের সিংহাসনে সমাসীনা সত্যভামার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সিংহাসন ত্যাগ করে রুক্মিণীর কক্ষে উপনীতা হয়ে বললেন—'দিদি, তুমি প্রভুর পাশের সিংহাসনটিতে তাড়াতাড়ি গিয়ে উপবেশন কর। তোমার বানরপুত্র এসেছে। অন্য সব মহিলাদের ও দাসী-সেবিকা মনে করে।' বলতে বলতে সত্যভামাজী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

—'বানরপুত্র! ওহো! হনুমান এসেছে। আমার মারুতি এসেছে।' রুক্মিণীজী শোনামাত্র বাৎসল্যভাবে এমন বিভোর হয়ে ছুটে গেলেন, যে ক্রন্দনরতা সত্যভামার কথা তিনি ভুলেই গেলেন। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন

সে অবস্থাতেই চলে এলেন প্রভুর কাছে। প্রভুর নিকটে এসে পাশের সিংহাসনে উপবেশন করতেই হনুমানজী পুনঃ উঠে গিয়ে চরণে মস্তক রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার সব কুশল তো?'

—সব কুশল। পুত্র তোমার সব কুশল তো? অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

—মাতা, পুত্রের প্রতি সদা কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।

কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সহসা জিজ্ঞাসা করেন—''মারুতি এখানে আসতে তোমার কোন অসুবিধা হয় নি তো?''

হনুমান বললেন,—'হ্যাঁ, আপনার কক্ষের প্রবেশের পূর্বে বাচ্চাদের এই খেলনাটা আমি দ্বার পথে প্রাপ্ত হই—মনে হয় এটা আপনার প্রাসাদের কোন শিশুপুত্রের ক্রীড়ার বস্তু-বলতে বলতে হনুমানজী মুখ থেকে সুদর্শনচক্র বের করে দিলেন। অতঃপর হনুমানজী সুদর্শনচক্রকে লক্ষ্য করে বলেন—''এর বোধ হয় জানা নাই, আপনার শ্রীচরণে পৌঁছানোর অবাধ অনুমতি আপনি অনেক আগেই আমাকে দিয়ে রেখেছেন।''

ইতিমধ্যে সমুদ্রের গভীর থেকে উত্থিত হয়ে সিক্ত বসনে ক্লান্ত শরীরে বিনতানন্দন গরুড় সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে লক্ষ্য করে মারুতি বললেন—'হে প্রভু বিশ্বম্ভরদেব, আপনি মূষিকের মতো ক্ষুদ্র এই পাখীটিকে কেন আপনার বাহন করেছেন? আপনার অযাচিত করুণায় ও ধৃষ্ট হয়ে উঠেছে। যদি কখনও আপনার কোথাও শীঘ্র গমনের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই এই দীন অধম সেবক মারুতিকে স্মরণ করবেন।'

—'মারুতি তোমার মনে পড়ে? বনবাসের সময় আমরা দুই ভাই (রাম-লক্ষ্মণ) তোমার কাঁধে চেপে বেড়াতাম। এখন আমি রাজধানী দ্বারকায় অবস্থান করছি। এখানে পুত্র কারও বাহন হোক, এটা তোমার জানকী মা চায় না—'বলে কৃষ্ণ জানকীরূপা রুক্মিণীর দিকে মৃদুহাস্যসহ দৃষ্টিপাত করলেন। রুক্মিণী বললেন—'হনুমান, অনেকদিন ধরে তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল।

—নিজের স্নেহভাজন পুত্রকে দেখার ইচ্ছা তো বাৎসল্যময়ী জননীর পক্ষে স্বাভাবিক মা। আমায় কেন ডেকেছেন একথা জিজ্ঞাসা করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

—'মারুতি, আজ তুমি এখানে প্রসাদ গ্রহণ করে যাবে'।

মায়ের হাতের মমতা মাখানো প্রসাদে মারুতির কখনো অরুচি হয় না। অতঃপর মারুতিকে নিয়ে রুক্মিণীজি রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনে বসে পর্যায়ক্রমে সত্যভামা, সুদর্শনচক্র ও গরুড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সকলেই লজ্জায় অধোবদন হয়ে হৃদয়ে অনুভব করলেন—আমাদের মতো আশ্রিত জীবের দর্প হরণ করে প্রভু আমাদের কল্যাণ সাধন করলেন।'

প্রেমের আদর্শ গোপী

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অন্দরমহলে স্বর্ণপালঙ্কে পট্টমহিষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বার্তালাপ করছেন। কথায় কথায় রাধা ও গোপীদের প্রসঙ্গ উঠতেই কৃষ্ণের কমল নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি গদগদ স্বরে পট্টমহিষীদের দিকে চেয়ে বললেন,—''গোপীরা জন্মজাত সন্ন্যাসী। সংসারে যাঁরা সাধুসন্নাসী হয় তাঁরা শুধু বস্ত্রের রঙ পরিবর্তন করে সাধুসন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে। কিন্তু আমার রাধাসহ ব্রজগোপীরা শরীর-মন-প্রাণরূপ বস্ত্রকে আমারই প্রেমের রঙে রাঙিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। রাধা আমার রাধা—শুধু প্রেম দিয়ে তৈরী। আমার সুখে সুখী হওয়াই গোপীদের একমাত্র কাম্য''—বলতে বলতে কৃষ্ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি শয্যায় বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। কৃষ্ণের দশা দেখে পট্টমহিষীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। মনে মনে ভাবেন—'আমাদের সেবায় কী এমন ত্রুটি আছে যা প্রভুর পূর্ণ চিত্ত বিনোদনে সমর্থা নয়? রাধাসহ ব্রজগোপীদের সেবায় এমন কী মহৎ গুণ আছে—যাঁদের কথার প্রসঙ্গ উঠতেই প্রভু ভাবাবেশে তন্ময় হয়ে যান? যখনই কথায় কথায় রাধা গোপীদের প্রসঙ্গ ওঠে তখনই প্রভুর দুনয়ন কেন অশ্রুতে ভরে যায়? আমাদের কী এমন নেই যা রাধা, ব্রজগোপীদের আছে? রাধা-গোপীরা তো ব্রজের সামান্যা-গোয়ালিনী? তাঁদের প্রতি প্রভুর এত দূর্বলতা কেন? দ্বারকার পট্টমহিষী রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, ভদ্রা, মিত্রবিন্দা, সত্যা ও লক্ষণার মনে অভিমান বা অহংকার প্রবল হয়ে ওঠে। প্রভুর প্রতি তাঁদের প্রেম রাধা ও ব্রজগোপীদের চেয়ে অনেক বেশী। তবু প্রভুর দূর্বলতা কেন ঐ গোপীদের প্রতি?’ শয্যায় শায়িত কৃষ্ণ সহসা আর্তনাদ করতে থাকেন মহিষীদের ভাবনায় বিরতি পড়ে। তাঁরা ব্যাকুল হয়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন,—'প্রিয়তম, আপনার কি হয়েছে? এমন আর্তনাদ করছেন কেন?' কৃষ্ণ ব্যথা-কাতর স্বরে বললেন, —'মাথায় আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, উঃ মরে গেলাম! আর সহ্য করতে পারছি না। অবিলম্বে বৈদ্যকে সংবাদ দাও? মহিষীরা শ্রীকৃষ্ণের শিরঃপীড়া হচ্ছে শুনে চিন্তান্বিতা হয়ে পড়লেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। মহিষীরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের শিরঃপীড়ার কথা জানাতেই, তিনি (নারদ) ভাবলেন—''শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় শরীরে রোগ? নিশ্চয়ই রোগের অজুহাতে প্রভু কোন নতুন লীলা নাটকের সূচনা করতে চলেছেন। নিজের ভাবনা গোপন করে তিনি শয্যায় কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন,—'দ্বারকায় কি কোন কুশল বৈদ্য নেই? আমি কি অশ্বিনীকুমারদের আহ্বান করে আনবো?'

—'নারদজী, প্রয়োজন বৈদ্যের নয়, প্রয়োজন ঔষধের, ঔষধ না মিললে বৈদ্য কি করবে?’

গুরুগৃহে অধ্যয়নের সময় আমি সমগ্র আয়র্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেছি।—ব্যথা কাতর স্বরে কৃষ্ণ বললেন।

'আপনি এসময় বেশী কথা বলবেন না। রোগ প্রশমনের জন্য ঔষধ কোথায় পাওয়া যাবে বলুন। নারদের পক্ষে ত্রিভুবনের কোন স্থান অগম্য নয়।' নারদ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন প্রভুর রোগ নিরাময়ের জন্য। দ্বারের বাইরে গরুড়কে দেখে ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন,—''এখনও পর্যন্ত প্রভুর জন্য একটু ঔষধ সংগ্রহ করে দিতে পারলে না? তুমি কেমন সেবক হে?'

কৃষ্ণ বললেন—ওকে অনর্থক তিরস্কার করছেন দেবর্ষি। ঔষধ সর্বত্রই রয়েছে কিন্তু কেউ যদি না দেয় ও কি করবে?'

ইতিমধ্যে পট্টমহিষীরা সেবক পাঠিয়ে দ্বারকায় বৈদ্যরাজকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। বৈদ্যরাজ কৃষ্ণকক্ষে প্রবিষ্ট হয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলেন। শিরদেশে হাত রাখলেন, চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা, সব পরীক্ষা করলেন। ঔষধও দিলেন। কিন্তু কোন উপশম হল না। বরং মাথার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। অসহায় হয়ে রাজবৈদ্য তখন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'আপনার ইতিপূর্বে কখনও কি শিরঃপীড়া হয়েছিল? যদি হয়ে

থাকে তবে সেইসময় যে ঔষধ প্রয়োগ করে আপনার রোগ নিরাময় হয়েছিল সেই ঔষধের নাম কি আপনার মনে আছে?'

কৃষ্ণ বললেন,—'ঔষধের নাম তো মনে আছে কিন্তু ঔষধের অনুপান অমিল। রাজবৈদ্য, পট্টমহিষীগণ ও দেবর্ষি একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন—'ঔষধের অনুপান কি প্রভু?'

ব্যথা কাতরতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহস্যময় হাসি মিশিয়ে কৃষ্ণ বললেন,—'যদি কোন প্রেমিক ভক্ত তাঁর নিজের পায়ের ধুলো আমাকে দেয়, তবে সেই ধুলোর অনুপানে ঔষধ আমি নিজেই তৈরী করে মাথায় প্রলেপ দিলেই সুস্থ হয়ে যাব। গুরুগৃহে সন্দীপনজী আমাকে সমস্ত রকমের ঔষধ তৈরীর প্রণালী শিখিয়ে দিয়েছিলেন—ঔষধও আমার কাছেই আছে। এখন দরকার শুধু ঐ অনুপানের।'

ভক্তবৎসল, ভক্তপ্রাণ ভগবানকে ভক্তের অন্তরের পীড়াই ব্যথিত করে তাই ভক্তের চরণধূলির স্পর্শেই তিনি সুস্থ হন। রুক্মিণী, সত্যভামাদি পট্টমহিষীরা ঔষধের অনুপানের নাম শুনে বললেন—'চরণধূলি তো আমাদের সবার পায়েই লেগে রয়েছে। আমরা ওনার প্রেমী ভক্তও, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু শাস্ত্র বলে পতি পরমগুরু। পতির মাথায় প্রলেপ দেওয়ার জন্য চরণধূলি দান করলে পাপ হবে, অনন্য নরকে বাস করতে হবে। সুতরাং চরণধূলি কেমন করে ওনাকে দেব?'

সত্যভামা রুক্মিণীকে বললেন—'আপনি আপনার চরণধুলি দিয়ে দিন দিদি!'

'ওনাকে চরণধূলি দিয়ে কি অনন্তকালের জন্য নরকে যাব বোন?' রুক্মিণী উত্তর দিলেন সত্যভামাকে। শ্রীকৃষ্ণকে চরণধূলি দিতে দ্বারকার ষোলহাজার একশ আট রানীদের মধ্যে কেউই রাজী হলেন না। পাপের ভাগী হতে কেউ রাজী নয়।

দেবর্ষি নারদ দেখলেন দ্বারকার মহারানীরা যখন চরণধূলি দিতে পারলেন না তখন কৃষ্ণের পুত্ররা এবং দ্বারকার প্রজারাও ধূলি দিতে সম্মত হবেন না। তিনি ভক্তের চরণধূলি সংগ্রহের জন্য ত্রিভুবন পর্যটনে বের হলেন। প্রথমে গেলেন স্বর্গে। দেখলেন সেখানে ভক্তই নেই, চরণধূলি দূরের কথা। যমলোকে উপনীত হলেন দেবর্ষি। যমরাজ করজোড়ে বললেন—'আমি কৃষ্ণচরণের এক ক্ষুদ্র অধম সেবক। আমায় মাপ করবেন দেবর্ষি।' মহর্লোক, জনলোক, তপোলোকের ঋষি-মহর্ষিরা নারদের মুখে চরণধূলি দান করুন প্রভুর রোগ নিরাময়ের জন্য—'এই কথা শুনতেই সকলে কানে আঙুল দিয়ে বললেন—'শান্তম্ পাপম্। শান্তম্ পাপম্'। ব্রহ্মালোকে উপনীত হয়ে ব্রহ্মাজীকে বলতেই, তিনি নারদকে ধমক দিয়ে বললেন—''পুত্র নারদ, তুমি বড়ই দুর্বিনীত হয়েছ। পিতার কাছে এইরূপ অনুচিত প্রস্তাব রাখার আগে তোমার লজ্জা আসা উচিত ছিল। নারদ ব্যর্থ মনোরথে শিবলোকে গেলেন। শিবকে বলার আগেই সর্বজ্ঞা পার্বতীমা নারদকে বললেন—'তুমি এখান থেকে অন্যত্র যাও নারদ। এখানে তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে না।'

মানুষ, দেবতা যখন কোন কিছু পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে তখন স্থান-অস্থান, পাত্র-অপাত্র বিবেচনা করে না। দেবর্ষি নারদ তাই উর্দ্ধলোক থেকে অধঃলোকে উপনীত হলেন। বলি, প্রহ্লাদ ইত্যাদি ভক্তদের কাছে উপনীত হয়ে চরণধূলি দানের প্রস্তাব রাখতেই তারা বললেন—আমাদের হৃদয়ে তো ভক্তিই নেই, সুতরাং আমরা চরণধূলি দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাব কী করে? পৃথিবীতেও ঐ একই সমস্যা। যে ভক্ত সে স্বীকার করতেই চায় না যে সে প্রভুর ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তো পরের কথা। মর্ত্যের ভক্ত দেবর্ষি নারদকে পর্যন্ত নিজের পায়ের ধূলি দিতে সাহস করে না—একথা ভাবতেই তাদের প্রাণ কেঁপে ওঠে। ত্রিভুবন পর্যটন করে ব্যর্থ নিরাশ হৃদয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন দেবর্ষি নারদ। কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বললেন—''ত্রিভুবনে কোন ভক্ত, আপনাকে তাঁদের পদধূলি দিতে রাজী হল না। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেও পদধূলি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি।''

—'নারদজী আপনি পদধূলি সংগ্রহের জন্য ব্রজধামে গিয়েছিলেন?' কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

—'ত্রিভুবনে কোথাও যখন মিলল না, তখন ব্রজে কি ঐ পদধূলি মিলবে?' নারদ জিজ্ঞাসা করলেন।

—'মিলবে কী মিলবে না, তা জানি না, তবে একবার সেখানে যেতে তো দোষ নেই?' কৃষ্ণ বললেন।

কৃষ্ণের কথায় নারদ বীণায় নামগানের ঝংকার তুলতে তুলতে ব্রজধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে নারদ ভাবছেন—''পদধূলি ব্রজরাজনন্দ হয়তো দিয়ে দেবেন, গোপসখারাও দিয়ে দিতে পারেন। ব্রজেশ্বরী মা যশোদা আমার মতো ঋষির হাতে পদধূলি দেবেন কী না দেবেন-এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কিন্তু গোপীরা কোন ক্রমেই আমা হেন ঋষির হাতে পদরজঃ তুলে দিতে সাহসী হবেন না।'' এইরূপ ভাবতে ভাবতে নারদ ব্রজধামে উপনীত হলেন। তাঁর শ্রুতিমধুর নাম সংকীর্তনের সুর গোপীদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করতেই তারা দ্রুত ছুটে এসে নারদের কাছে উপস্থিত হয়ে পর্যায়ক্রমে ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালেন। প্রণামান্তে দেবর্ষিকে তাঁরা সকলে ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কোথা থেকে আসছেন দেবর্ষি?'

দেবর্ষি উত্তর দিলেন—'দ্বারকা থেকে।'

আমাদের প্রাণনাথের সব কুশল তো? রাধাসহ ব্রজগোপীরা জিজ্ঞাসা করলেন।

গোপীদের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়ে নারদ নতমুখে নীরব রইলেন। নারদকে বিষণ্ণ হয়ে মুখ নীচু করতে দেখে—রাধারাণী ও গোপীদের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। প্রিয়তম-প্রাণনাথের অজানা অনিষ্ট-আশঙ্কায় তাঁদের বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। প্রাণবল্লভের সমাচার জানবার জন্য তাঁরা আকুল হয়ে নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন,—''দেবর্ষি মৌন থেকে আমাদের প্রাণসংহারের চেষ্টা না করে বলুন, কেমন আছেন আমাদের ব্রজনাথ?''

নারদ মৌনভঙ্গ করে বললেন,—'আপনাদের ব্রজনাথের ভয়ানক ব্যাধি হয়েছে।' 'ব্যাধি'—এই শব্দটা কানে আসতেই রাধারাণী মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হতেই ললিতাসখী তাঁকে ধরে অঙ্গ সংলগ্ন করে কোনরকমে প্রকৃতিস্থা করলেন। পরে গোপীরা পুনরায় দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—''ব্রজনাথ গোপবল্লভের কি ব্যাধি হয়েছে?'

—'অসহ্য শিরঃপীড়ায় তিনি শয্যাশায়ী'

কাতরস্বরে গোপীরা বললেন,—'দ্বারকায় কি কোন বৈদ্য নাই।'

—''দ্বারকা নগরীতে বৈদ্যের কোন অভাব নেই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আয়ুর্বেদে পারদর্শী। ঔষধও তিনি জানেন এবং ওই ঔষধ সবার কাছেই আছে কিন্তু কেউ তা দিতে রাজী নয়। ঔষধের খোঁজে আমি ত্রিভুবন ঘুরেছি। সর্বত্র হতাশ হয়ে এখন এসেছি ব্রজধামে তোমাদের কাছে।''

—'সবার কাছে ঔষধ আছে! কিন্তু কেউ তা দিতে রাজী নয়। ঔষধের নাম কি দেবর্ষি?' গোপীরা সমবেত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

—'ঔষধ, ঠিক ঔষধ নয়, অনুপান বলতে পার।'

—অনুপান। কি এমন দুর্লভ অনুপান, যা আপনি ত্রিভুবন ঘুরে সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন না?

—'অনুপান দুর্লভ নয়! দুলর্ভ অনুপানদাতা।'

—'দুর্লভ যদি না হয় তাহলে নিঃসঙ্কোচে বলুন অনুপান কি? গোপীদের ব্যাকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কোন প্রেমিক ভক্তের নিজচরণের ধূলি প্রভুর শিরঃপীড়া রোগ প্রশমনের জন্য, ঔষধের অনুপান হিসাবে ব্যবহৃত করতে হবে।'

গোপীরা বললেন,—'হে দেবর্ষি, ঔষধের এই সামান্য অনুপান ত্রিভুবনে আপনাকে কেউ প্রদান করল না।' গোপীরা বসে পড়লেন যমুনাতটস্থিত ব্রজভূমিতে। তারপর চরণভূমিতে ঘষে ঘষে চরণে রেণু বা ধূলি লাগিয়ে, পরে তা ঝেড়ে তরুপত্রে রেখে দেবর্ষির হাতে দিয়ে বললেন,—''আপনার যত খুশী পদধূলি নিয়ে যান। আমরা প্রত্যেক গোপী তরুপত্রসমূহে পদধূলি সংগ্রহ করে দিয়েছি। এবার আপনি নিশ্চিন্তমনে দ্বারকায় গিয়ে প্রভুকে নিরাময় করে দিন, যান, দেবর্ষি অনর্থক এখানে দাঁড়িয়ে বিলম্ব করবেন না।''

—''আপনারা কী করছেন, তা কি, একবার ভেবে দেখেছেন?' অশিক্ষিতা-মূর্খ গোপীদের প্রতি নারদের দয়া দেখা দিল তাই তিনি পুনরায় বললেন,—''শ্রীকৃষ্ণ শুধু যোগেশ্বর, ব্রজনাথ নন—তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।

তাঁকে চরণধূলি দিতে কোন ঋষি-মহর্ষি, শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণও সাহস করেন না। জেনে বুঝে তাঁকে চরণধূলি দেওয়ার পরিণতি অনন্তকাল ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ।''

—এত কথা না বলে, আপনি চরণধূলি নিয়ে অবিলম্বে দ্বারকায় যান। না জানি প্রাণনাথ আমাদের কত কষ্ট পাচ্ছেন শিরঃপীড়ায়। শুনুন দেবর্ষি আমরা ভগবান পরব্রহ্ম এসব বুঝি না। জানিও না। আমরা জানি, শুধু তিনি আমাদের প্রাণনাথ, তাঁর সুস্থতাই আমাদের একমাত্র কাম্য। যেসব পাপ ও নরকের কথা আপনি বললেন—ওসব তো আমাদের শ্যামসুন্দর আগেই মেরে রেখেছেন। আপনি কি জানেন না, আমাদের প্রাণনাথের অঘাসুর (পাপ) নরকাসুর (নরক) বধের কথা? আপনি শীঘ্র দ্বারকায় গিয়ে প্রভুকে পদধূলি দিয়ে সুস্থ করে তুলুন। এতে যদি আমাদের নরকভোগ করতেই হয় অনন্তকাল ধরে তা করবো কিন্তু আমাদের প্রাণনাথ যেন সুস্থ থাকেন।

নারদ অবাক হয়ে গোপীদের অপলকনেত্রে দেখতে দেখতে প্রথমে চরণধূলি নিজের সারা গায়ে, মাথায় খানিকটা মেখে নেন। পরে নিজের উত্তরীয়ের প্রান্তে পদধূলি বেঁধে মাথায় রেখে দ্বারকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। পথে যেতে যেতে নারদ ভাবেন—'আমরা ঋষিমুনিরা মিছেই ভক্ত বলে গর্ব করি।' ভাবতে ভাবতে দ্বারকার অন্তঃপুরে তিনি যখন পৌঁছালেন তখন তাঁর সারা শরীর গোপীদের পদধূলিতে স্নাত দেখে শ্রীকৃষ্ণ শয্যাত্যাগ করে উঠে এসে নারদকে সহর্ষেআলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। অতঃপর গোপীদের চরণধূলি শিরে ধারণ করে রোগমুক্ত হন তিনি। রুক্মিণী-সত্যভামাদি মহিষীগণ বিস্ময়ে নিরুত্তর। শ্রীকৃষ্ণ মহিষীদের দিকে কটাক্ষপাত করে বললেন—''ব্রজের গোপীরা তো পাগলী কিন্তু পাগলীরা কখনও কখনও এমন কাজে করে, যাতে অনেকের কল্যাণ হয়। তোমরা তো নিজের চোখেই দেখলে সব।''

দ্বারকার মহিষীদের তিনি বুঝিয়ে দিলেন—রাধা-গোপীদের নামকথা প্রসঙ্গে এলে, কেন তাঁর আঁখিতে অশ্রু দেখা দেয়! সারাশরীর রোমাঞ্চিত হয়। মহিষীরা লজ্জায় অধোবদন রইলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ নারদের দিকে চেয়ে বললেন—'দেবর্ষি, আপনি ভক্তিমার্গের পরমাচার্য শিরোমণি বিশেষ। যে ঔষধের অনুপানের জন্য আপনি ত্রিভুবন ঘুরলেন তা নিজের কাছে থাকতে দিলেন না কেন?'

নারদ বললেন—'আমি যদি আপনাকে পদধূলি দিতাম, তাহলে গোপাঙ্গনাদের পবিত্র পদরজতে স্নান করার সৌভাগ্য কি অর্জন করতাম? গোপাঙ্গনাদের পদরজতে স্নান করে আমি অনুভব করেছি—

তস্মিন তৎসুখসুখিত্বম্।
যথা ব্রজ গোপিকানাম।।

গোপীরা প্রেমের পবিত্র নিশান। এ অনুভব দেবর্ষি নারদের একার নয়, বিশ্বের কোটি কোটি ভক্তের। ভক্ত ও ভগবানের জয় হোক।

বউ নিয়ে খেলে গোপাল

প্রতিদিনের মতো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নানাদি সমাপন করে যশোদা মা গোপালের জন্য দধিমন্থন করতে বসলেন। গোপাল ঘরের পালঙ্কে শুয়ে আছে। এখনি হয়তো উঠেই বলবে মা ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দাও। তাই যশোদা গোপালের জন্য দধিমন্থন করে মাখন তুলছেন। যশোদার গানের সুরে গোপালের ঘুম ভেঙে যায়। দুই চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুম-ঘুম চোখে গোপাল পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ে এবং ধীরে ধীরে দধিমন্থনরতা মা যশোদার কাছে উপস্থিত হয়। মা গোপালকে দেখে বললেন,—'নীলমণি উঠে পড়েছিস, আয় বাবা, আমি মাখনটা তুলে নিই, তুই একটু দাঁড়া।'

গোপাল বলে—'মা, আমার খু-উ-ব ক্ষিধে পেয়েছে।'

'আহা বাছারে, এইতো আমি আমার গোপাল সোনার জন্য মাখন তুলছি। একটু অপেক্ষা কর বাবা'—যশোদা গোপালকে অনুনয়ের স্বরে বলেন।

—'না আমি একটুও অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে এক্ষুনি খেতে দাও। টাটকা মাখন দাও।' গোপাল জেদ ধরে।

—লালা, এমন করে মাকে বিরক্ত করতে নেই। আচ্ছা, আমাকে কি তোর ভালো লাগে না? সব সময় এমন উপদ্রব করিস কেন?

—'তোমাকে আবার কখন উপদ্রব করলাম। দেখছ না আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

মাখন দাও তাড়াতাড়ি। আমি কিন্তু টাটকা মাখন খাব। যশোদা ভাবেন—ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি জিনিষ লালা ঠিক বোঝে না, তাই ঝোঁকের মাথায় যে কথা মনে আসে সেই কথা ধরে বাচ্চারা যেমন জেদ করে, গোপালও তেমনি জেদ করছে।

চেষ্টা করে দেখি, অন্য কথা বলে যদি লালাকে ভোলাতে পারি। অন্য কথা শুনে লালা যদি কিছুক্ষণের জন্য টাটকা মাখন খাওয়ার কথা ভুলে যায় তাহলে খুব ভালো হয়। মাখন তোলার কাজটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে যায়। যশোদা তাই গোপালকে অন্যমনস্ক করার জন্য কোলে তুলে নিয়ে বললেন—'দেখ তো উপরে আকাশে ওটা কি? তখন ব্রজপুরের আকাশে সূর্য উদিত হয়নি। শুক্লপক্ষের চাঁদ তখনও গগনে শোভা পাচ্ছে মায়ের কথায় গোপাল আকাশের দিকে চেয়ে বলে—'ওটা তো চাঁদমামা।'

চাঁদের দিকে নজর পড়তেই গোপাল মাখনের কথা ভুলে গেল। চাঁদ নেওয়ার ইচ্ছা হল গোপালের। তাই মাকে বলল, "আমি চাঁদ নেব—আমার চাঁদ চাই, এক্ষুনি চাই।" মা বলেন,—"হ্যাঁ, চাঁদ নেব—চাঁদ নেব, অনর্গল বলতে থাক বাছা, আমি ততক্ষণে মাখন-তোলার কাজ সেরে নিই।'

গোপাল ছোট হলে কী হবে, ভীষণ চালাক। তাই সে মায়ের দধিমন্থনের রজ্জুটি দু'হাতে চেপে ধরে বলে—'মা, মাখন পরে তুলবি, আগে আমাকে চাঁদ এনে দে।' গোপালের বায়নার জেরে মা যশোদা থালাভর্তি জল নিয়ে এসে প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিয়ে বললেন,—'এই দ্যাখ তোর চাঁদমামা এসে গেছে। নে এর সাথে খেলা কর।'

গোপাল কোল থেকে নেমে জলভর্তি থালায় থাপ্পড় মেরে বলে—'এতো জল, আমি ওই আকাশের চাঁদ নেব। এখনি নেব। গোপালের উপদ্রবে মা যশোদা রেগে যান। তিনি রাগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'সকাল থেকে বড্ড উৎপাত শুরু করেছিস, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা।' মা যশোদা গোপালকে দুহাতে করে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ীর দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "চলে যা এখান থেকে, 'চাঁদ নেব, চাঁদ নেব' করে সকাল থেকে আমাকে জ্বালিয়ে মারলে!"

যশোদা যেই গোপালকে তুলে নিয়ে গিয়ে দরজার কাছে নামিয়ে দিয়েছেন, অমনি গোপালের মুখ রাগে 'বেলুন ফোলার মতো' ফুলে গেছে। কোমরে হাত রেখে যশোদার দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে গোপালও বলে—'ওরে ও বুড়ি থুড়থুড়ি যশোদা মা (গোপাল রেগে গেলেই যশোদাকে বুড়ি থুড়থুড়ি বলে সম্বোধন করতেন) চাঁদ দেবে, কি দেবে না বল।''

—'ওরে দুষ্টু আমাকে শাসানো হচ্ছে!' চাঁদ না দিলে তুই কী করবি?' যশোদা রাগতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন গোপালকে।

—'যদি তুমি চাঁদ না দাও ধূলায় গড়াগড়ি দেব, সারা গায়ে ধূলা-বালি মেখে পড়ে থাকবো মাটিতে। তোমার কোলে কখনও চড়ব না।'

—'তুই কোলে না বসলে আমার বয়ে যাবে! বলরাম আছে, সে এসে আমার কোলে বসবে। তোর যা খুশী কর। চাঁদ তোকে দিতে পারব না।

গোপাল দেখল, এ শাসানিতে কোন কাজ হল না। তাই সে বলল,—'তুমি যদি চাঁদ না দাও, তাহলে আমি সুরভি গাভীর দুধ পান করবো না, মাথার

চূড়ায় ফুলও গুঁজবো না।' যশোদা বললেন, 'একে তুই দূর্বল, পাতলা, তার উপর যদি তুই দুধ পান না করিস তোর পেট পিঠে লেগে যাবে। এমনিতেই গায়ের রঙ কালো, দেখতেও বিশ্রী।

মাথায় চূড়া বেঁধে ফুল গুঁজে দিই, তাই একটু দেখতে ভালো লাগে। এখন তুই যদি মাথার চূড়ায় ফুল না গুঁজিস, তোর বলরামের মাথায় চূড়া বেঁধে ফুল গুঁজে দেব। তুই কখনও আর আমার কোলে উঠবি না।''

গোপাল দেখল দ্বিতীয় শাসানিতেও কোন কাজ হল না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে মাকে বলল,—'দেখ, হয় আমাকে চাঁদ এনে দাও, নয়তো এবার আমি এমন একটা কথা বলব যা শুনলে তোমাকে চাঁদ দিতেই হবে।'

—যশোদা বললেন, 'তোর যদি মন চায়, তুই সবাইকে ডেকে ডেকে বলগে যা, মা চাঁদ দিতে পারবে না।'

—শোন মা, যদি তুমি আমাকে চাঁদ না দাও, তাহলে ব্রজবাসীদের যে পঞ্চায়েত বসে, আমি সেখানে গিয়ে সবাইকে বলব—শোন শোন ব্রজবাসীরা, সব কান খুলে শোন, আমি শুধু নন্দবাবার ছেলে, যশোদার ছেলে নই। যদি তুমি আমার মা হতে চাও, তাহলে প্রথমেই তোমাকে চাঁদ এনে দিতে হবে। নইলে তুমি আমার মা নও, আমিও তোমার বেটা নই।'' বলতে বলতে রেগে দরজা ধরে বসে পড়েন মাটিতে।

সাড়ে তিন বৎসরের শিশু গোপাল রাগ করে মাটিতে বসে পড়েছে দেখে যশোদার দু-নয়ন অশ্রুতে ভরে ওঠে। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে গোপালকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'সোনামণি, তোকে একটি মিষ্টি কথা বলব' মায়ের গলা জড়িয়ে গোপাল বলেন, 'কি কথা, বল।'

—'মাখনের চেয়ে নরম, চাঁদের চেয়ে সুন্দর তোর জন্য একটা বউ আনবো?'

বউ-এর নাম শুনতেই গোপাল চাঁদ নেওয়ার কথা ভুলে যায়। 'বউ নেব, বউ নেব' বলে মায়ের বদন চুমায় চুমায় ভরে দেয়। যশোদা বলেন—বউ নিতে হলে, ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুতে হয়। মুখ ধুয়ে খাবার খেতে হয়, তারপর বউ নিয়ে খেলা করতে হয়। লালা, তুই জানিস, বউ কেমন হয়? তুই তো ছোট্ট নীলমণি, তোর বউ যদি লম্বা হয়? তাহলে কি করবি? গোপাল বলল—'মা, আমি যেমন ছোট্ট, তেমনি আমার বউ যেন ছোট্ট হয়। আমি ছোট্ট বউ নেব মা।'

যশোদা বললেন,—'ঠিক আছে, মাখন আমি পরে তুলবো। এখন আমি তোর বউ এনে দিচ্ছি। তোর কত বড় বউ চাই, বলতো গোপাল? গোপাল দু'হাত প্রসারিত করে বলে 'এত্তো বড়।' যশোদা গোপালকে কোলে

করে ঘরে প্রবেশ করে একটি কাঠের রঙিন পুতুল গোপালের হাতে দিয়ে বললেন—'এই নে তোর বউ, এবার খুশী তো?'

গোপাল বলে,—'মা, কালকে যখন দাউদাদার সঙ্গে বনে বাছুর চরাতে যাব তখন বউকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাব কেমন?'

যশোদা গোপালের গালে চুমু খেয়ে বললেন—'দূর বোকা? বউকে নিয়ে কেউ গরু চরাতে যায়? নে, এবার বউ নিয়ে খেলা কর। আমি ততক্ষণ মাখন তুলি।' গোপাল মায়ের কোল থেকে নেমে বউ নিয়ে খেলা করে ঘরের প্রাঙ্গণে বসে। যশোদা গোপালের জন্য মাখন তুলতে বসেন।

বাৎসল্যপ্রীতির বন্ধনে

ব্রজরাজ নন্দ প্রত্যুষে যমুনায় স্নান সেরে স্বীয় ভবনে ফিরে এসেছেন। নন্দলাল তখন প্রাঙ্গণে বসে খেলা করছিল। তার সারা অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত। বাড়ীতে প্রবেশ করে নন্দরাজ পূজার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। নন্দলাল তা লক্ষ্য করে খেলা পরিত্যাগ করে পিতার পিছু নিল। গোপাল সবে মুখে আধো আধো বুলি বলতে শিখেছে। পিতার পিছু পিছু টলমল টলমল করে নন্দলাল কৃষ্ণও পূজার ঘরের দিকে যেতে থাকল। পায়ের নূপুরের আওয়াজে নন্দরাজ পিছু ফিরে দেখেন—পুত্র ধূলালিপ্ত অঙ্গে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পূজার ঘরে প্রবেশ করতে চলেছে। পুত্রকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—''ভেতরে আছিস না, যা, বাইরের উঠোনে খেলা কর।

আধো আধো স্বরে কৃষ্ণ বলল,—''ভি-ত-লে দা-বো না তে-ন?''

নন্দ মহারাজ বললেন,—''বেটা, আমি এখন ঠাকুর ঘরে পূজা করবো। জয় জয় নারায়ণ হরি—গান করবো।' এই সময় স্নান না করে পূজার ঘরে ঢুকতে নেই।''

—''যব তেয়ে বয়ো-দয়-দয় নায়ন আমি। আমার তেয়ে বয়ো দয় দয় তোমার তে আতে'?

নন্দবাবা বললেন, 'ঠিক আছে, তুই দরজায় বস। ভেতরে ঢুকবি না।'

কৃষ্ণ দরজার চৌকাঠে বসল। নন্দবাবার পূজার ঘরে রত্ন সিংহাসনের উপর শালগ্রাম শিলা [নারায়ণ বিগ্রহ] বিরাজ করছেন। পূজার আসনে বসে আচমনাদি সমাপন করে নন্দবাবা শালগ্রাম শিলাকে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করালেন। প্রথমে যমুনার জল দিয়ে স্নান করালেন। পরে দুধ-দই-ঘৃত মধু দিয়ে স্নান করালেন। তা দেখে কৃষ্ণের জিভ দিয়ে জল বেরোতে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণের ভিতরে ঢোকার অনুমতি নেই। চৌকাঠে বসে বসে কৃষ্ণ ভাবছে—বাবা, রোজ রোজ শালগ্রাম শিলা বিগ্রহকে দুধ-দই-ঘি-মধু দিয়ে যখন স্নান করায়, তখন নিশ্চয়ই ওটা (বিগ্রহ) মিষ্টি হয়ে গেছে। খেতে নিশ্চয়ই মধুর হবে। নন্দবাবা স্নানের পর শালগ্রাম শিলায় চন্দন মাখিয়ে তার উপর তুলসীপত্র রাখলেন। অতঃপর গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়ে দুই আঁখি বন্ধ করে জপে মনোনিবেশ করলেন। কৃষ্ণ দেখল,—বাবা চোখ বন্ধ করে ঠোঁট নাড়িয়ে কী যেন বলছে এই সুযোগ, দুধ-দই-ঘি-মধুতে স্নান করতে করতে শালগ্রাম-অতি মধুর স্বাদ বিশিষ্ট মিঠাইতে পরিণত হয়ে গেছে। এই সুযোগে ঐ মিঠাইটা মুখে পুরে নিই। কৃষ্ণ চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল এবং সিংহাসন হতে শালগ্রাম শিলা তুলে তা নিজের মুখের মধ্যে পুরে নিল এবং বাবার ডানপাশে বসে মিছরী চোষার মতো চুষতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর জপ শেষ করে—জপের মালা ঝুলিতে রেখে নন্দমহারাজ শালগ্রাম শিলাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন—সিংহাসন শূন্য, শালগ্রাম শিলা নেই। 'আরো!—শিলা বিগ্রহ গেল কোথায়?' ফুল তুলসীর স্তুপ সরিয়ে খুঁজতে থাকেন—কিন্তু না, এর মধ্যে তো নাই। বামপাশে চেয়ে দেখেন-সেখানেও নেই। ডানপাশে ঘুরে দৃষ্টিপাত করতেই দেখেন—কৃষ্ণ বসে রয়েছেন। তাঁর মুখটা ফুলে রয়েছে। নন্দ মহারাজ মুখ ফোলা অবস্থায় কৃষ্ণকে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটা, তুই এখানে?' কৃষ্ণ মুখ বন্ধ করে উত্তর দেয়—'উঁ-হু।'

—তুই সারা গায়ে ধুলো মেখে, ঠাকুর ঘরে কেন ঢুকেছিস?

কৃষ্ণ শালগ্রাম মুখে রেখে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট বন্ধ করে বলে—'উঁহু! নন্দবাবা দেখলেন কৃষ্ণের মুখ ফুলে রয়েছে। তাই তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'লালা, তোর মুখ ফুলে রয়েছে কেন?'

কৃষ্ণ বলে—'উঁহু।' কৃষ্ণের 'উঁহু-উঁহু' শুনে নন্দবাবা রেগে যান। তিনি তাঁর গালে আলতো করে থাপ্পাড় মারেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের মুখ থেকে লাল-ঝোল মাখানো শালগ্রাম শিলা বের হয়ে মাটিতে পড়ে।

শালগ্রামকে মাটিতে ঐ অবস্থায় পড়তে দেখে—নন্দবাবা মাথা চাপড়ে বললেন—'হায়! হায়! হে ভগবান, এ কেমন উৎপাতে ছোঁড়া, যে তোমাকেও গিলে খায়।' ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি কৃষ্ণর কান ধরে বললেন, 'যশোদে! তোমার ছেলের কাণ্ড দেখ?'

—কি হয়েছে গোপরাজ? তুমি নীলমণির কানটা এত শক্ত করে ধরে আছে কেন?' ছেড়ে দাও, নরম কান এতক্ষণ ধরে থাকলে ব্যথায় লাল হয়ে যাবে যে?

—আগে দেখ, তোমার ছেলে কী করেছে?

—ও ছোট ছেলে, কী আর করবে?

—ছোট ছেলে না হয় মানছি, কিন্তু ওর কাণ্ড শোন, আমার নিষেধ সত্বেও ঠাকুর ঘরে ঢুকে সিংহাসন থেকে শালগ্রাম শিলা তুলে নিয়ে মুখে ভরে চুষছিল। হায়! হায়! কি সব্বনেশে ছেলে দেখ, শেষে কিনা ভগবানকে মুখে পুরে চুষে চুষে খায়!

নন্দবাবা শিরে করাঘাত করছেন। যশোদা নন্দবাবার হাত থেকে কৃষ্ণকে মুক্ত করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—'হায় হায় করার কী আছে; বুঝি না বাপু। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি শুধু শুধু ছেলেটাকে তিরস্কার করলে। ছোট ছেলে, ওর কি জ্ঞান আছে; যে ওটা ভগবান হাত দিতে নেই? হয়তো বড় মিঠাই মনে করে মুখে ভরে নিয়েছে।

—তোমার আস্কারা পেয়েই ও দিন দিন বিগড়ে যাচ্ছে। কোথায় ওকে একটু বুঝিয়ে বলবে, তা না করে বলছ ছোট ছেলে না জেনে করে ফেলেছে। এটা কি ছেলেকে শাসন করার রীতি হল?' নন্দ মহারাজ চড়াসুরে যশোদাকে বললেন।

যশোদাও কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর কানে হাত বুলোতে বুলোতে নন্দমহারাজের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার নীলমণি তোমার ভগবানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।' নন্দবাবা যশোদার কথায় কান না দিয়ে শালগ্রাম শুদ্ধিকরণে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমে শালগ্রাম শিলায় গোবর লেপন করলেন। পরে যমুনার জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে দিলেন। অতঃপর প্রায়শ্চিত্তর জন্য পূজা করলেন। পূজা শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন,—'হে ভগবান, আমার লালা ছোট ছেলে, এখন কিছুই জানে না, অপরাধ হলে ওকে ক্ষমা করে দিও। অবোধ শিশু, তোমাকে মিঠাই মনে করে মুখে পুরে ফেলেছিল, ওর দোষ নিও না ঠাকুর—ওর দোষ নিও না।' বারবার শালগ্রাম শিলার কাছে ক্ষমা যাচনা করেন নন্দবাবা। ওদিকে যশোদা মা কৃষ্ণকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—''লালা, তুই বাবার পূজার ঘরে ঢুকে ভগবানকে মুখে ভরলি কেন?'' কৃষ্ণ বলল, ''মা-ই-য়া, লোজ লোজ গি, মদদু, ডুড ডিয়ে-তান কলায় তো, তাই বাভলাম ওতা এততা মি-থা-ই, মুখে পুলে-দিলাম।''

—আর এরকম দুষ্টুমি কর না, তাহলে বাবার হাতে কান-মলা খেয়ে খেয়ে তোমার কান লাল হয়ে যাবে।

অতঃপর মা যশোদা গোপালকে স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে স্নান করিয়ে দেন। স্নানান্তে পীতাম্বর বস্ত্র ও রত্নালংকার পরিয়ে গোপালকে মনোহর বেশে সাজিয়ে দেন। মাথার কেশ চূড়ায় ময়ূরের পাখা বেঁধে পায়ে নূপুর পরিয়ে দেন।

নূপূর পরাতেই গোপাল নাচতে শুরু করল। গোপালের মধুর নৃত্য দর্শন করতে করতে যশোদা বলে ওঠেন,—''হে ভগবান, এ নাচ কবে, কোথায় শিখল?'' মা তালি বাজান আনন্দে।

নাচে—তা-তা-থৈয়া, তা-তা-থৈয়া-থৈয়া।
নাচে নন্দলালা, নচামেঁ থরি কী মাইয়া।।

সমগ্র বিশ্ব নাচে ভগবানের কোলে। ভগবান নাচেন জননী যশোদার কোলে।

''যশোদা তেরে ভাগ কী—কহী না জায়।''

মহাভারতের মহাযুদ্ধের আগে

কুরুক্ষেত্রের রনাঙ্গনের একপ্রান্তে ছাউনি ফেলেছে কৌরবপক্ষ, অন্যপ্রান্তে পাণ্ডবপক্ষ। যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতির অঙ্গ এটা। এইসময় কৃষ্ণ হস্তিনা নগরেই ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের সারথি। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেছেন শুনে দেবর্ষি নারদ তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখে যথেষ্ট প্রীত হলেন এবং রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"নারদ তোমার মতো নিরামিষী লোক এই রণক্ষেত্রে হঠাৎ কী মনে করে?"

নারদ বললেন, "আপনাকে দর্শন করতে ও সেইসঙ্গে আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর জানতেই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

—উত্তম, কি তোমার জিজ্ঞাসা বলো?

—শুনলাম এই যুদ্ধে আপনি নিরস্ত্র হয়ে পাণ্ডবদের রথের সারথি হয়ে তাদের সহায়তা করবেন। আমার মনে হয় এটা আপনার পক্ষে সমীচীন কর্ম নয়। কারণ ভারতের জনতার একটা বৃহৎ অংশ আপনাকে ভগবান বলেই জানেন। সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা আপনার উচিত বলে আমি মনে করি। আপনার কাছে শত্রু-মিত্র সকলেই সমান। সমাজ ধর্মে পাণ্ডব ও কৌরব উভয়েই আপনার পরমাত্মীয়। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করাটা কি আপনার উচিত বলে মনে হয়?

কৃষ্ণ বললেন, "নারদ, তুমি নিজে না হয় পরীক্ষা করে দেখ। আমি কেন দুর্যোধন বা কৌরব পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেছি।"

নারদ বললেন, 'কিভাবে আমি এই পরীক্ষায় ব্রতী হব, তার উপায় যদি বলে দেন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন নারদের হাতে তিনটি ফুলের মালা তুলে দিয়ে বললেন, 'দেখ নারদ তিনটি মালার মধ্যে একটি হচ্ছে পারিজাত ফুলের মালা, বাকি দুটির একটি গোলাপ ও অন্যটি বেলফুলের মালা। এই মালা তিনটি নিয়ে তুমি উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষের বিচার করবে। বিচারে যাকে উত্তম বলে মনে হবে তাকে পারিজাত ফুলের মালাটি পরিয়ে দেবে, যাকে মধ্যম বলে মনে হবে তাকে গোলাপের মালা এবং যাকে অধম বলে মনে হবে তাকে বেলফুলের মালাটি পরিয়ে দেবে। যদি তুমি বিচার দ্বারা ঐ তিন পুরুষের অন্বেষণ করতে সমর্থ না হও, তাহলে মালা তিনটি নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। প্রথমে তুমি কৌরব শিবিরে পরীক্ষার জন্য গমন কর।'

নারদ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে মালা তিনটি নিয়ে প্রথমে কৌরব শিবিরে উপস্থিত হলেন। দূর্যোধন নারদকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন। নারদ আসন গ্রহণের পর দূর্যোধন নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবর্ষি, আপনার এখানে আগমনের হেতু কি জানতে পারি?" নারদ বললেন, "আপনাদের কুশল জানতে এবং সেইসঙ্গে ভগবান আমার হাতে তিনটি মালা দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যারা আপনাদের মধ্যে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও অধম পুরুষ হবেন তাঁদের গলায় এ মালা তিনটি পরিয়ে দিয়ে সম্মান জানাতে। এখন হে যুবরাজ আপনি বলুন আপনাদের মধ্যে উত্তম পুরুষ কে? যিনি উত্তম পুরুষ হবেন তিনি পাবেন ভগবানের দেওয়া পারিজাত কুসুমের মালা।"

দূর্যোধন বললেন, "আমি থাকতে আবার উত্তম পুরুষ কে হবে? আমি জ্যেষ্ঠ কৌরব মহামানী রাজা দূর্যোধন, আমার চেয়ে উত্তম এই ভূমণ্ডলে আর কে হতে পারে? দিন দেবর্ষি, আমার কণ্ঠে ঐ পারিজাত মালা পরিয়ে দিন।"

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—''কিন্তু আপনাদের মধ্যে মধ্যম ও অধম পুরুষ কে?''

দুর্যোধন বললেন—''মধ্যম পুরুষ আমার ভাই দুঃশাসন, গোলাপ ফুলের মালাটা তাকে পরিয়ে দিন। আর অধম পুরুষ, উপস্থিত সভাসদদের মধ্যে যাকে হোক ভেবে নিয়ে বেলফুলের মালাটি তাকে পরিয়ে দিন।''

নারদ সভাসদদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের মধ্যে অধম পুরুষ কে?' সভাসদরা ঘাড় নত করে নিরুত্তর। অর্থাৎ অধম পুরুষ কেউ হতে চায় না। নারদ তখন মালা তিনটি নিয়ে বললেন, ''আমার বিচারে উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষ বলতে যা বোঝায় তা এখানে কেউ নেই। তাই আমি মালা তিনটি নিয়ে চললাম।''

অতঃপর নারদ পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করলেন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব দেবর্ষিকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। নিজে আসন ত্যাগ করে উঠে এসে নারদকে সেই আসনে সসম্মানে বসিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—''বলুন দেবর্ষি, আমি ও আমার ভাইয়েরা আপনার কোন উপকারে লাগতে পারি?''

দেবর্ষি প্রীত হয়ে বললেন, ''দেখ যুধিষ্ঠির, ভগবান আমার হাত দিয়ে তিনটি তিনরকমের ফুলের মালা রচনা করে পাঠিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে যে উত্তম পুরুষ, সে পাবে পারিজাতের মালা, যে মধ্যম পুরুষ সে পাবে গোলাপ ফুলের মালা এবং যে অধম পুরুষ সে পাবে বেলফুলের মালা। এখন তুমি বলো ধর্মরাজ, ভগবানের দেওয়া এই তিনটি মালার তিনজন অধিকারী কে কে?' যুধিষ্ঠির বললেন, ''দেবর্ষি, আপনি আমার সম্মুখে ঐ যে রত্নখচিত, অর্ঘ্য উপাচারে সজ্জিত শূন্য স্বর্ণসিংহাসনটি দেখতে পাচ্ছেন, ভগবানের দেওয়া পারিজাত ফুলের মালাটি আপনি ঐ সিংহাসনে রাখুন। নারদ মালাটি সিংহাসনে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই সিংহাসনটি কার?'

—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের, তিনি ছাড়া এই বিশ্বে আর উত্তম কে আছেন? তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত না থাকলেও আমরা তার জন্য ঐ আসন তৈরি রাখি। ওই আসনে আমরা অন্য কাউকে বসতে দিই না।

নারদ যুধিষ্ঠিরের কথায় আনন্দিত হয়ে বললেন, ''কিন্তু তোমাদের মধ্যে মধ্যম পুরুষ কে?'

—কেন আপনি?

নারদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি!'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনি ভক্ত, ভক্তই ভগবানের পরম সম্পদ। ভক্তের হৃদয়েই ভগবান বাস করেন। ভক্ত যেখানে ভগবানও সেখানে। ভক্তছাড়া ভগবানের মহিমা প্রচার করবে কে? ভক্ত ভগবানের সাধনায় ওঠেন আর ভগবান, ভক্তের ডাকে করুনায় বিগলিত হয়ে নেমে আসেন। তাইতো ভক্ত মধ্য পুরুষ'।—এই বলে যুধিষ্ঠির নারদের গলায় ইচ্ছাপূর্বক গোলাপফুলের মালাটি পরিয়ে দিলেন।

নারদের শেষ জিজ্ঞাসা,—'তাহলে অধম পুরুষটি কে?'

যুধিষ্ঠিরের উত্তর,—'দ্যুত ক্রীড়ায় হৃতসর্বস্ব, মতিভ্রষ্ট এই যুধিষ্ঠিরই অধম পুরুষ, দেবর্ষি। দিন, ঐ বেলফুলের মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দিন।'—এই বলে যুধিষ্ঠির বেলফুলের মালাটি নিজের গলায় পরে নিলেন। নারদ যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে ও ধর্মগুণে মুগ্ধ হয়ে বললেন,—'আমি তাহলে এখন আসি ধর্মরাজ, বিদায়।'

যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে নারদ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কি নারদ পরীক্ষা করে দেখলে?''

নারদ মাথা নত করে যুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'প্রভু আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আমি এখন আসি।'

যাওয়ার সময় নারদ মনে মনে উচ্চারণ করলেন—''নাহং জানে মহিমা তব।''

রাতের অরণ্যে

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই অন্তরঙ্গ যাদবমিত্র সাত্যকিকে নিয়ে বনভ্রমণে বের হলেন। তাঁদের পিছু পিছু চলতে থাকে যাদবসেনার দল। দ্বারকা নগরের সীমা অতিক্রম করে রথ দ্রুতবেগে বনভূমে প্রবেশ করল। রথ দ্রুত চলার ফলে সৈন্যদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সারাদিন বনের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে একসময় সন্ধ্যা নেমে আসে। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অন্ধকারে পথ চলা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। রথ নিয়ে অগ্রে গমন কিংবা দ্বারকায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই তিনজনে স্থির করলেন—বনের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করবেন। পালাক্রমে তিনজনের একজন পাহারা দেবেন অন্যদুজন নিদ্রা যাবেন। পর্যায়ক্রমে এভাবে তিন প্রহর কেটে গেলে চতুর্থ প্রহরে তিনজনেই জেগে থাকবেন। অতঃপর সূর্যোদয় হলে তিনজনে বনভূমি ত্যাগ করে নগরে ফিরে আসবেন।

প্রথম প্রহরে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে সাত্যকির। তিনি জেগে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুজনে বৃক্ষের নীচে পত্র শয্যা রচনা করে তার উপর উত্তরীয় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। দুইভাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন সেখানে হঠাৎ এক ভয়ংকর রাক্ষসের আবির্ভাব হয়। সে প্রহরারত সাত্যকিকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি তোমাদের তিনজনকে খাব বলে এসেছি কিন্তু তুমি চুপচাপ থাক, তাহলে তোমাকে না খেয়ে বাকী দুজনকে (কৃষ্ণ, বলরামকে) খেয়ে আমি চলে যাব।'

রাক্ষসের স্পর্ধা দেখে সাত্যকি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। রাক্ষসকে বললেন, 'যদি তোমার নিজের জীবন বাঁচাতে চাও, তাহলে এইস্থান ত্যাগ করো।'' সাত্যকির কথায় রাক্ষসেরও রাগ বেড়ে যায়। সে বলে —'আমার কথা যখন শুনলে না তখন তোমার মাথাটাই আগে কড়মড় করে চিবিয়ে খাই—বলতে বলতে রাক্ষস সাত্যকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শুরু হল দুজনের মধ্যে তুমুল লড়াই! লড়াই করতে করতে সাত্যকির রাগ যত বাড়ে রাক্ষসের বলও তত বৃদ্ধি পায়। সে সাত্যকিকে কয়েকবার শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় দেয়। ফলে সাত্যকির দুই হাঁটু ছিঁড়ে যায় এবং মুখে আঘাত লাগে। পুনঃসাহস সঞ্চয় করে ক্রোধে দৃপ্ত হয়ে সে রাক্ষসের উপর আক্রমণ শুরু করে। এইভাবে দু'জনায় লড়াই করতে করতে যখন রাত্রির প্রথম প্রহর কেটে গেল, তখন রাক্ষস হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ল। রাক্ষস অদৃশ্য হতেই সাত্যকি বলরামকে জাগিয়ে দিয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত শরীর নিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

এবার বলরামের পাহারা দেওয়ার পালা। তিনি সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে নিদ্রামগ্ন ভ্রাতা কৃষ্ণ ও মিত্র সাত্যকির দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। সহসা সেই রাক্ষসের পুনরাগমন হল। সে এসে বলরামকে পূর্বের ন্যায় বলল, 'আমি তোমাদের তিনজনকে খাব বলে এসেছি কিন্তু তুমি যদি চুপ থাক, তাহলে ঐ দুজনকে খেয়ে আমি চলে যাব।'

বলরাম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে রাক্ষসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যত ক্রোধ প্রকাশ করেন রাক্ষসের শক্তিও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাত্যকির মতো বলরামকেও রাক্ষস আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। উভয়ের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও অতীত হয়ে যায়। রাক্ষসও অদৃশ্য হয়। বলরাম কৃষ্ণকে জাগিয়ে দিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লেন।

এবার নৈশ প্রহরীর ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম, সাত্যকির শয্যা প্রদক্ষিণ করতে করতে তিনি পাহারা দিচ্ছেন। অদৃশ্য রাক্ষস আবার দৃশ্যমান হল। কৃষ্ণ রাক্ষসকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, ''এদের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসেছ কেন? যাও চলে যাও এখান থেকে।''

রাক্ষস কৃষ্ণকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে ঘষতে থাকে। রাক্ষসের দাঁতে দাঁত ঘষা দেখে কৃষ্ণ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেন। ফলে রাক্ষসের রাগ যায় আরও বেড়ে। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে সে কৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কৃষ্ণ ক্রোধহীন চিত্তে রাক্ষসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ভাই তুমি খুব বাহাদূর আছ দেখছি, তোমার শরীরেও বেশ শক্তি আছে।' বাধা পেয়ে রাক্ষস আরও ফুঁসে ওঠে, কিন্তু আশ্চর্য্য সে যত ক্রোধে ফুঁসতে থাকে তত তার শরীরের শক্তি কমে যায় এবং আকারও ছোট হয়ে যায়। ছোট হতে হতে একসময় রাক্ষসের শরীর একটা ছোট কীটের আকার ধারণ করল। কীটাকার প্রাপ্ত রাক্ষসকে কৃষ্ণ তখন মাটি থেকে তুলে কটিবস্ত্রের প্রান্তে বেঁধে রাখলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মমুহূর্তের নিত্য-অপকর্ম সমাপন করে তিনজনে যখন মিলিত হলেন—তখন বনভূমির তরুশাখায় বিহঙ্গের কলকাকলিতে প্রভাতের আগমনী সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। সূর্য্যের আলোয় স্নান হয়ে জেগে উঠেছে সারা বনভূমি। সাত্যকিও বলরামের সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন, মুখমণ্ডল স্ফীত। তা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ উভয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমাদের এই দশা কেন? কে তোমাদের এই অবস্থা করেছে?''

কৃষ্ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে দুজনেই একসাথে বললেন, 'কি বলবো ভাই, কাল রাতে এক ভয়ংকর রাক্ষস এসেছিল। তার সঙ্গে লড়তে গিয়ে আমরা আঘাত প্রাপ্ত হই, যার ফলে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে।'

বলরাম ও সাত্যকির কথা শুনে কৃষ্ণ হেসে ওঠেন এবং বলেন,—'হ্যাঁ, রাক্ষস ভয়ংকরই বটে। আমাকেও কাল রাতে প্রহরা দেওয়ার সময় আক্রমণ করেছিল। তাকে আমি লড়াইয়ে পরাস্ত করে কটি বস্ত্রের প্রান্তে বেঁধে রেখেছি। এই দেখ সেই রাক্ষস।' বলতে বলতে কৃষ্ণ কটি বস্ত্রের বাঁধন খুলে কীটাকার প্রাপ্ত রাক্ষসকে বের করে উভয়ের সামনে রাখলেন। সাত্যকি ও বলরাম বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। উভয়কে বিস্মিত হতে দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা বোধ হয় জান না অথবা চেন না এই রাক্ষসকে। আসলে এই রাক্ষসটার নাম হচ্ছে ক্রোধ। তোমরা এই রাক্ষসকে দেখে যত ক্রোধ প্রকাশ করবে, এর শক্তিও যাবে তত বেড়ে। ফলে নিজেরই ক্ষতি হবে। আমি ক্রোধের পরিবর্তে হাসতে হাসতে শান্ত চিত্তে এর সঙ্গে লড়েছি। তাই এর আকার এত ছোট হয়ে একটা কীটের আকার ধারণ করেছে। ক্রোধের সঙ্গে লড়াই করার সময়, যদি আমরা ক্রোধ না করি, তাহলে ক্রোধ নিজেকে বৃদ্ধি করার সুযোগ পায় না। বরং ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়।'

হঠাৎ বনমধ্যে যাদব সেনাদের কোলাহল শোনা গেল। কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি গতদিনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বারকা নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

রোহিণী মায়ের সাথে

বড়রা অনেক সময় এমন কিছু কথা বলেন যা ছোটরা শুনে ঠিকমত বুঝতে পারে না। ব্রজপুরে বয়স্ক গোপ-গোপীদের যে কথা শুনে কানাই ও তাঁর সখাদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা হল : বলরামের মা রোহিণী, গোকুলের না মথুরার? একবার ব্রজের গোপ-গোপীরা বলে, যশোমতী ব্রজের অধিশ্বরী। আবার যশোমতি মা নন্দবাবা বলেন, রোহিণী ব্রজের অধিশ্বরী। কখনও বলেন ও গোকুলের নয় মথুরার।'

কানাই অনেক ভাবনা চিন্তা করে আপনমনে বিড়বিড় করে বলে, ''রোহিণী মা যদি মথুরারই হয় তাহলে সেই মথুরা কি আমাদের ব্রজমণ্ডলের মধ্যে নয়? যদি মথুরা ব্রজমণ্ডলের মধ্যে হয় তাহলে তো রোহিণীজী আমাদেরই মা। আমাদের সকলের আপনজন। রোহিণীমা এইসময় পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন কানাইয়ের কথা। কানাইয়ের কথা শেষ হলে তিনি কানাইকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—''হ্যাঁ বাবা আমি তোমাদের সকলের মা, তোমাদের সবার আপনজন।'' কানাই রোহিণীমায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, —''আমরা তোমাকে ছোটমা বলে ডাকি কেন?

—আমি যে তোমার যশোমতি মাইয়ার চেয়ে বার বছরের ছোট। তাই আমি তোমাদের ছোটমা।

—কিন্তু তুমি তো মাইয়ার চেয়ে লম্বা? মাইয়াও তোমাকে দিদি বলে ডাকে। পিতাজীও তোমাকে ভাবী বলে, তাহলে তুমি ছোট হলে কী করে? সবাই তোমাকে বড় বলে, অথচ তুমি নিজেকে বলছো ছোট, আমি বুঝতে পারছি না সবাই বড় বলা সত্বেও তুমি ছোট হলে কী করে?'

কানাইয়ের কথা শুনে রোহিণীমা হাসতে থাকেন। তাঁর গণ্ডদেশে আপন গণ্ডদেশ স্থাপন করে আদর করতে থাকেন। কানা আদর খেতে খেতে বলে—''আচ্ছা ছোট মা, দাউ দাদাকে সবাই তোমার ছেলে বলে, আমি কি তোমার ছেলে নই?'' রোহিণী মাইয়ার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। তিনি কানাইয়ের শ্রীমুখকমলে চুম্বন করতে করতে বলেন,—'কে বলে তুমি আমার পুত্র নও? দাউ দাদা যদি ছোট মাইয়ার হৃদয় হয়, তবে তুমি সেই হৃদয়ের স্পন্দন। দাউ দাদা যদি স্পন্দন হয় তবে তুমি অনুভব। তোমার সখারা সব আমার দু-নয়নের আলো।'' কানাইকে কোলে নিয়ে রোহিণী মাইয়া আদর করতে করতে নন্দমহারাজের গৃহ সংলগ্ন বাগান বাড়িতে প্রবেশ করেন। বাগানে একটি লতার পল্লবে ফুল ফুটতে দেখে কানাই রোহিণী মাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল, ''ছোটমা লতার শাখায় এত ফুল ফুটেছে কেন?''

রোহিণী সহসা এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক লীলাবেশে যার কোলে বিরাজ করছেন—তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য ভাবতে হয়? তিনি কানাইয়াকে পুষ্প শোভিত লতার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ''তোমার শৃঙ্গারের জন্য (অর্থাৎ তোমাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য) লতার শখায় অত ফুল ফুটেছে। লতার ফুল সব তোমার খুশির জন্য বাগানে বিকশিত হয়েছে।'

—'সত্যি! ছোট মা, সব আমার জন্য'...আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কানাই রোহিণীর কোল থেকে ঝট করে নেমে পড়ে এবং ছুটে চলে যায় পুষ্পিত লতাটির নিকটে। লতার গায়ে কোমল কর আলতোভাবে রেখে জিজ্ঞাসা করে কানাই,—'তুই আমার! আমার জন্য পুষ্প প্রসব করেছিস। তুই খুব ভালো। আমি তোর পুষ্প রোজ মাথার কেশচূড়ায় লাগাবো।' পুষ্পিত লতাকে আদর করে কানাই ফিরে আসে রোহিণী মায়ের কাছে। রোহিণী মায়ের স্থির বিশ্বাস আগামীকাল থেকে এই লতা আরও অধিক পুষ্প প্রসব করবে। কানাই রোহিণী মায়ের কোলে না উঠে, হাত ধরে ধরে বাগানে ভ্রমণ করতে থাকে। একটি তরুর নিকটে দাঁড়িয়ে সে ছোটমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই বৃক্ষটা এত ছোট ছোট ফল দেয় কেন?' কানাইয়ের প্রশ্নের কোন মাথামুণ্ড

নেই। কিন্তু রোহিণীকে তো কিছু একটা বলতে হবে—তাই তিনি বললেন, 'এই ফল এসেছে মাত্র। আস্তে আস্তে বড় হবে তারপর পক্ক রসাল মধুর হবে।'

—''কি বললে ছোটমা, এই এসেছে মাত্র, তাহলে তা হেঁটে আসতে ফলটার খুব কষ্ট হয়েছে। আমি একে জলপান করাবো'', কানাইয়ের কথা শুনে রোহিণী মায়ের অধরে নির্মল প্রসন্ন হাসি ফুলের মতো বিকশিত হয়। তাঁর এই আদরের পুত্র ব্রজের জীবনদীপ কত সরল আপন ভোলা স্বভাবের। তিনি কানাইয়ের মাথায় চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, 'এ তো এখন সরাসরি মুখে করে কিছু খেতে পারে না, যেমন তোমার আদরের পদ্মগন্ধী গাভীটির গৌরব নামক বৎসটি তোমার মতো পাত্র ভর্ত্তি দুধ মুখে করে খেতে পারে না, মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে পান করে। তুমি বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন কর। বৃক্ষ মূল দ্বারা জলপান করলেই সব ফল তার ভেতর থেকেই জল পান করে নেবে। কানাই বাগানের জলকুণ্ড থেকে জল সংগ্রহ করে বৃক্ষমূলে সিঞ্চন করতে থাকে এবং সিঞ্চন শেষ হলে ঝুঁকে দেখতে থাকে ফল হচ্ছে কিনা।

এমন সময় মধুমঙ্গল সহ সখারা কলরব করতে করতে কানাই-এর সন্ধানে বাগানবাড়িতে প্রবেশ করল। মধুমঙ্গলকে দেখে কানাই ভেংচি কাটে। মধুমঙ্গল রোহিণীমাকে নালিশ করে—'দেখ রোহিণীমা কানাই আমাকে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।' তেজস্বী, দেবপ্রস্থ ইত্যাদি কানাইয়ের চেয়ে ছোট বয়সের সখাদের কানাই যদি ভেংচি কাটতো তাহলে মা রোহিণী কানাইকে বলতেন, 'কানাই ছোট ভাইদের সঙ্গে অমন আচরণ করে না। কিন্তু মধুমঙ্গল কানাই-এর বয়স্ক সখা। সে কানাই-এর চেয়ে বয়সে বড়। তাই রোহিণীমা মধুমঙ্গলকে বললেন, 'তুমি তো বাবা ব্রাহ্মণের সন্তান। তোমার ছোট্ট যজমান কানুর উপর রাগ না করে তাকে কৃপা করা উচিত। ও তো এখন অবোধ বালক, ওর বিরুদ্ধে নালিশ না করে তোমার উচিত ওকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করা।' ছোটমার প্রশ্রয় পেয়ে কানাই তখন বলে ওঠে—'জান তো ছোটমা গতকাল গোচারণের মাঠে, মধুমঙ্গল না আমার কাছে এ-তো-ব-ড় মিঠাই চাইছিল। দুহাত প্রসারিত করে কানাই মিঠাই এর আকার কত বড় তা রোহিণীমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।'

—'জান তো রোহিণীমা, কানাই মিঠাই থেকে ছোট্ট দুটি কণা আমাকে ভেঙ্গে দিতে এসেছিল—আমি তা নেব কেন? তুমি ওকে বলে দাও, এখন থেকে যজমানের কৃপণ হলে চলবে না। ওকে উদার হৃদয় করে গড়ে তোলার জন্যই আমি মাঝে মাঝে ওর হাত থেকে মিঠাই ছিনিয়ে নিয়ে ওকে কৃপা করি। আচ্ছা রোহিণী মা, তোমরা মায়েরা সব মিঠাই অত ছোট ছোট করে তৈরি কর কেন? এবার থেকে খুব বড় বড় করে মিঠাই তৈরি করবে'।

রোহিণী বললেন, 'বাবা, মিঠাই বড় বড় করে তৈরি করলে তোমাদের ভেঙ্গে খেতে অসুবিধা হবে। তাছাড়া তোমার এই ছোট্ট যজমান বড় মিঠাই হাত দিয়ে তুলে খেতেই পারবে না।' বলতে বলতে রোহিণীমায়ের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তিনি মধুমঙ্গলের দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, 'তোমার যদি বড় মিঠাই খাওয়ার সাধ হয়, তবে তুমি আগামীকাল থেকে ওদের সঙ্গে গোচারণে যেও না, বাড়িতে থেকো। আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত বড় বড় মিঠাই তৈরি করে খাওয়াবো'।

—'দেখ রোহিণীমা, আমি যদি এদের সাথে গোচারণে না যাই তাহলে বনের মধ্যে এই ক্ষুদ্র যজমানকে আশীর্বাদ দেবে কে? বানরে না ভাল্লুকে? সেখানে কী আমার মতো নির্লোভী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মিলবে। না-না বড় মিঠাই-এর জন্য আমি আমার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ কাউকে দিতে পারবো না।' মধু-মঙ্গলের বলার ভঙ্গী দেখে রোহিণীমা সহ সকলেই হাসতে শুরু করেন। সখাদের মধ্যে ভদ্র (কানাই-এর কাকার ছেলেও বন্ধু) সহসা রোহিণীমাকে জিজ্ঞাসা করল, —'মা তুমি মল্লবিদ্যা এবং লাঠি চালাতে জান?' রোহিণী ভদ্রর প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি ক্ষত্রিয় রমণী, তাই ছোট থেকেই পিতাশ্রীর কাছে অশ্বচালনা, রথচালনা, খড়গচালনা, মল্লবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা সবই শিখেছি। তোমরা কেউ অসি চালনা করতে জান?' সখারা নিরুত্তর। ভদ্র অবাক হয়ে রোহিণীমায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে বৃদ্ধ গোপ গোপীরা রোহিণীমাকে রাণী বলে সম্বোধন করে। এই সম্বোধন যে শুধু শুধু নয় তা বুঝতে তার বাকী থাকে না। ভদ্র

মধুমঙ্গল সখারা সব রোহিণীমায়ের কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলে যায়। রয়ে যায় শুধু কানাই। সখারা চলে যেতেই যে রোহিণী মাকে বলে—'ছোট মা আমাকে একটা গান শোনাও না?' রোহিণীমা বাগানের কদম্ব তরুতলে কানাইকে কোলে নিয়ে বসলেন। তারপর শুরু করলেন গান—

ওরে আমার হৃদয়ের নিধি, নাড়ী ছেঁড়া ধন।
তোরে জড়িয়ে ধরে, শীতল করি তপ্ত জীবন।।
নয়নের তারা তুই, প্রাণের আনন্দ অনুভব।
সকল সম্পদের সার তুই, ব্রজের গৌরব।।
তুই নীলমণি নন্দ যশোদার বুকের স্পন্দন।
গোঠের রাজা তুই, তোরে পেয়ে ধন্য বৃন্দাবন।।

কানাইকে কোলে বসিয়ে দোলা দিতে দিতে রোহিণী মা গুন গুন স্বরে গান গাইতে থাকেন। রোহিণীর গান শুনে বাগানে তরু শাখার পাখীরা চুপ হয়ে যায়। গোপাল ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত গোপালকে নিয়ে রোহিণীমা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্বর্ণপালঙ্কে দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল শয্যায় শুইয়ে দিলেন।

ভীম, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণমায়া

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন বিষণ্ণ, চিন্তিত! তিনি উদাস চঞ্চল চিত্তে আপন কক্ষের মধ্যে পায়চারী করছেন। ভীমকে ঐরূপ চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখে মাতা কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ভীম আজ সারাদিন অভুক্ত রয়েছে, আমি ভোজনের জন্যে বার বার পীড়াপীড়ি করেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে কিছু খাওয়াতে পারিনি। ভোজন যার প্রিয় সে আজ সারাদিন একদানাও মুখে তোলেনি, মনমরা হয়ে সারাদিন ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে দেখে খুব খারাপ লাগছে। তুই একবার ওকে খাওয়ার জন্য বল না?''

খাওয়ার জন্য যে মায়ের অনুরোধ আহ্বান কানে তোলেনি সে কি অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনবে? ব্যর্থ হয়ে তাই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের শরণ নিলেন। পাণ্ডবদের পরমাশ্রয় সখা কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-এর কাছে ভীমের সারাদিন উপবাস করার কথা এবং সে কারণে জননী কুন্তীদেবীর উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা শুনলেন। তিনি যুধিষ্ঠির ও কুন্তীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ''এই নিয়ে ভাববার কিছু নেই, আমি দেখছি কি করা যায়।'' তাঁর কথা শুনে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ও জননী কুন্তী নিশ্চিন্ত হলেন।

ভীমসেন আজ চিন্তিত, বিষণ্ণ-উদাস চঞ্চল কেন? কারণ কী? গতরাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশের পূর্বে তিনি গবাক্ষপথে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, তাঁর অগ্রজ মহারানী দ্রোপদীর পদতলে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়ে চমকে উঠলেন, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন 'দ্রৌপদীর স্পর্ধা কম নয়, সে আমাদের অগ্রজের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা জানে না, তাঁর (দ্রৌপদীর) এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ অকল্পনীয়। ঐ রকম আচরণ বা ধৃষ্টতা যদি আমার সঙ্গে করে তাহলে আমি কি করে তা সহ্য করবো?'

স্বামী স্ত্রী বা দম্পতি যুগলে আপন কক্ষে কিভাবে উপবেশন বা অবস্থান করবে তা নিয়ে কারও ভাবনা-চিন্তা করা উচিত নয়। প্রেমের ক্ষেত্রে বড়-ছোটর ভেদ থাকে না। পত্নীর মধ্যে প্রণয়জনিত মান-অভিমান দেখা দিলে, পতি তার মান অপনোদনের জন্য অনুনয়-বিনয় করতেই পারেন ঠিক এইরকম এক পরিস্থিতিতেই গবাক্ষ পথ দিয়ে ভীমসেনের দৃষ্টি পড়ে দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পদতলে কেন বসে আছেন—এটা ভীমের মতো মহাবলশালী ব্যক্তি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। স্বীয় সরল স্বভাব বশতঃ তিনি মনে করছেন দ্রৌপদীর অহংকার হয়েছে। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাকেও অনেক কাজ করতে হয়। সেই সময় দ্রৌপদী যদি তাঁর সঙ্গে ঐরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে...আর ভাবতে পারেন না মধ্যম পাণ্ডব। রাত্রিতে শয্যায় শুয়েও ঘুম আসে না চোখে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শয্যায় এপাশ-ওপাশ করে যখন দেখলেন কিছুতেই ঘুম আসছে না, তখন শয্যাত্যাগ করে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে এলেন এবং ভীমকণ্ঠে শুরু করলেন ভজন গান—

''শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
মুকুন্দ গোপাল কৃষ্ণ মধুসূদন শ্রীমাধব।।''

ভীমের মেঘ মন্ত্র কণ্ঠের ভজন গান শুনে প্রাসাদের সবার নিদ্রা গেল ভেঙ্গে। মহারানী দ্রৌপদী ধর্মরাজকে বললেন—'ছোট ভাইকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে গান গাইতে নিষেধ কর। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথামত প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন—তাঁর মধ্যম ভাই উল্লসিত হয়ে ভজন গাইছে। তিনি ভাইকে স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, ''ভাইয়া, ভগবানের নাম সংকীর্তন অতি উত্তম কর্ম, তুমি যদি একান্তে বসে এই নাম সংকীর্তন কর, তাহলে আরও উত্তম হয়। কারও নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটিয়ে নাম সংকীর্তন করা উচিত নয়। নিজের ধর্ম যেন অপরের কষ্টের কারণ না হয়—এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।''

ভীমসেন অগ্রজের কথা মেনে নিলেন। কিন্তু আরও উদাস হয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠ সুরেলা নয়। এতে তাঁর কি দোষ? তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে পদব্রজে রাত্রির শেষ প্রহরের কিছুপূর্বে যমুনার তটে উপস্থিত হলেন। নিস্তব্ধ রাত্রি, মেঘ মুক্ত আকাশে শীতল জ্যোৎস্নামৃতবর্ষী চন্দ্রদেব গগনে দীপ্যমান। পদব্রজে ভীমসেন যে প্রাসাদ থেকে অনেকখানি পথ চলে এসেছেন, এ খেয়াল তাঁর নেই। যমুনার তীরে এসে তিনি চারিদিক দৃষ্টিপাত করে দেখলেন—এখানে কেউ শুয়ে নেই। এখানে যদি নাম সংকীর্তন করি তাহলে কারও নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটবে না। যমুনার তটে বসে মেঘনিনাদী কণ্ঠে শুরু করলেন সংকীর্তন—

''প্রাণ গোপাল, কৃষ্ণ গোপাল, ...গোপাল রে।
একবার এসে দাও হে দেখা আমারে।
মুকুন্দ গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ মধুসূদন
দয়া করে আমায় কর একটু কৃপা বরিষণ
প্রাণ গোবিন্দ পরমানন্দ কৃপা কর কৃপা কররে।।

ভীমসেন নাম সংকীর্তন করতে করতে তন্ময় হয়ে গেলেন। দুঃখী, উদাস-বিষণ্নমনা চিত্ত তার প্রসন্নতায় ভরে গেল। অর্দ্ধ-উন্মিলিত নেত্রপথ দিয়ে অনর্গল অশ্রু ঝরছে। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, কণ্ঠ নাম রসে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। (ভীমসেন মনে মনে ভাবে তাঁর কণ্ঠ বড়ই শ্রুতিমধুর)। সাধারণত সঙ্গীতের স্বর শুনে বনের হরিণ মুগ্ধ হয়। কিন্তু ভীমের সঙ্গীত শুনে বনের হরিণ তো দূরের কথা সিংহও ভয় পেয়ে বনের গভীরে পালিয়ে গেল।

এই মুহূর্তে একজন আছেন ইন্দ্রপ্রস্থে যিনি ভীমের নাম-সংকীর্তনে মুগ্ধ হয়ে ঐ রাত্রেই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ভীমের কাছে এসে উপস্থিত হন। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাকে সুর-তাল-ছন্দাদি বাহ্য উপকরণ দ্বারা বশীভূত বা প্রসন্ন করা যায় না।

তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় সুরবেসুর দেখে না। দেখে সুরে কতখানি প্রেম মিশে আছে। প্রেমের ভাষা প্রেমের স্বাদ গ্রহণের জন্য তিনি সদা পিপাসু। ভীমের কণ্ঠস্বর যতই কর্কশ-কটু হোক না কেন, সে তো প্রেমে মত্ত হয়ে নাম-সংকীর্তন করছে, তিনিও সেখানে তদ্রুপ তন্ময় হয়ে মৃদু মৃদু নৃত্য শুরু করলেন। পদ্মনয়ন দিয়ে তাঁর টপটপ করে মাটিতে অশ্রু ঝরে পড়ছে। শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত—তিনি ধীরে ধীরে করতালি দিতে শুরু করেন। করতালির শব্দে ভীমের তন্ময়তার ঘোর কেটে যায়। সংকীর্তন বন্ধ হয়ে যায়। আঁখি খুলে সামনে কৃষ্ণকে দেখে আশ্চর্য হয়ে ভীম বললেন, ''কৃষ্ণ তুমি এখানে এই সময়ে? (নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ভীমের কনিষ্ঠ ছিলেন, তাই ভীম তাঁকে নাম ধরেই সম্বোধন করতেন।)

শ্রীকৃষ্ণ আপন উত্তরীয় দিয়ে নিজের নয়নের অশ্রু ও ভীমের নয়নের অশ্রু মুছে দিয়ে বললেন, 'ভাই ভীমসেন, তুমি যে এত মধুর সুরে সংকীর্তন করতে পার তা আমি আগে জানতাম না। আজ তোমার নাম-সংকীর্তন আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। আমি প্রসন্ন—তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমার মন যা চায় তুমি তাই প্রার্থনা কর। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই।'

ভীমসেন কৃষ্ণের কথা শুনে একবার মুহূর্তের জন্য ভাবলেন, কৃষ্ণ তাকে উপহাস করছে না তো? অনতিপূর্বে উত্তরীয় দিয়ে নিজের নয়নের এবং তাঁর নয়নের অশ্রু মুছে দিয়েছে কৃষ্ণ ... একথা মনে হতেই ভীম নিশ্চিন্ত হল। মনে মনে ভাবল আমার গান যখন কৃষ্ণের ভালো লেগেছে তখন সংসারের অন্যান্য সকলের ভালো লাগুক ছাই না লাগুক, তাতে আমার কী আসে যায়। আমার কীর্তন শুনে কৃষ্ণ খুশী হয়েছে আনন্দ পেয়েছে আমার আর কী পাওয়ার বাকী আছে যা তার কাছে চাইব?'

—'বর প্রার্থনা কর, মধ্যম ভ্রাতা'—কৃষ্ণ পুনরায় অনুরোধ করেন। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ভীম বললেন,—'জগতের মুনি-ঋষিরা বার বার তোমার মায়া নিয়ে নানা কথা বলেন। আমি ওই মায়াকে দেখতে চাই।'

—ভ্রাতা ভীমসেন, আমাকে দেখ। আমার মায়াকে দেখে কী করবে?''—শ্রীকৃষ্ণ অনীহা প্রকাশ করেন।

ভীম বললেন—'তোমাকে তো দেখছি, দেখবও কিন্তু তোমার মায়াকে দেখিনি—তাই হে কৃষ্ণ বর দিতে যদি অভিলাষী হও, তবে তোমার মায়াকে একবার আমায় দেখাও'।

—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মধ্যমপাণ্ডব। আগামী রাত্রির প্রথম প্রহরে তুমি পুনঃ এই যমুনা তটে এসে ঐ যে বটবৃক্ষ দেখছ, ঐ বটবৃক্ষের শাখায় আরোহণ করে আত্মগোপন করে থাকবে। বটবৃক্ষের সামনে যে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, শাখায় আত্মগোপন করে তা সাবধানে প্রত্যক্ষ করবে। উভয়ে বাক্যালাপ করতে করতে প্রাসাদের দিকে রওনা দিলেন।

ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণের কথামত পরের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়ে বটবৃক্ষে আরোহণ করে শাখায় আত্মগোপন করে রইলেন। বটবৃক্ষের সামনে যে বিশাল উন্মুক্ত সমতল প্রান্তর ছিল তার আশেপাশে কোন তরুলতা ছিল না। যমুনার তট হতে কিছুটা দূরে বনের মধ্যে অবস্থিত এই প্রান্তর। প্রান্তরের মধ্যে শুধু ঐ বটবৃক্ষটি মাথা তুলে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। ভীমও একাকী ঐ বৃক্ষের পত্রশাখার অন্তরালে লুকিয়ে রইলেন। চন্দ্রকৌমুদী স্নাত বন প্রান্তর বড়ই মনোরম। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক-বন্যপশুর রাত্রি বিচরণ-অদূরেই যমুনার কলকল নাদ প্রাকৃতিক পরিবেশকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। ভীমসেন বৃক্ষশাখা থেকে প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখেন কতগুলি জ্যোতির্ময় দেহধারী পুরুষ ঐ প্রান্তরে সমবেত য়ে প্রান্তরটিকে দিব্য-সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করছেন। পরিষ্কার অন্তে তরল সুগন্ধি দিব্য পাত্র হতে পারিজাত-মন্দার পুষ্প যোগে প্রান্তরময় ছিটিয়ে দিচ্ছেন। বিস্তৃত প্রান্তরে বহুমূল্য আস্তরণ বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর আরও অনেক জ্যোতির্ময় দেহধারী পুরুষ (বোধহয় সব দেবতাই হবেন, ভীম ভাবছেন) অনেকগুলি রত্নখচিত সিংহাসন সহ সেখানে উপনীত। সিংহাসনগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করলেন। প্রান্তর মধ্যে এক দিব্য বেদী নির্মাণ করে তার উপর একখানি জ্যোতির্ময় বৃহৎ সিংহাসন স্থাপন করলেন। দেখে মনে হয় কোন রাজাধিরাজ ঐ সিংহাসন অলঙ্কৃত করবেন। এর কিঞ্চিত নিম্নভূমিতে আর একখানি অপেক্ষাকৃত কম জ্যোতির্ময় রত্নসিংহাসন স্থাপন করা হল। এর কাছেই পূর্বাপেক্ষা আরও কম জ্যোতির্ময় ছয়খানি সিংহাসন তিন জোড়ায় অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন করে পাশাপাশি স্থাপিত হল। বটবৃক্ষের শাখা থেকে ভীম দেখছেন এইসব দৃশ্য আর ভাবছেন—আজ নিশ্চয়ই এখানে দেবতাদের কোন সভা-টভা হবে। বৃহৎ জ্যোতির্ময় ও অপেক্ষাকৃত কম জ্যোতির্ময় সিহাসনগুলির চারপাশে অজস্র সিংহাসনের পংক্তি রচনা করা হল। আকাশে চন্দ্রদেব কিরণ দিচ্ছেন। দেবতাদের শরীরও জোতির্ময় আলো দিয়ে তৈরী-তৎসত্বেও প্রজ্বলিত মশাল হস্তে দেবসেবকরা স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। সশস্ত্র প্রহরীরাও আপন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে দেব-প্রধানরাও উপনীত হলেন। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, কুবের, যম সকলেই সুসজ্জিত পোষাকে বাহন সহ সেখানে উপস্থিত হতেই-ভীমসেন বাহন দেখে তাদের চিনে ফেললেন। বাহন দূরে সরিয়ে রেখে, দেব সেবকরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট পংক্তিস্থিত সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রধান সব সমবেত হয়েছেন। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক তথা সত্যলোক হতে সব মহর্ষিরাও এসেছেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তপস্বী-মুনি-ঋষি বিদ্বানরাও উপস্থিত হয়ে আপন আপন আসন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরও রয়েছেন। অনেকের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে চিনে নিতে ভীমসেনের অসুবিধা হল না।

শেষে এলেন হংসবাহনে চেপে সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা। গরুড়াসনে উপবিষ্ট হয়ে এলেন লক্ষ্মী নারায়ণ, বৃষভারূঢ় হয়ে এলেন শিব-পার্বতী। তিন দেব-দম্পতি পূর্বকথিত তিন জোড়া রত্ন সিংহাসনের উপর উপবেশন করলেন। বট-শাখায় আরূঢ় হয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ভীমসেনের হৃদয়ে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়ে তাঁর সমগ্র হৃদয়কে তোলপাড় করে তুললো। তাঁর ভাবনায় স্পন্দন হতে লাগলো—ঐ বিশাল উঁচু জ্যোতির্ময় সিংহাসনে কে বসবেন? অল্প নিম্নে অপেক্ষাকৃত কম জ্যোতির্ময় সিংহাসনেই বা কে উপবেশন করবেন? ভীমসেনের এই ভাবনাজনিত আলোড়ন বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তিনি অবাক চোখে চেয়ে দেখলেন, তাদের প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আসছেন। সমস্ত দেবতারা, তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের

দিকে তিনি নামমাত্র দৃষ্টিপাত কলেন। ত্রিদেব দম্পতির সাথে অল্পক্ষণের জন্য কুশলাদি বিনিময় করে তিনি অপেক্ষাকৃত কম জ্যোতির্ময় দ্বিতীয় রত্নসিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হলেন। হঠাৎ সব উঠে দাঁড়ালেন। মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল—''আদ্যাশক্তি যোগমায়া কী জয়! যোগমায়া কী—জয়! পরমজননী কী—জয়! সবাই যুক্ত করে মস্তকনত করে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। অপলক নেত্রে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভীমসেন দেখছেন মহারানী দ্রৌপদী প্রবেশ করছেন এবং কারও দিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় বৃহৎ সিংহাসনখানি অলংকৃত করলেন। ত্রিদেব দম্পতিসহ সকলে নতশিরে প্রণাম জানালেন—তিনি মৃদু হাসির বিনিময়ে তাদের প্রণাম গ্রহণ করলেন। অল্প নিম্নস্থিত জ্যোতির্ময়ী সিংহাসনে সমাসীন কৃষ্ণের দিকে চেয়ে দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করলেন—'সব এসে গেছে? কৃষ্ণ বললেন, পাণ্ডবরা কিছুক্ষন আগে এসেছেন।'

দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীম কোথায়? ভীমকে দেখছি না কেন?' তাঁর রক্ত পাণ না করা পর্যন্ত আমার হৃদয়ের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হবে না। দ্রৌপদীর তেজদৃপ্ত কণ্ঠের বাক্য শুনে বটবৃক্ষস্থিত ভীমসেনের সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল। তাঁর মত বীরও ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব যে স্থানে আসন অলংকৃত করে বসে আছেন, দ্রৌপদী সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন। আমার হৃদয়ের প্রজ্বলিত ক্ষুধাগ্নিকে শান্ত করার দায়িত্ব তোমাদের এটা যেন স্মরণ থাকে। বল, ভীমসেন কোথায়? চারভাই উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত স্বরে বললেন—'ও রাজপ্রাসাদে নেই'।

—'অনুসন্ধান করে দেখ সে কোথায়?' দৃপ্ত কণ্ঠে আদেশ করার ভঙ্গিতে বলেন মহারানী দ্রৌপদী।

উক্ত সভায় দেবর্ষি নারদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যুক্ত করে বললেন—'যদি অনুমতি দেন তাহলে বলি, ভীম কোথায়।' দ্রৌপদী অনুমতি দান করলে নারদ বললেন—'ভীমসেন বর্তমানে এই প্রান্তরের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখায় লুকিয়ে বসে আছেন।

দ্রৌপদী কড়া সুরে নির্দেশ দেন—'ধরে নিয়ে এস তাকে।' আদেশ পাওয়া মাত্র দেব সেবকরা জলন্ত মশাল হাতে বটবৃক্ষের দিকে এগিয়ে যান। ভীমসেন তাদের আসতে দেখে ভয়ে বটবৃক্ষ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেন। নীচে পড়েই ভীমসেন চকিত নয়নে এদিক ওদিক চাইতে থাকেন। কোথায় দেব-সেবক? কোথায় দেবতা? দেবসভাই বা গেল কোথায়? ঋষি-মুনি-পাণ্ডব দ্রৌপদী সব উধাও। কোথাও কিছু নেই। বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরও পরিস্কৃত। ভীমসেন বিস্মিত ভয়ার্ত হৃদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে চলতে শুরু করেন। পথে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ভীমকে দেখে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই ভীমসেন, তোমাকে এত ভীত সন্ত্রস্ত, বিষণ্ণ চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি আমার মায়ার দেখা পেয়েছ?''

—'দেখেছি কৃষ্ণ, তোমার মায়াকে আমি দেখিছি, কিন্তু কৃপা করে এইরকম মায়া তুমি আমাকে আর কখনও দেখিও না।' অনুনয়ের সুরে ভীম কৃষ্ণকে অনুরোধ জানায়।

ভীমসেনের সঙ্গে কৃষ্ণ রাজভবনে ফিরে আসেন। ভীমের মুখ নীচু হয়েই আছে, তিনি কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে পারছেন না। সবসময় উদাস বিষণ্ণ হয়েই থাকছেন, মাতা কুন্তী তা লক্ষ্য করে, কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভীমসেন সেদিন রাত্রে বটতরু শাখায় লুকিয়ে থেকে যা দেখেছিলেন মাকে সব প্রকাশ করে বললেন। মা সব শুনে বললেন, 'এতে ভয় পেয়ে বিস্মিত হওয়ার কি আছে?'' ভীম বললেন, 'মা, শ্রীকৃষ্ণ যা দেখিয়েছে তা নিরর্থক নয়।' আমি বুঝেছি দ্রৌপদী স্বয়ং আদ্যাশক্তি যোগমায়া, কিন্তু ওর হৃদয়ের অপূর্ণ পাত্র আমার রক্ত ছাড়া পূর্ণ হবে না, এই কথাটা মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। মাতা কুন্তী ভীমকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাল প্রাতে দ্রৌপদী যখন আমায় প্রণাম করতে আসবে, তখন তুই আমার পেছনের কক্ষে লুকিয়ে থাকবি—তাহলে তোর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

পরদিন প্রভাতে দ্রৌপদী যখন শশ্রুমাতা কুন্তীদেবীর চরণ বন্দনা করার জন্য উপনীত হন তখন কুন্তীদেবী বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করার পর বললেন, 'বৌমা আজ আমি তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করবো। তুমি কথা দাও তা পূরণ করবে?'

দ্রৌপদী বললেন,—''নিঃসঙ্কোচে বলুন, কি আপনার প্রার্থনা বৌমা?''

তুমি আমার পঞ্চপুত্রের জীবন বরদান কর।

দ্রৌপদী বর প্রার্থনা শুনে সহসা চমকে উঠেন, পরে নতশিরে শশ্রুমাতাকে বলেন, 'তথাস্তু! মাতাজী।'

এই ঘটনা যদি ইন্দ্রপ্রস্থের অন্দরমহলে না ঘটতো—তাহলে মহাভারতের যুদ্ধস্থলে আমরা কী ভীমকে পেতাম? এর উত্তর আমার, জানা নেই।

বিরাট রাজার অন্তঃপুরে

পাণ্ডবদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হয়েছে। তারা বিরাট নগরের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। মহারাজ বিরাট নিজ কন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ দিয়েছেন। বিবাহোপলক্ষে বলরাম কৃষ্ণসহ সুভদ্রা বিরাট নগরে এসেছেন। বিবাহের পর বলরাম দ্বারকায় ফিরে গেছেন। কৃষ্ণ বিরাট রাজার গৃহেই থেকে গেছেন।

পাণ্ডবরা গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেন, কৌরবরা সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। এ কারণে পাণ্ডবরাও তারাও সৈন্য সংগ্রহের জন্য দিকে দিকে দূত প্রেরণ করলেন। দ্বারকা থেকে যাদব মহারথী সাত্যকি নিজ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে বিরাটনগরে উপস্থিত হলেন। অন্যদিকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পাণ্ডবদের রাজ্য সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি অনুরোধপত্র লিখে নিজ পুরোহিতকে অনুরোধ করলেন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সশরীরে উপনীত হয়ে পত্রটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ধৃতরাষ্ট্র পত্র পাঠান্তে পাঞ্চাল রাজপুরোহিতকে বললেন, 'আমার যা বক্তব্য তা অমাত্য সঞ্জয় বিরাটনগরে গিয়ে পাণ্ডবদের জানিয়ে আসবে।'

ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা নিয়ে সঞ্জয় এলেন বিরাটনগরে। তিনি রাজপ্রাসাদে পৌঁছে পাণ্ডবদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন সেই কক্ষের শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্ধশায়িত অবস্থাণ করছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের যুগল পদকমল সংবাহন করছেন। অর্জুনের দুই চরণের একখানি পালঙ্কের উপর লম্বমান হয়ে মহারানী দ্রৌপদীর কোলে শোভা পাচ্ছে—অন্যচরণ কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা নিজের অঙ্কে স্থাপন করে সংবাহন (পা মর্দন করা বা পা টিপে দেওয়া) করছেন। সঞ্জয়কে দেখে সকলেই উঠে অভ্যর্থনা জানালেন। দ্রৌপদী, সত্যভামা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অন্তঃপুরের অন্য কক্ষে প্রবেশ করলেন। অর্জুন সঞ্জয়কে উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করলেন। উপবেশনান্তে সঞ্জয়, পাণ্ডব ও পাণ্ডবপক্ষীয়দের একত্র করে ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা বা সন্দেশ ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন—''তিনি সন্ধি চান। সন্ধিই শান্তি স্থাপনের সর্বোত্তম উপায়।'' অধিকন্তু কুরুরাজ এও বলেছেন যে, ''যদি কৌরবরা বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের রাজ্যভোগের অধিকার প্রদান না করে তাহলে পাণ্ডবদের উচিত অন্য রাজাদের রাজ্যে থেকে ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করা এতে পাণ্ডবদের কল্যাণ হবে। যুদ্ধে অনর্থক রক্তক্ষয় করে রাজ্য লাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করা অধিক শ্রেয়। সুতরাং পাণ্ডবরা যেন অনর্থক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে প্রয়াসী না হয়। কারণ ধনতৃষ্ণা বা রাজ্যতৃষ্ণা সর্বদাই অনর্থকারী।' সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের বার্তায় শুধু পাণ্ডবদের উপদেশ প্রদান। যদি কেউ সম্পত্তি বা রাজশক্তি হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অন্যকে সে সত্ব ভোগ করতে না দিয়ে কেবল উপদেশ প্রদান করে তবে সেই উপদেশপূর্ণ কথার কি মহত্ব বা মূল্য আছে? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন, ''এখানে ভগবান বাসুদেব রয়েছেন, তিনি সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, নীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মনীষী। পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষের হিতই তার অভীষ্ট। সুতরাং এবিষয়ে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করবেন আমরা তাই গ্রহণ করব। আমরা কখনও তাঁর বচন অমান্য করি না।''

যুধিষ্ঠিরের কথা শেষ হলে শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কে উপবিষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান থেকে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'অমাত্য মহোদয় আমি যেমন পাণ্ডবদের হিত কামনা করি, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেরও সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয় কামনা করি। আমার একমাত্র ইচ্ছা দুইপক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হোক। কিন্তু কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা যদি লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজ্যভোগের অধিকার আত্মসাৎ করতে চায়—তাহলে তো যুদ্ধ অনিবার্য। যারা ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী তারা না হয় মাধুকরী করে দিনাতিপাত করবে। তুমি তো ধর্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ধর্ম কি তা তোমার অজ্ঞাত নয়। তুমি কোন মুখে বললে—বিনা যুদ্ধে কৌরব রাজ্য সমর্পণ না করলে, পাণ্ডবরা যেন অন্য রাজার রাজ্যে থেকে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করে?

কোন ধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তুমি কৌরবপক্ষকে সমর্থন করতে চাইছ? মহারাজ যুধিষ্ঠির শাস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রবিদ, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী। এমতাবস্থায় পাণ্ডবরা কেন স্বধর্মানুযায়ী কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত হবে? ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা যদি দৈববশতঃ মৃত্যুও প্রাপ্ত হয়, তবে সে মৃত্যু ভিক্ষান্নে জীবনপাত করার চেয়ে অনেক শ্রেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি রাজার ধর্ম নয়? অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পালিয়ে যাওয়াই কি ধর্ম? এরূপ করলে কি শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়? পাণ্ডবরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক—এটা কি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ধর্ম নির্ণয়? ধৃতরাষ্ট্র সহ তাঁর পুত্রেরা অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজ্য সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়—আর তুমি বলছ কিনা পাণ্ডবরা যুদ্ধ না করে যেন শান্তির জন্য প্রয়াসী হয়? তোমার মুখে শান্তির প্রস্তাব শুনে মনে হচ্ছে, কোন লুটেরা দস্যু গৃহে প্রবেশ করে ধনসম্পদ হরণ করছে, মা বোনেদের অমর্যাদা করছে, গৃহের মালিক রুখে দাঁড়ালেই তাঁকে শান্ত হয়ে থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।" গলার স্বর আরও উঁচুতে চড়িয়ে কৃষ্ণ সঞ্জয়কে বলেই চলেছেন—"তুমি, তোমাদের পক্ষের ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সেদিন সব কোথায় ছিল, যেদিন একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে দুঃশাসন তাঁকে সভামধ্যে বহুলোকের কামাতুর দৃষ্টির সামনে এনেছিল? ওই সময় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কেন বাধা দেননি দুঃশাসনকে? এতে তো উভয়পক্ষের কল্যাণ হত। সঞ্জয়, তোমার অন্ধরাজার উপদেশ শুধু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য। দুর্যোধন, দুঃশাসনরা যা খুশি হয় তাই করুক—পাণ্ডবরা যেন কিছু না করে। কপট পাশা খেলায় পরাজিত হওয়ার পর যখন সুতপুত্র কর্ণ বলল—পাঞ্চালী কৃষ্ণা, এখন তোমার দুর্যোধন ছাড়া গতি নেই, অতএব তুমি দাসী হয়ে দুর্যোধনের মহলে প্রবেশ কর। তোমার পতিরা খেলায় হেরে গেছে, এখন তুমি দ্বিতীয় পতি গ্রহণ কর। পাণ্ডবরা যখন মৃগচর্ম পরিধান করে বনগমনের জন্য উদ্যত তখন দুঃশাসন বলেছিল—'নপুংসক পাণ্ডবরা সর্বশক্তিহীন হয়ে গেছে। চিরকালের জন্য এরা নরককুণ্ডে পতিত হয়েছে। সঞ্জয় তুমি কি মনে কর ঐসব দুষ্টরা নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী যা খুশী দুষ্টাচরণ করে বেড়াবে, আর তাই মেনে নিতে হবে? এ কখনই সম্ভব নয়। আমি তা হতে দেব না—এতৎ সত্ত্বেও আমি শান্তি চাই। প্রয়োজনে আমি হস্তিনায় যাব—শান্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। সফল হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। মনে রেখ, পাণ্ডবরা বৃক্ষ আর কৌরবরা লতা। বৃক্ষের সহায়তা ছাড়া লতার বৃদ্ধি হয় না। পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের সেবার জন্যও প্রস্তুত, আবার ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের জন্যও তৈরি। এখন ধৃতরাষ্ট্রই স্থির করুন, তিনি কি চান—যুদ্ধ না শান্তি? যদি শান্তি চান উত্তম। অন্যথায় যুদ্ধই যদি তাঁর কাম্য হয় তবে জেনে রাখ, তাঁর পুত্রদের মহাবিনাশের হাত থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না।"

সঞ্জয় নিরুত্তর। ভেবে পাচ্ছেন না কী উত্তর দেবেন তিনি। তিনি নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির তাকে যথোচিত সৎকার করে, তাঁর মারফৎ হস্তিনাস্থিত গুরুজনদের প্রণাম-অভিবাদন জানিয়ে বিদায় দিলেন।

সঞ্জয় বিদায় নেওয়ার পূর্বে একবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তঃপুরে মিলিত হলেন। অতঃপর হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যশোদার অঙ্গনে

নীলমণি শ্যামসুন্দর গৃহ অঙ্গনে সখাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত। খেলতে খেলতে খাওয়ার কথা ভুলে গেছে সে। সকাল থেকেই চলছে বিরামহীন খেলা। সখারা কৃষ্ণের নয়ন কমলের উপর একখানি পাতলা রেশমী বস্ত্রের আচ্ছাদন পরিয়ে দিয়ে বাড়ির প্রাঙ্গণে সব 'কানামাছি' খেলছে। কৃষ্ণ চোখ বাঁধা অবস্থায় আশপাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সখাদের হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। সখারা সরে সরে যাচ্ছে আর বলছে—''কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ''—ব্রজের গোপীরাও সে দৃশ্য উপভোগ করছেন নন্দমহারাজের বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। মা যশোমতিও রান্না ঘরের বারান্দায় মাখন মিছরি ভর্তি থালা সাজিয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে নীলমণি সহ সখাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন—'বাছারা, বড় ভালো হত যদি একটু খেয়ে নিয়ে আবার খেলতে, ওরে ও লালা বন্ধুদের নিয়ে আমার কাছে আয় না বাবা।' উপস্থিত গোপবধুরা বলছেন, 'দেখছ না তোমার নীলমণি এখন খেলায় মত্ত। এসময় তোমার ডাক কি ওদের কানে ঢুকবে?' 'এমনিতে আমার লালা তো কিছুই খেতে চায় না। ওর দাদা বলাই এবং অন্য সখারাও হয়েছে ঠিক ওরই মতো। সব ক্ষিধে পেটে ধরে যে কী করে থাকে বুঝি না, এই জন্যই সব দুর্বল-রোগা হয়ে যাচ্ছে।' গোপবধুদের সাথে কথা বলতে বলতে মা যশোমতীর পয়োধর থেকে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়ে বুকের বস্ত্রাঞ্চল ভিজে যায়। তা দেখে গোপবধুরা মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকেন। যশোমতি সেদিকে লক্ষ্য না করে বলেন,—'ব্রজে তোদের যত পুত্র আছে আমি তো তাদের সবার ধাত্রী মা। এই ব্রজপুরে এমন কোন ছেলে নেই যে আমার বুকের দুধ পান করেনি। তোদের সবার আশীর্বাদেই তো আমি নীলমণিকে পেয়েছি। ও তো আসলে তোদেরই ছেলে—আমি তো শুধু...। 'কি হলো তোরা সব হাসছিস যে, শোন তোরা সব ছেলের মা হলেও, এখনও কিন্তু আমার বুকের দুধ খাওয়ার বয়স তোদেরও আছে।'

বাৎসল্যময়ী যশোদার কাছে গোপবধুরা শিশুকন্যা সদৃশা; তাদের পুত্ররাও যশোদার দৃষ্টিতে চিরশিশু। কিছু না খাওয়াটাই যেন বাচ্ছাদের কাছে প্রিয়। 'আবার খেতে যদি বসে তাহলে পাখীর মতো দু'একটা দানা মুখে তুলেই ওরা খাওয়া শেষ করে দেয়। এইজন্য তো সব দুর্বল-কৃশকায়। দেখলে মনে হয় সব হাওয়া লেগে উড়ে যাবে।' গোপীদের শুনিয়ে শুনিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন মা যশোমতি। সখাসহ কানু-বলাই খেতে আসতে দেরী করায় তিনি একখানি মৃন্ময় পাত্র নিয়ে তক্র তৈরীতে মনোনিবেশ করলেন (তক্র অর্থাৎ ঘোল)।

—'মাইয়া, তোমার দাউ (বলরাম) কখনও খাওয়া নিয়ে অশান্তি করে?' গোপবধুরা যশোমতিকে জিজ্ঞাসা করেন।

—'দাউকে যে খাবার দিই না কেন ও সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরে নেবে। ওকে খাইয়েই যা হোক একটু শান্তি পাই। তবে হ্যাঁ স্বর্ণরোমা পদ্মগন্ধা গাভীর দুগ্ধ নির্মিত দহী ওর খুব প্রিয়। নীলমণি, ভদ্র এরা ভালোবাসে পদ্মগন্ধা কপিলার দুধ।'

—'তোমার নীলমণির তো বেশি প্রিয় তোমার বুকের দুধ, তাই না? গোপীরা জিজ্ঞাসা করে।

—''তা যা বলেছিস, তবে সবসময় তো বুকের দুধ দেওয়া যায় না—তাই গাভীর দুধও ওকে পান করাই। ছোট থেকেই এরজন্য আমাকে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। দু ঢোক দুধ পান করানোর জন্য ওকে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে হত—এখনও করতে হয়, আমার বলাই-এর কিন্তু ওসব নেই। খাওয়ার ব্যাপারে ও সবার চেয়ে আগে। কিন্তু একবার যদি গোঁ ধরে নাহুঁ নাহুঁ করে তাহলে কার সাধ্যি বলাইকে খাওয়ায়—লাখ চেষ্টা করো ও খাবার-এর পাত্র পানে ফিরেও চাইবে না।'' যশোমতি, গোপীরা যখন এইরূপ

কথোপকথন করছিলেন তখন সহসা তাঁর আদরের নীলমণি খেলা ছেড়ে—'মাইয়া, ও মাইয়া'' উচ্চৈস্বরে ডাকতে ডাকতে মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল।

—'কি হয়েছে অত চিৎকার করছিস কেন? তোর কি কোন গাভী হারিয়েছে?' গোপীদের মধ্যে একজন যশোদাদুলালকে জিজ্ঞাসা করে। ক্রীড়ার আবেশে তাঁর এটুকু বোধও নেই যে, এ সময় বাড়ি থেকে গাভী কী করে হারিয়ে যাবে। তাই সে (কানু) বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল 'আমার গাভী কেন হারাবে? তুই হারিয়ে গেছিস।'

গোপী হাসতে হাসতে বলে, 'আমি আবার কোথায় হারালাম?'

আমি তো তোদের বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি।

—'তবে তোর মেয়ে হারিয়েছে, দেখগে যা!'

নীলমণি দেখল গোপী যখন হারিয়ে যায়নি, তখন কোন না কোন একজনকে তো অবশ্যই হারিয়ে যেতে হবে, তাই সে গোপীকে উপরিউক্ত কথা বলল। গোপী ও কানাইকে নিয়ে মজা করার জন্য বলল, 'আমার মেয়ে যদি হারিয়ে যায়'—তাহলে যা, তাঁকে খুজে নিয়ে আয়।''

—কেন, আমি তোর মেয়েকে খুঁজতে যাব কেন?'

গোপী সহাস্য বদনে বলে—'সে যে তোর বোন, তুই যে তার ভাই। গোপীর কথায় কানু নীরব হয়ে যায়। সে কেমন করে অস্বীকার করবে যে ঐ গোপীর কন্যা তাঁর বোন নয়। মনে মনে ভাবে গোপী মিথ্যা বলছে। তাঁর বোন কি কখনও হারাতে পারে? গোপী মিছামিছি তাঁকে বিরক্ত করছে। তাই সে ক্ষুব্ধ হয়ে গোপীকে বলে—'তু একটা মল্লু' (বানর)। মাইয়া, তুই এই গোপীকে মার লাগা। মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নীলমণি দেখে, মা ঘোল তৈরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে গোপীদের কথা ভুলে যায়। মায়ের নিকটে উপনীত হয়ে দুই কচি হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'মাইয়া, আমি ঘোল পান করবো।'

যশোমতি গ্রীবা বেঁকিয়ে পুত্রমুখ চুম্বন করে বললেন, ঘোল কেন পান করবে বাছা, মাখন-মিছরি-দুধ-দহী তোমাদের সকলের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি—তুমি সখাদের সঙ্গে নিয়ে খেতে শুরু কর।'

কানাই দেখে গোপীরা সব তখনও দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির প্রাঙ্গণে। তাদের দেখে সে জেদ করে বলে—'মাইয়া আমি ঘোলই পান করবো। সব ঘোলটা আমি একাই খাব, কিন্তু...'

নীলমণির কথা শুনে যশোমতি হাসতে থাকেন। হাসতে থাকে প্রাঙ্গণস্থিতা গোপবধুরা। পদ্মগন্ধা কপিলা গাভীর দুগ্ধ-দহী হতে যে ঘোল হয় তা অনেক সাধ্য সাধনার পরই কানাই দু-ঢোঁক পান করে—আর আজ বলছে কিনা সব ঘোলটাই সে পান করবে। তাই যশোমতি সহ সকলে হাসছেন।

কানাইয়ের দুধে যদি রুচি না আসে, তবে কানাই সেই দুধ অন্যকে পান করতে বলে। 'দাউ দাদা, ভদ্র সবাই এদিকে আয়, মাইয়া খেতে দিয়েছে, খাবি আয়' কানাই সবাইকে চিৎকার করে ডাকে। মা যশোমতি ভাবছেন ঘোল পান করার খুশীতে যদি দু ঢোঁক ঘোলই পান করে তো তাই করুক। আহা! বেচারা সকাল থেকে কিছু মুখে দেয়নি।

ইতিমধ্যে বলরাম ভদ্রাদি সখারা সব যশোমতির কাছে উপস্থিত হল। তারা মায়ের কাছে আসতেই কানু বলল, 'এদের সব দহী-মাখন-মিছরি দে-মাইয়া।'

সখারা জিজ্ঞাসা করে—'কানু, তুই দহী-মাখন-মিছরি খাবি না?'

—'উঁহু, আমি শুধু ঘোলই পান করবো। সব ঘো-ল।'

পূর্বে যে গোপবধূটি কানাইকে নিয়ে মজা করছিল সে পুনরায় বলে—'সব ঘোল তো তোর সামনেই রাখা আছে। খানা যত খুশী। তুই কি ঘোলের মটকা ধরে পান করবি? গোপীর কথা শেষ হতে না হতে কানাই একমুখ ঘোল ফুৎকার যোগে কুলি করার ন্যায় সেই গোপবধূটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে বলে—'দেখছ মাইয়া, সেই তখন থেকে আমায় কেমন জ্বালাচ্ছে। নে এবার বোঝ মজা?'' যশোমতি গোপীর দশা দেখে গোপালকে মৃদু তিরস্কার করেন এবং গোপীর সারা মুখে ও গায়ে যে ঘোল লেগে আছে আপন বসনাঞ্চল দিয়ে তা

মুছতে শুরু করেন। গোপী বলে—যশোদা মা, তুমি গোপালকে ভালো করে খাইয়ে দাও, এখনও বোধহয় ওর পেট ভরেনি, দেখছ না কেমন গোঁসা করে মুখ ফুলিয়ে আমার পানে চেয়ে আছে। ঘোলের দাগ আমিই মুছে নিচ্ছি তোমাকে এরজন্য ব্যস্ত হতে হবে না? যশোমতি গোপীকে বলেন—'কিছু মনে করিস না, জানিস তো আমার নীলমণি বড় চঞ্চল, নটখট (দুরন্ত, দুষ্ট), ভোলে ভালা বোকা সরল।'

গোপবধূটি বলল, 'নীলমণি বুঝি তোমার একার? আমাদের কেউ নয়।'

—'তা কি কখনও বলতে পারি? আমার নীলমণি যে তোদের সবার আশীর্বাদের প্রসাদ।' গোপীরা বলে, 'যাই গো যশোদা মা, স্নানের সময় হয়েছে।''

—আবার সব ও বেলায় আসিস যেন।

—সে দেখব'খন। গোপীরা চলে যায়। নীলমণি ভোজনপর্ব সমাধান করে সখাদের সঙ্গে আবার ক্রীড়ায় মত্ত হয়।

জগৎ চায় কৃষ্ণকৃপা, কৃষ্ণ চান...

ব্রজমণ্ডলে ব্রহ্মগিরি পর্বতের উপর একটি সুরম্য মন্দির আছে। মন্দিরটির নাম মান মন্দির। এখানেই শ্রীমতি রাধারাণী লীলা মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য শ্যামসুন্দরের উপর মান করেছিলেন। এ কারণে এই মন্দিরের নাম মানমন্দির। ব্রজবাসীগণ এতৎ কারণে ব্রহ্মগিরি পর্বতকে মান পর্বতও বলে থাকেন। পর্বতের উপরে অসংখ্য তরুলতা ফল ফুলে শোভিত হয়ে সদা বিদ্যমান। পর্বতের অনতিদূরে অবস্থিত বর্ষাণা গ্রাম। রাধারাণী মাঝে মাঝে সখীদের সঙ্গে মানপর্বতের কাননে ভ্রমণ করতে আসতেন।

একদিন রাধারাণী এই পর্বতকাননে একটি সুন্দর মনোহর কুঞ্জ নির্মাণ করেন। কুঞ্জের নিকটে শীতল সলিলে পূর্ণ একখানি কুণ্ড আছে। কুঞ্জ নির্মাণ অন্তে তিনি সেখানে শ্যামসুন্দরের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন দেখলেন—শ্যামসুন্দর এলেন না তখন তিনি বিরহ তপ্ত অন্তরে শ্যামসুন্দরের উপর অভিমান করে কুণ্ডের সলিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা হয়ে বসে রইলেন। সখীরা শ্রীরাধার অবস্থা দেখে থাকতে পারলেন না। তাঁরা শ্যামসুন্দরকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। শ্যামকে দেখে শ্রীমতি রাধারাণীর মান আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। সখীদের পরামর্শে শ্যামকুণ্ড তীরে দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু শ্রীমতী রাই তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। রাইকিশোরীকে মানগর্বে গর্বিতা দেখে শ্যামসুন্দর কুঞ্জ থেকে প্রস্থানোদ্যত হতেই ললিতাসখী তাঁর হস্তযুগল ধরে বললেন, 'দাঁড়াও হে শ্যাম নটবর'। মানিনীর প্রেম অত সুলভ নয়, যাও ঐ কুঞ্জের নিকট বেদীতে উপবেশন কর। আমি দেখি কী করা যায়। শ্যামসুন্দর ললিতাসখীর পরামর্শে বেদীতে উপবেশন করলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর করুণার প্রতীক্ষায়।

ললিতাসখী কুণ্ড তীরে উপনীতা হয়ে রাইকে বলেন—''মানিনী মান পরিহার কর। কুণ্ড হতে উত্থিতা হয়ে কুণ্ড কুটীর অভ্যন্তরে সিক্তবসন পরিবর্তন করে— বেদীতে শ্যামসুন্দরের পাশে উপবেশন কর। রাধারাণী, ললিতা সখীর কথানুযায়ী মান-পরিত্যাগ পূর্বক কুণ্ড হতে উত্থিতা হয়ে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য কুঞ্জ কুটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। বস্ত্র পরিবর্তনে কিছুটা বিলম্ব হয়। শ্যামসুন্দর তখন মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। ইতিমধ্যে বৃন্দাসখী সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। শ্যাম বৃন্দাকে বললেন, 'দেখ তোমাদের রাইধনী একবার মান করলে, তা পরিহার করতে চায় না। এখন কী উপায় অবলম্বন করলে রাইয়ের সঙ্গে মিলন হবে বলতে পারো?''

—রাইয়ের চাঁদ বদন দর্শনের যদি এতই লালসা—তবে সময় মতো আস না কেন?

—মানছি, আমার না হয় অন্যায় হয়ে গেছে। এবারকার মতো যা হোক একটা কিছু উপায় বের করো—যাতে মানিনীর মান প্রশমিত হয়।

—মানিনীর মান প্রশমিত হোক আর না হোক—আসল কথা হচ্ছে রাইসঙ্গ লালসায় তোমার অশান্ত চিত্ত প্রশমিত হোক, তাই না?

—তুমি ঠিক ধরেছ বৃন্দা। আমার প্রাণময়ী হৃদয়বল্লভাকে ছেড়ে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। প্রিয়ার বিরহ আমার চিত্তকে মিলনের অভীপ্সায় ব্যাকুল করে তুলেছে। বৃন্দা, তুমি যদি প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের উপায় বের করে দাও, তাহলে তোমার কাছে আজীবন ঋণী থাকবো।'

—'ঋণ গ্রহণ করলে ঋণী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে। তোমাকে যে ঋণ দেব, কি দেখে দেব? তোমার আছেটা কি?'

—কেন আমার বাঁশী, চুড়া, বনমালা, পায়ের নূপুর-এর বিনিময়ে আমি কি তোমাদের কাছে ঋণ পেতে পারি না?

—'দেখ শ্যাম, কিছু মনে কোরো না। সারাদিন ধেণু চরিয়ে চরিয়ে দেখছি তোমার বুদ্ধিটাও ধেণুর মতো হয়ে গেছে। বুদ্ধু তোমার ঐ সব সম্পদ রাইয়ের কাছে বন্ধক আছে, তা কি মনে নেই? রাই তোমাকে ঐগুলো কৃপা করে পরতে দিয়েছে।'

—বৃন্দা, এখানে যা খুশী বল আপত্তি নেই। দেখ আমার সখাদের সামনে যেন ঐসব কথা বলো না।

—বললে কি হবে?

—ওরা আমাকে নিয়ে উপহাস করবে।

—যাক তাহলে দেখছি তোমারও লজ্জা আছে। শোন, রাইয়ের সঙ্গে মিলনের জন্য একটা উপায় আমি তোমাকে বলতে পারি। যদি আমার কথামত কাজ কর তাহলে তোমার মনোরথ অবশ্যই পূরণ হবে।'

—হে বৃন্দা সখী, তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজী।

—তাহলে শোন, আমি তোমাকে শ্যামাসখী সাজিয়ে একটি মনোবীণা দেব। তুমি সেই মনোবীণায় জয়রাধে, জয়রাধে, শ্রীরাধে সুর তুলে আমাদের কুঞ্জেশ্বরীর সম্মুখে উপস্থিত হবে। তোমার সুর সাধনা যদি সুন্দর হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কুঞ্জেশ্বরী তোমায় কৃপা করবেন।

বৃন্দার কথা শেষ না হতেই শ্যামসুন্দর বললেন,—'বৃন্দাসখী, আর বিলম্ব না করে আমায় তাড়াতাড়ি শ্যামাসখী সাজিয়ে দাও। মনোবীণায় কীভাবে সুর তুলবো তা শিখিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে রাইয়ের কাছে নিয়ে চল।'

বৃন্দা শ্যামসুন্দরকে শ্যামাসখীর সাজে সাজিয়ে মনোবীণায় সুর সাধনের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ললিতাদি সহ অন্যসখীরা সেখানে উপস্থিত হন। শ্যামকে 'রমনীবেশে' দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে যান। ভাবেন রাই বুঝি আজ শ্যামাসখী সেজেছে। মনোবীণার সুর সাধনার প্রশিক্ষণ শেষ হলে সকলে শ্যামাসখীর বেশধারী কৃষ্ণকে নিয়ে কুঞ্জকুটীরে প্রবেশ করলেন। কুঞ্জকুটীরে প্রবেশ করে মনোবীণায় ঝঙ্কার তুলে শ্যামাসখী রাইকিশোরীকে সন্তোষ প্রদান করলেন। রাইকিশোরী মনোবীণার ধ্বনি শুনে প্রসন্ন হয়ে শ্যামাসখীকে আলিঙ্গন করেন। সখীরা শঙ্খধ্বনি ও পুষ্প বরিষণ করলেন। শ্যামাসখীবেশি কৃষ্ণ ও রাধাকে কুঞ্জের অভ্যন্তরে রেখে সখীরা ধীরে ধীরে কুঞ্জ হতে বেড়িয়ে গেলেন। সখীরা বেরিয়ে যেতেই শ্যামাসখীও নিজ রূপ ধারণ করে রাই কিশোরীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, যুগল মিলন দেখে অন্তরীক্ষ থেকে দেবতা গন্ধর্বরা করেন বন্দনা —

''দেব গন্ধর্ব রম্যায় রাধা মান বিধায়িনে।
মান মন্দির সংজ্ঞায় নমস্তে রত্নভূময়ে।।''

অর্থাৎ দেব গন্ধর্বাদির জন্য রমনীয় শ্রীরাধারাণীর মান বিধানকারি। মান মন্দির নামক রত্নময় স্থল, হে মানমন্দির। আপনাকে নমস্কার করি। ব্রজবাসী ভক্ত বলেন, রাইয়ের মান নামক লতাটি শ্যামতরুকে জড়িয়ে ধরে বর্দ্ধিত হোক। শ্রীরাধা মানের জয় হোক।

গিরিরাজের পদপ্রান্তে

নন্দ মহারাজের ছোট ভাই-এর নাম—নন্দন। ভদ্র, অংশু, তোককৃষ্ণ ইত্যাদি গোঠের মাঠে যারা কানুর নিত্য সখা, তারা সকলেই পিতৃব্য (কাকা) নন্দনের পুত্র। এরা সব একাধারে কানুর জ্ঞাতিভাই এবং অন্যদিকে তাঁর নিত্য পরিকর মণ্ডলীর অন্যতম কয়েকজন। নন্দনের সন্তান সন্ততির মধ্যে সবচেয়ে ছোট কন্যা অজয়া।

ফর্সা-ছিপছিপে চেহারার দাদাদের সাথে খেলতে খুব ভালোবাসে। অজয়া ভেবে পায় না ব্রজমণ্ডলে সবাই কেন তাকে অংশু তোককৃষ্ণ ও ভদ্রের বোন বলে। দাউ দাদা, কানু ভাইয়াও তো তাকে বোন বলেই ডাকে। তাহলে ওকি তাদেরও বোন নয়? তোককৃষ্ণ প্রায়ই ছোটবোনের সঙ্গে খুনসুটি করে। মধ্যে মধ্যে তাঁর চুলের গোছা ধরে টেনে দেয়। পরিবর্তে অজয়াও ভেংচি কাটে, কখনও বা জলের পাত্র থেকে জল নিয়ে ভাইয়ের গায়ে (তোককৃষ্ণ) ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে চলতে থাকে ভাই-বোনের নিত্যমধুর কলহ-কলরব। কলহ-মারামারি করলেও ভাইয়া যে তাঁকে খুব ভালোবাসে তা অজয়া ভালো করেই জানে। বিশেষ করে ভাইয়ারা যখন কানু-দাউদাদাদের সঙ্গে গোচারণ করে ঘরে ফিরে আসে—তখন তাঁরা বন থেকে ছোট বোনের জন্য নানা রঙ-বেরঙের পাথরের টুকরো, ফলফুল আরও কত কী যে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, তা বলে শেষ করা যাবে না। বন থেকে ধেণুর পাল নিয়ে দাদাদের যখন ঘরে ফেরার সময় হয় তখন অজয়া অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে। কখনও বা দাদাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সে গ্রাম ছেড়ে বনের দিকেও রওনা দেয়। সারাদিন দাদারা মাঠে ধেণু চরায়, খেলা করে। বোন অজয়ার বাড়িতে একা একা ভালো লাগে না—তাই তাঁদের ঘরে ফেরার প্রত্যাশায় সে সারাদিন ছটপট করে। বিশেষ করে ভাইয়া কানু যখন বন থেকে ফিরে এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলে, 'বোন অজয়া, আজ তোর জন্যে অনেক রঙ-বেরঙের ফুল এনেছি। আয় আজ তোকে মনের মতো করে আমরা তোকে সাজিয়ে দিই।' তখন অজয়ার সারামন প্রাণে যে কী আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়—তা সে কাউকে বলে বোঝাতে পারে না। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করে কানু ভাইয়ার পরশে মিশে আছে অনির্বচনীয় অমৃতের স্বাদ। কানু ভাইয়ের এই ছোঁয়াটুকু পাওয়ার জন্যই সে সারাদিন বন পথ পানে চেয়ে আকুলি বিকুলি করে। বন থেকে ফিরে এসে, কানুভাই সখাদের নিয়ে তাঁকে ফুল দিয়ে সাজাতে সাজাতে বলে—'অজয়া তুই দেবী। আয় তোকে বেদীতে বসিয়ে আমরা সবাই পূজা করি।' দাদা ভদ্র অংশু এরাও বলে—'হ্যাঁ, বোন আমাদের দেবী বটে, তবে ছোট্ট দেবী।' তা শুনে অজয়া বলে—''আমার বড় দাদারা সব দেবতা, আমি ছোট বোন, তাই ছোট দেবী।''

অজয়ার কথা শুনে সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে। অজয়ার মনে বড় দুঃখ, দাদারা কেউ তাকে কোন কাজ করতে দেয় না। এমনকি তাঁর নিজের মা কুবলাও তাঁকে বাসনপত্র ধুতে দেয় না। ঘর ঝাড়ু দিতে দেয় না। অথচ তাঁর কত কাজ করতে ইচ্ছা করে। গোশালার গোবর জমে স্তুপ হয়ে গেলেও অজয়াকে গোবর পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। গোবর সরিয়ে পরিষ্কার করতে গেলেই মা নয়তো কোন দাদা ছুটে এসে বলবে—'অজয়া, তোর এই ছোট্ট ছোট্ট কোমল হাত কাজ করার যোগ্য নয়।'

দাউ দাদা দেখা হলেই বলে—'যা পেট ভরে কিছু খেয়ে আয়। না খেয়ে খেয়ে দিন দিন খুব রোগ পাতলা হয়ে যাচ্ছিস তুই।' তা শুনে অজয়া বলে—'দাউ দাদা, আমাকে রোগা-পাতলা বলছো কেন? তোককৃষ্ণ দাদা, অংশু দাদার সমান আমিও দৌড়াতে পারি।' তা শুনে বলরাম হেসে বলে 'ঠিক আছে, তুই ব্রজের মস্ত বীরাঙ্গনা।' কথার মাঝে মা এসে বলেন, 'মেয়েটা বড় চঞ্চল—'দাউ।'

মা শুধু আমাকেই চঞ্চল বলে। ভদ্র, তোক, অংশু দাদাদের কিছু বলে না। অভিমান হয় অজয়ার।

অভিমানে বোনকে চুপ থাকতে দেখে, কানু ভাইয়া কাকীমাকে উদ্দেশ্য করে বলে—'কাকীমা, তুমি আমাদের বোনকে কিছু বোলো না।'

''বাবা কানু, ভুলে যেও না, ও তোমাদের আদরের বোন হলেও কিন্তু মেয়ে। এত চঞ্চলতা ভালো নয়। দু-চার বছর পরে বধূ হয়ে ওকে কোন গোপ-এর ঘরে যেতে হবে। তখন তুমিই বলবে, 'কাকীমা বোনের বিয়ের ব্যবস্থা কর।'' কুবলা কাকী অর্থাৎ অজয়ার মা কানুকে বললেন।

—'ওসব নিয়ে তুমি ভেব না কাকী, দেখবে আমরা বোনের বিয়ে দেব কোন গোপ-রাজের ঘরে।' কানু ও মায়ের কথা শুনে অজয়ার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠে। সে ভাবে—মেয়ে একটু বড় হয়েছে কিনা, সব বিয়ে বিয়ে করে পাগল করে তুলবে। বিয়ে ছাড়া সবার মুখে যেন অন্য কথা নেই। তবে হ্যাঁ, কানু ভাইয়া তাঁকে কথা দিয়েছে, বড় হয়ে সে অনেক বিয়ে করবে। কানু ভাইয়া বড় ভালো। সে কখনও তার এই ছোট বোনের কথাকে অগ্রাহ্য করে না। গতকাল বন থেকে ফিরে এসে তাকে যখন দেবী সাজিয়ে পূজা করছিল, তখন সে দেবীর আবেশে হঠাৎ বরদানের ভঙ্গীতে সবাইকে বলল, 'তোমাদের পূজায় আমি সন্তুষ্ট, তোমরা বর প্রার্থনা কর।' তাঁর কথা বলার ভঙ্গী দেখে অন্য সবাই হাসলেও কানু ভাইয়া কিন্ত হাসেনি। সে বরং নতশিরে বলেছিল—'হে দেবী আমি অবোধ গোঠের রাখাল, সারাদিন মাঠে গরু নিয়ে পড়ে থাকি। দেবীর কাছে কী বর চাইতে হয় আমি জানি না—তুমি নিজ করুণায় খুশী হয়ে আমার মনোমত বর দাও।' তখন দেবীর আবেশে থেকে অজয়া বলল, 'তুই প্রথমে নিজে বিয়ে কর, অন্য সখাদেরও বিয়ে করতে বল।' আমি তোকে বর দিলাম, তোর অনেক বউ হবে।''

—'আমার অনেক বউ হলে তোমার কি লাভ হবে, দেবী?' কানু দেবী ভাবাপন্না বোনকে জিজ্ঞাসা করল।

—তুই বন থেকে রঙ-বেরঙের ফুল-পাতা এনে দিবি। বউরা তা দিয়ে আমাকে সাজাবে।

—কিন্তু অনেক বউয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী হবে, প্রধানারানী হবে তাঁর নাম কি? সে এখন কোথায় থাকে?

—তোর প্রধান বউ যে হবে তাঁর নাম শ্রীরাধা। থাকে বর্ষাণায়। আগামীকাল তোরা যখন বাবা-মা ও অন্যান্য গোপগোপীদের সঙ্গে গিরিগোবর্ধনের তটে গিয়ে তাঁর (গোবর্ধনের) পূজা করবি, সে তখন সখীদের নিয়ে সেখানে পূজা দিতে আসবে। তোর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েই আছে। তুইও তাকে ভালো করে জানিস, সেও তোকে ভালো করে জানে। খুব ছোটবেলায় ব্রহ্মার পৌরহিত্যে তোদের দু-জনের বিবাহ অনুষ্ঠান সবার অগোচরে হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রকাশের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে মা যশোমতি কানু ও বলাইকে দুধ খাওয়ার জন্য ডাকতে আসেন। ফলে অজয়ার দেবীভাবে আবিষ্ট হয়ে বরদানে বিরতি পড়ে। বোনকে দেবী সাজিয়ে-বরদানের খেলায় সমাপ্তি ঘটে।

পরদিন প্রভাতের আলো ফুটতে না ফুটতেই নন্দ মহারাজ-যশোমতী মা, ব্রজের গোপ-গোপীরা, সখাসহ কানু-বলাই গোশকটে গিরিগোবর্ধনের পদপ্রান্তে উপস্থিত হল। কানুর কথায় রাজী হয়ে নন্দ মহারাজসহ বয়স্ক গোপরা এবার ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে জীবন্ত দেবতা গিরিগোবর্ধনের পূজা করবেন। তাই সবাই পূজার উপকরণ সহ উপনীত হয়েছেন গিরিরাজের পদপ্রান্তে। বর্ষাণা গ্রাম থেকে মহারাজ বৃষভানু—কীর্ত্তিদা মাইয়া (রাধারাণীর পিতামাতা) এবং সখীসহ রাধারাণীও এসেছেন। সুবল-শ্রীদামা রাধারাণীর দুই ভাইও এসেছেন। গোপ পুরোহিত মহর্ষি শাণ্ডিল্য পূর্বেই সেখানে শিষ্যদের নিয়ে হাজির হয়েছেন। গিরিরাজ-এর পূজার কোন নিয়ম-বিধান তাঁর জানা নেই। তাই তিনি শঙ্খ ধ্বনি করে নন্দ পুত্র কৃষ্ণকেই পূজার জন্য পৌরহিত্য করতে বললেন। কারণ ব্রজপুরে এ-বারেই প্রথম এই পূজার প্রচলন হতে চলেছে।

একরূপে গিরি গোবর্ধন রূপে প্রকট হয়ে পূজা গ্রহণ করল কৃষ্ণ, আবার অন্যরূপে পুরোহিত হয়ে পূজাও করল কৃষ্ণ। প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে কৃষ্ণের সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গোপরা ঘৃতাহুতি দিতে শুরু করলেন। ঘৃতাহুতির শেষে পুষ্পাঞ্জলি ও নৈবেদ্য প্রদানের পালা। অজয়া অর্ঘ্য ডালা হাতে নিয়ে পূজার জন্য এগিয়ে যেতেই ললিতা সখি বাধা দিয়ে বলেন—'মেয়েদের পূজা করা নিষেধ।' অজয়া থমকে হতাশ হয়ে

দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে হতাশ দেখে রাধারাণী ললিতাকে তিরস্কার করে বলল,—"ললিতা, তোকে কে বলেছে, মেয়েদের পূজা করা নিষেধ। এই তো আমিও কুসুম নৈবেদ্য নিয়ে গিরিরাজকে পূজা করতে যাচ্ছি, আয় অজয়া, তুইও আমার সঙ্গে আয়। ললিতা-বিশাখা তোরা কেউ অজয়াকে বাধা দিবি না, ওর ইচ্ছায় আমার সানন্দ-সম্মতি আছে।"

রাধা যে কাউকে তিরস্কার করতে পারে—অজয়া এই প্রথম দেখল। ওদিকে তখন পূজার মন্ত্রপাঠ চলছে। বিশাখা বলে,—"অজয়া, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? এগিয়ে চল। ঐ দেখ চৌষট্টিটি স্বর্ণপাত্রে গঙ্গা-যমুনার জল পূর্ণ করে তাতে তুলসীপত্র দিয়ে কেমন সুন্দর সারি সারি সাজিয়ে রেখেছে দেখ!"

গৃহে নারায়ণ পূজা যে ভাবে হয়—সেইভাবেই কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধনের পূজা সম্পন্ন করল। মহর্ষি শাণ্ডিল্য তন্ত্র ধারকের ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে পালন করলেন। পূজা শেষে ভোগের থালায় যখন তুলসী দিয়ে গিরি গোবর্ধনকে ভোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাল কৃষ্ণ—তখন গিরি গোবর্ধন দেবতা রূপে প্রকট হয়ে ভোগ চেয়ে চেয়ে খেতে শুরু করলেন। গোপ-রা ছুটোছুটি করে থালা-থালা ভোগ এনে দিলেন কানুর হাতে, কানুর হাত থেকে সেই ভোগ মুখে ঢেলে দেন দেবতারূপে প্রকাশিত গিরিরাজ। চার হাত বের করে গিরিরাজ ভোগ খেতে থাকেন। তাঁর (গিরিরাজের) খাওয়ারভঙ্গী দেখে রাধারাণী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে অজয়াকে জিজ্ঞাসা করল, "ভালো করে দেখ তো অজয়া—এই চার হাত ওয়ালা বিশাল দেবতা দেখতে অনেকটা তোর কানু ভাইয়ার মতো নয়?"

'ওই বিরাট দেবতার যদি চার হাত না হত, তাহলে অবশ্যই বলতাম ও আমাদের কানু ভাইয়া। যদি ঐ দেবতা এত উঁচু না হত, তাহলে সবাই ওকে কানু ভাইয়া মনে করতো। ওরই মতো চোখ, কেশ, বাহু, বসন, অলংকার—সবেতেই মিল। শুধু আমাদের ভাইয়ার দুহাত-আর দেবতার চার হাত। ভাইয়া ছোট—দেবতা বিশাল উঁচু ও বড়।'

দেবতারূপে গিরিগোবর্ধনকে প্রসাদ গ্রহণ করতে দেখে অজয়ার সাহস যায় বেড়ে। সে একটা বড় মিঠাই নিয়ে হাজির হল বিরাট দেবতার কাছে। কানু ভাইয়া বলল, "বোন, তুই নিজের হাতে করে গিরিরাজকে খাইয়ে দে।" কানু ভাইয়ার কথায় অজয়া মিঠাই তুলে দেয় গিরিরাজের মুখে—তিনি হাসতে হাসতে তা গ্রহণ করেন। অজয়া মিঠাই নিবেদন করে ফিরে আসতেই গিরিরাজ প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে বললেন, "বোন প্রসাদ নিয়ে যাও।" গিরিরাজের মুখে বোন সম্বোধন শুনে অজয়ার খুব আনন্দ। সে যেমন কানু ভাইয়ার বোন, তেমনি আজ থেকে গিরিরাজেরও বোন। গিরিরাজ আজ থেকে তাঁর আর এক ভাই। গিরিরাজ প্রসাদরূপে তাঁর হাতে মিঠাই-এর বড় অংশ প্রত্যর্পণ করেছেন। সে আনন্দে তা নিয়ে এসে রাধারাণী হাতে দিল। রাধারাণী ওই প্রসাদের টুকরো ভাঙতেই তার ভেতর থেকে বেড়িয়ে এল একজোড়া দিব্য কর্ণকুন্তল। কুন্তলের ছটার দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। অজয়ার দুই কর্ণ থেকে পুরনো কুন্তল দুটি খুলে নিয়ে রাধারাণী প্রসাদরূপে পাওয়া দিব্য কুন্তল দুটি অজয়ার কর্নে পরিয়ে দিল। রাধারাণীর স্নেহস্পর্শে অজয়া নিজেকে ধন্যা-কৃত কৃতার্থা মনে করল। রাধারাণী যখন তাঁর কর্ণে কুন্তল পরিয়ে দিচ্ছে—সে তখন মনে মনে গিরিরাজের কাছে প্রার্থনা করে—"হে জাগ্রত ভগবান গিরিরাজ, তুমি রাধাজীকে আমার ভাবী করে দিও। আমাদের কানু ভাইয়া যেন রাধাজীর বর হয়। ওদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে আমি যেন আজীবন ওদের চরণ পূজা করতে পারি।"

"তুই বিড় বিড় করে কি প্রার্থনা করছিস অজয়া? কুন্তল তো পেয়েছিস, এখন বুঝি ওই দেবতাকে বিয়ে করার জন্য প্রার্থনা করছিস?"—ললিতা টিপ্পনী কেটে জিজ্ঞাসা করল।

"ঐ পাহাড়ের মতো দেবতাকে বিয়ে করতে হয় তো তুমি কর। আমাকে বোন বলে ডেকেছে, সুতরাং ঐ দেবতা এখন থেকে আমার ভাই। তুমি যদি বিয়ে করতে চাও তাহলে নয় বলে-কয়ে দেখতে পারি।" অজয়ার প্রত্যুত্তরে ললিতা চুপ হয়ে যায়।

বিশাখা বলে—'তবে বিড়বিড় করে তুই কী বলছিলি?'

'আমি আমার কানু ভাইয়ার বিয়ের জন্য দেবতার কাছে মানত করছিলাম। বলছিলাম, হে দেবতা তুমি রাধাজীকে আমার কানু ভাইয়ার বউ করে দাও। ও যেন আমার ভাবী হয়।' অজয়ার কথা শুনে রাধারাণীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়। লজ্জাবনত মুখে রাধা স্বীয় করপল্লব দিয়ে অজয়ার মুখ চেপে ধরে—তাঁর শিরে স্নেহচুম্বন বর্ষণ করতে থাকল। সখীরা আনন্দে করতালি দিল। পূজা শেষে ভোজনান্তে সবাই গোশকট যোগে আপন আপন গৃহাভিমুখে রওনা দিলেন।

''দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং...''

শ্রুতিমাতা বলেছেন ভগবান জীবের স্বজাতীয় এবং সখা। হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর খনন কার্য চালাতে গিয়ে গবেষকরা একটি চিত্র পান। পাথরে খোদিত ঐ চিত্রে দেখা যায় একটি গাছের শাখায় দুটি পাখি বসে আছে। একটি পাখি ফল খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে এডাল থেকে ওডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে। অন্য পাখিটি ফল মুখেই দেয় না—সে চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে আছে একই জায়গায়। চিত্রটি পেয়ে গবেষকদের মধ্যে বিচার বিতর্ক শুরু হয়। সকলের প্রশ্ন—চিত্রটি কোন সভ্যতার পরিচয় বহন করে? এক বেদজ্ঞ বিদগ্ধ বলেন, 'চিত্রটি বৈদিক ভারতের। ঋকবেদের ''দ্বা সুপর্ণা সযজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'' এই মন্ত্রানুযায়ী চিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে।''

বেদবৃক্ষের গলিত ফল 'শ্রীমদ্ ভাগবত' তারই ইঙ্গিত—ব্রজের নীল যমুনার তটে সখাসনে ক্রীড়ামত্ত লীলাবিহারী শ্রীগোবিন্দ। খেলার নিয়ম—যে হারবে তাকে ঘোড়া হতে হবে। বিজয়ী যে জন আরোহী হয়ে তার উপর চড়বে। খেলতে খেলতে শ্রীদামা বেশ কয়েকবার হেরে যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ঘোড়া করে সওয়ারী হয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসল। বেচারা শ্রীদামা, কৃষ্ণকে পিঠে চাপিয়ে বয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁপিয়ে যায়। সে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। খেলা চলতে থাকে, এবার কৃষ্ণ হেরে গেল। শ্রীদামা তখন বলল, 'এবারে আমার চড়ার পালা। নে কানাই এবার তুই ঘোড়া সাজ, আমি তোর পিঠে চড়ি।'

কৃষ্ণ বাহানা দেখায়—'আজ দেরী হয়ে গেছে। ধেণু নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে—ওই দেখ সূর্য ডুবুডুবু। সাঁজ হয়ে এসেছে, চল ধেণু নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই। আগামীকাল যখন পুনরায় মাঠে গোচারণ করতে আসবো—তখন তোর জেতার দান দেব।'

শ্রীদামা বলল,—'উঁহু, ওটি হচ্ছে না। আমি দান জিতেছি আজ। আর তুই ঘোড়া হয়ে কালকে চড়াবি পিঠে! আজকে সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন আজ তোর পিঠে না চড়ে ছাড়ছি না।''

কৃষ্ণ বলল, 'দেখ শ্রীদামা, ফিরতে দেরী হলে মা আমার জন্য চিন্তা করবে। তাই বলছি আজ ফিরে চল, কাল ঘোড়া হয়ে তোকে পিঠে চড়াব।'

শ্রীদামা, কৃষ্ণের কথা শুনে রেগে বলল, 'দেখ কানু, তুইও গরুর রাখালি করিস, আমিও গরুর রাখালি করি। আমরা দুজনেই রাখাল। তুই তোর মা-বাবার আদরের ছেলে, আমিও আমার মা-বাবার আদরের ছেলে। তোর বাবা রাজা, আমার বাবাও রাজা। তবে হ্যাঁ, আমার বাবার চেয়ে তোর বাবার গরুর সংখ্যা কিছু বেশি। এরজন্য যদি তোর অহংকার হয়—তবে সেই অহংকার তোকে ভুলতে হবে। অহংকার নিয়ে খেলতে নামলে খেলার মজা পাওয়া যায় না।'

—'আহা-হা অত রাগ করছিস কেন ভাই! আমি কখনও বলেছি, যে তোর বাবার চেয়ে আমার বাবার গরু বেশি আছে, আমরা তোদের চেয়ে বেশী ধনী?—শ্রীদামা তুই এসব কথা কেন তুলছিস?

—দেখ কানু, আমি যতবার হেরেছি, ততবার ঘোড়া হয়েছি। তুই খোশ মেজাজে আমার পিঠে চড়েছিস। তোকে পিঠে নিয়ে আমি সারা মাঠে সাত পাক দিয়েছি। কোন কথা বলিনি। খেলার নিয়ম অনুযায়ী আমার হার হয়েছিল, আমি তা স্বীকার করে নিয়েছি। এখন তুই হেরে গেছিস, অতএব আমি তোর পিঠে চড়বোই চড়বো।

—'আমি আজ তোর ঘোড়া হতে পারব না।'—কৃষ্ণের সোজা জবাব।

—'তাহলে তুইও শুনে রাখ যদি তুই আমাকে খেলার দান না দিস, তাহলে কাল থেকে তোর সঙ্গে খেলব না—খেলব না—খেলব না'—

শ্রীদামা ত্রিসত্য করে শপথ নিয়ে বলল, 'তুই যেদিন হেরে যাস, সেদিন দান দেওয়া নিয়ে নানা গোলমাল করিস। তাই স্থির করেছি কাল তোর সঙ্গে আমরা কেউ-ই আর খেলব না। যদি খেলি তবে তোকে সঙ্গে নেব না।'

শ্রীদামা যেই বলেছে—'আমরা তোর সঙ্গে খেলব না। যদি খেলি তবে তোকে সঙ্গে নেব না,' অমনি কানুর চোখে জল দেখা দিল। সে কাঁদকাঁদ হয়ে শ্রীদামাকে বলল, ''আমি এক্ষুনি ঘোড়া হচ্ছি তুই চড়। কিন্তু কথা দে আমাকে খেলায় নিবি? কখনও খেলা বন্ধ করবি না?''

—যদি ঘোড়া হয়ে পিঠে চড়তে দিস, তাহলে তোর সব কথা শুনবো। শ্রীমদভাগবত পুরাণের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ তখন বলে—

''উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।

....।।

পরাজিত শ্রীকৃষ্ণ তখন ঘোড়া হয়ে শ্রীদামাকে পিঠে চড়াল। শ্রীদামা সওয়ারী হয়ে কৃষ্ণের পিঠে চড়ে মুখে বনলতার লাগাম পরিয়ে দিয়ে—তাঁর চুলের গোছা ধরে বলল,—এই ঘোড়া চল চল।

তখন গোধূলি বেলা। সখীসহ রাধারাণী তখন ঐপথে আসেন যমুনায় জল নিতে। দূর হতে তাঁকে আসতে দেখে শ্রীদামা কৃষ্ণের পিঠ থেকে ভয়ে নেমে পালিয়ে গেল।

শ্রীদামা রাধারাণীর ভাই। রাত্রে বাড়ি ফিরলে রাধারাণী সব শুনে ভাইকে তিরস্কার করে বলল,—''কৃষ্ণ হেরে গেলেও, তুই কখনও ঐ মোটা শরীর নিয়ে তার পিঠে চড়বি না। ওর কোমল অঙ্গ তোর ভার কি বহন করতে পারে? ফের যদি কোনদিন শুনি, তুই খেলায় হারিয়ে দিয়ে ওকে ঘোড়া করে পিঠে চড়েছিস—তাহলে তুই সেদিন আমার মরা মুখ দেখবি।'' বলতে বলতে রাধারাণী কেঁদে ফেলল।

শ্রীদামা ভেবে পায় না কানুকে ঘোড়া করে পিঠে চড়লে দিদি অত রাগ করে কেন? ব্রজের খেলার মাঠে শ্রীদামা দিদির কাছে বকুনি খাওয়ার পর আর কোনদিন জিতেছে কিনা সে খবর আমাদের জানা নেই। মনে হয় জিতলেও সে খবর রাধারাণীর কাছে গোপন রাখা হত।

জগতে দুঃখ কেন?

কৌরবদের কাছে পাশাখেলায় হেরে গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব, মাতা কুন্তী ও পত্নী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে যান। দীর্ঘদন যাবৎ নানাবনে পরিভ্রমণ করতে করতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, মাতা ও পত্নীসহ আর্যাবর্ত্তের এক বনভূমিতে অধিষ্ঠিত হন। বনের নানা ফলমূল ও পশুপাখি শিকার করে এখানে তাঁরা অতিকষ্টে দিনপাত করেন।

একদিন পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ তাদের খবর নেওয়ার জন্য বনভূমিতে এসে উপস্থিত হন। পাণ্ডবজননী কুন্তী ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবসহ অন্যান্য সকলে বহুদিন পর কৃষ্ণকে নিজেদের কাছে পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে যথাসাধ্য আদর-অর্ভ্যথনা জানালেন। কৃষ্ণও পাণ্ডবদের সার্বিক কুশল ও নিরাপদে বাস করতে দেখে মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

অতঃপর আহার ও বিশ্রাম পর্ব শেষ করে কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব নির্মিত পত্রকুটিরের অনতিদূরে একটি বিশাল বনবৃক্ষের নীচে উপবেশন করলেন। নির্নিমেষ নয়নে তিনি বনের সৌন্দর্য সুধা পান করতে করতে বিভোর হয়ে গেলেন। সহসা শুষ্ক পত্রের মর্মর শব্দে সচকিত হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের চোখেমুখে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বিষণ্ণ ভাব। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে মুখে মৃদু হাসি এনে জিজ্ঞাসা করলেন,—'জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তোমার মনে কি কোন সংশয় দেখা দিয়েছে?'

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছো কৃষ্ণ, আজ বেশ কিছুদিন ধরে একটা সংশয় আমার মনকে বড়ই চঞ্চল করে তুলেছে।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন তাই কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলেই সম্বোধন করে তার কথার উত্তর দিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের দুই করস্পর্শ করে বললেন, "জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তোমার মুখে বিষণ্ণভাব দেখেই বুঝেছি তোমার মনে কোথাও কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। ধর্মপুত্র, যদি আমাকে তোমার বা তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে কর, তাহলে সবকিছু অকপটে বল, আমি যথাসাধ্য তোমার মনের সংশয় দূর করে, তোমার মনকে প্রশান্ত করে মুখের ওই বিষণ্ণভাব অপনোদনের চেষ্টা করব।"

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের হাত দুটি বুকের কাছে তুলে ধরে কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে বিষণ্ণ-মধুর দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা কৃষ্ণ, লোকে বলে ভগবান নাকি দয়াময়? করুণাময়?—এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি?"

যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণ দুই ঠোঁটের মাঝে এককোঁটা হাসি রেখে নীরব রইলেন। কৃষ্ণের এই নিস্পৃহ ভাব দেখে যুধিষ্ঠির আরও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি পূর্বাপেক্ষা উচ্চস্বরে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন —"চুপ করে থেকে আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোর না কৃষ্ণ, উত্তর দাও—ভগবান যদি দয়াময়, করুণাময় তবে পৃথিবীতে এত দুঃখ, এত কষ্ট কেন?" কথাগুলো বলতে বলতে যুধিষ্ঠিরের চোখমুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

"আপনি অকারণ উত্তেজিত না হয়ে মনকে শান্ত করুন" কৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির দন্তদ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন করে সলজ্জভাবে প্রকৃতিস্থ হলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের দিকে মৌনভাবে চেয়ে রইলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন রাখার জন্য বললেন, "চলুন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব আমরা বনের ভেতরটা এই ফাঁকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। নীরবে কৃষ্ণকে অনুসরণ করে বনের গভীরে রওনা দিলেন। উভয়ে একটা বড় শালগাছের নীচে দাঁড়ালেন। শাল গাছের কিছুটা দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরাট শিমুলবৃক্ষ। শিমুলবৃক্ষের একটি শাখায় ঝুলছে একটা বড় মৌমাছির চাক। সেই চাকে প্রচুর মধু

জমে আছে। বিন্দু বিন্দু মধু সেই চাক থেকে ফোঁটাকারে ঝরে পড়ছে নীচে। নীচে যেখানে মধু ঝরে পড়ছে সেখানে একটি লোক ঐ মধুর ফোঁটা লক্ষ্য করে মুখ হাঁ করে নীচে শুয়ে তা পান করছে। মধুর নেশায় তার দুই চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন।

যুধিষ্ঠিরের অগোচরে দৃশ্যটি লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণ। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, যে শিমূলবৃক্ষের কিছুটা দূরে যে উঁচু টিলাটা রয়েছে সেখান থেকে একটা বড় অজগর সাপ বের হয়ে ধীরে ধীরে ঐ মধুপানরত লোকটির দিকে এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করার জন্য। কৃষ্ণ ভ্রুকুঞ্চিত করে মোহন গ্রীবা ঈষৎ নত করে যুধিষ্ঠিরকে আরও কাছে আসতে বললেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে শিমূল বৃক্ষস্থিত মৌচাক এবং তৎনিম্নে মধুপানরত লোকটিকে ও লোকটির দিকে ধাবমান যমদূত রূপী অজগরটিকে দেখালেন। যুধিষ্ঠির এই দৃশ্য দেখে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'সর্ব্বনাশ লোকটি যে সাপের গহ্বরে যাবে, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি লোকটিকে সাবধান করে দিয়ে আসি।' এই বলে যুধিষ্ঠির কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ সেই শিমূল বৃক্ষের নীচে মধুপানরত লোকটির কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, ''এই যে মশাই শুনছেন তাড়াতাড়ি উঠে পালান, নইলে অজগরে আপনাকে গিলে খেয়ে নেবে। ঐ যে অজগরটা আপনার দিকেই এগিয়ে আসছে।''

লোকটি যুধিষ্ঠিরের কথায় দৃকপাত না করে উপরের মৌচাকের দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে উত্তর দিল, ''সাপ কোথায়? যতসব মিছে কথা। সাপের ভয় দেখিয়ে আমাকে তাড়িয়ে তুমি বুঝি মধুপান করতে চাও। ওটি হবে না।, সাপই আসুক আর যেই আসুক আমি উঠছি না।'' এই বলে লোকটি পুনরায় মধু পানে মনোনিবেশ করল।

যুধিষ্ঠির দেখল লোকটিকে সাবধানের চেষ্টা নিছক নিরর্থক। তাই সেইস্থান পরিত্যাগ করে পুনঃ কৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর অজগর এসে মানুষটিকে উদরস্থ করল। যুধিষ্ঠির সেই ভয়ানক দৃশ্য কৃষ্ণের সঙ্গে অবলোকন করলেন।

বন থেকে ফেরার সময় যুধিষ্ঠিরের মুখ আনন্দ ও প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে তির্যকভঙ্গীতে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—''জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তোমাকে যে বড় প্রফুল্ল দেখছি।''

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কৃষ্ণ, এখন আমার মনে কোন সংশয় নেই। তাই বিষণ্ণ ভাবটা চলে যেতেই কেমন যেন প্রসন্ন-প্রসন্ন লাগছে।' এইরূপ কথাবার্তা আদান প্রদান করতে করতে উভয়ে কুটিরের দিকে রওনা হলেন। কুটিরে পৌঁছে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—''পৃথিবীতে দুঃখ কেন তার উত্তর কি পেয়েছেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব?''

যুধিষ্ঠির সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। মৌখিক কোন উত্তর দিলেন না।

ব্রজের ব্রজনাথ, পুরীধামে জগন্নাথ

ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে 'রাধা-রাধা, প্রাণাধিক রাধা, হা রাধা' বলে চীৎকার করে ওঠেন কৃষ্ণ। ক্রন্দন ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে যায় রুক্মিণী সত্যভামাদি সহ সকল দ্বারকাবাসিনী মহিষীদের। প্রভাতে মহিষীরা নিজেদের মধ্যে উক্ত বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু করেন। দ্বারকার রাজমহলে তাঁদের ন্যায় সুন্দরী সুন্দরী সহস্র রমণী থাকা সত্বেও, কেন প্রাণপতি স্বপ্নের মাঝে রাধা-রাধা বলে কেঁদে ওঠেন? সে ভাগ্যবতী কে? যাঁর বিহনে কৃষ্ণ কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হন। ফিরেও ভালো করে তাকিয়ে দেখেন না তাঁদের? রাধার পরিচয় জানার জন্য দ্বারকার মহিষীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

জ্যেষ্ঠা মহিষী রুক্মিণী বললেন, 'শুনেছি বৃন্দাবনে রাধা নামে এক গোয়ালিনী আছেন—যাঁর চিন্তায় আমাদের প্রাণনাথ বিভোর থাকেন।' সত্যভামা বললেন, 'তাই যদি হয় তাহলে তো, রোহিণী মাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব খবর পাওয়া যাবে। উনি তো বৃন্দাবনে অনেকদিন ছিলেন, আমাদের প্রাণবল্লভের সমস্ত ক্রিয়া উনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। চল, সব আমরা রোহিণী মায়ের কাছে যাই, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবো।'

মহিষীরা সকলে রোহিণীমায়ের মহলের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে প্রবেশ করে সকলে রোহিণীমাকে অনুরোধ করে বললেন, 'মা আপনার পুত্রের বৃন্দাবন লীলার বিষয়ে যা জানেন আমাদের বলুন, দয়া করে কোন কিছু গোপন করবেন না।'

রোহিণীমা পড়লেন বিপদে, মা হয়ে তিনি কেমন করে বলবেন, পুত্রের বৃন্দাবন লীলার কথা? মহিষীরাও নাছোড়বান্দা, না শুনে ছাড়বেন না। অগত্যা রোহিণীমা রাজী হলেন। পুত্রবধুদের বললেন,—'কৃষ্ণ বলরাম রাজসভায় যাওয়ার পর, আমি তোমাদের বৃন্দাবন লীলার কথা শোনাব।'

প্রভাতে স্নান, সূর্য বন্দনা, পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে, কৃষ্ণ বলরাম রাজসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। রোহিণীমা, মহিষীদের নিয়ে অন্ত:পুরে বসলেন—বৃন্দাবন লীলা শোনানোর জন্য। বৃন্দাবন লীলা শোনানোর আগে দ্বারে প্রহরী রাখলেন কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রাকে। বৃন্দাবন লীলা অপ্রাকৃত-অদ্ভুত। কৃষ্ণের বড় প্রিয়। এ লীলার এমনই মাহাত্ম্য যে, তা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে আসে। অন্তঃপুরে রোহিণীমা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করছেন মহিষীদের কাছে। লীলা শুনতে শুনতে মহিষীরা সকলে তন্ময় হয়ে যান।

ওদিকে রাজসভায় কৃষ্ণ-বলরাম ছটফট করতে থাকেন। বৃন্দাবন লীলার অনুপম আকর্ষণ শক্তি—তাঁদের দুভাইকে অন্তঃপুরের দিকে টেনে নিয়ে আসে। দুইভাই রাজসভা ছেড়ে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন। অন্তঃপুরের দরজার নিকটে উপস্থিত হতেই, সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললেন, ''আমি দ্বারের প্রহরী, রোহিণীমায়ের আদেশে এখন অন্তঃপুরের কক্ষে প্রবেশ করা নিষেধ। সুতরাং আমি এখন কাউকে ভেতরে যেতে দেব না—তোমরাও ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না।'' নিরুপায় হয়ে দুইভাই দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সুভদ্রা দুইভাইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আটকিয়ে রাখেন। ভেতরে বৃন্দাবন লীলার কথা চলছে। দ্বারকার মহিষীরা ধ্যানমগ্না হয়ে কথা শুনছেন। সুভদ্রা পাহারা থাকা সত্বেও, বাইরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যে বৃন্দাবন লীলার কথা শুনছেন—তা খেয়ালই করেননি রোহিণীমা ও দ্বারকার মহিষীগণ।

কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা তিনজনেই চিন্ময় রসভাবপূর্ণ বৃন্দাবন লীলার কথা শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে গেলেন। আনন্দে তিন ভাইবোনের চোখে অশ্রু ঝরছে। শরীর রোমাঞ্চিত! অন্তঃপুরে রোহিণীমা তখন শ্রীরাধার প্রেম বর্ণনা করে রাস প্রসঙ্গের চর্চা করছেন। তা শুনতে শুনতে তিন ভাইবোনের শরীরের অবস্থা

বিচিত্র রূপ ধারণ করল। তিনজনের হাত পা সংকুচিত হতে হতে শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল। সুদর্শন চক্রও বৃন্দাবন লীলার কথা শুনতে শুনতে লম্বা ছড়ির আকার ধারণ করল।

দ্বারকার অন্দর মহলে যখন এই অবস্থা তখন সহসা দেবর্ষি নারদ সেখানে উপনীত হলেন। আপন মনে বীণা বাজাতে বাজাতে কৃষ্ণের সন্ধান করতে করতে তিনি অন্তঃপুরের দরজার নিকট উপনীত হয়ে দেখলেন —তিন ভাইবোনের বিচিত্র দশা। তারা কখনও হাসে কখনও কাঁদে, কখনও কান্না-হাসির মিশ্রণে আনন্দিত হয়ে নৃত্য করে। নারদ এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ওদিকে অন্তঃপুরে রোহিণী মা তখন শ্রীরাধা বিরহ বণর্না করছেন। তা শুনতে শুনতে কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র পূর্বরূপ ফিরে পান বা প্রকৃতিস্থ হন। প্রকৃতিস্থ হয়ে নারদকে সামনে দেখে কৃষ্ণ লজ্জিত হয়ে বললেন, 'হে দেবর্ষি আজ বড় আনন্দের দিন। আজ যে আনন্দ পেলাম তার তুলনা হয় না। এই আনন্দের দিনে তুমি খুশীমত বর প্রার্থনা কর আমার কাছে।'

নারদ বললেন, 'বর নেওয়ার কথা পরে হবে। আগে বলুন, আজ আপনাদের শরীরের এই অবস্থা কেমন করে হল?'

কৃষ্ণ বললেন—''দেবর্ষি, অন্তঃপুরে মা রোহিণী আমার বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা করছেন। ব্যস, তা শুনতে শুনতেই খুশীতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি।''

নারদ বললেন,—'তাহলে প্রভু আমাকে এই বর দিন, যাতে আপনাদের চারজনের (কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রাও সুদর্শন চক্র) এইরূপ দেখে মর্ত্যবাসী ধন্য হয়। ভগ্নীসহ আপনাদের দুই ভাইয়ের রূপ বড়ই মনোরম। এইরূপ দেখে জগৎবাসীর নয়ন ধন্য হোক।'

কৃষ্ণ বললেন,'তথাস্তু! হে দেবর্ষি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

ব্রজের ব্রজনাথ ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করতে পুরীধামে এলেন জগন্নাথ।পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যে বিচিত্র দারুমূর্তি দেখা যায় তা কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের।

বাঁশীর সুরে অশ্রু ঝরে

রথ নিয়ে অক্রূর এসেছেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুই ভাই অক্রূরের রথে চড়ে মথুরায় যাবেন ধনুর্যজ্ঞে যোগদান করতে। কৃষ্ণের মথুরা গমনের খবর পেয়ে ব্রজবাসী ম্রিয়মান। আসন্ন কৃষ্ণ বিরহের আশঙ্কায় গোপীরা শোকমগ্না। যশোদা, নীলমণি মথুরায় যাবে এই খবর শুনে নন্দ মহারাজকে অশ্রু সিক্ত নয়নে জিজ্ঞাসা করলেন—''হ্যাঁ গো যা শুনছি তা কি সত্যি?''

—'হ্যাঁ সত্যি! কংস অক্রূরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ হবে। আমি যেন কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে সেই যজ্ঞে হাজির হই।''

—''ইচ্ছা হলে তুমি বলরাম সহ অন্যদের নিয়ে যাও। আমি গোপালকে তোমার সঙ্গে মথুরায় পাঠাব না।

—ও কথা কেন বলছ, রাজা কংস সম্মান করে রথ পাঠিয়েছেন, না গেলে যে রাজার আদেশের অবমাননা হবে।

—ওখানে আমার নীলমণিকে কে দেখবে? ও বড় লাজুক স্বভাবের। ক্ষিধে পেলে চাইতে জানে না। ওখানে কে ওর ক্ষিধে বুঝে খাওয়াবে বল? দু-চারদিন আগে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।

—'দুঃস্বপ্ন! কি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে তুমি?' নন্দ মহারাজ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার নীলমণি আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছে। মথুরা থেকে অক্রূর যেন ক্রূর কালরূপে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছে। ও আমার হৃদয়ের নিধিকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে—আমি আমার নীলমণিকে কিছুতেই আমার দৃষ্টির বাইরে যেতে দেব না।

—'দেখ, যশোদা, গোপাল আমাদের এগারোয় পদার্পণ করল, আর কতদিন তুমি ওকে আঁচলে বেঁধে ঘরে রাখবে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে ওকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বৃন্দাবনের যোগ্য রাজা করে তৈরি করতে হবে ওকে। আমরা পিতা-পুত্র সবাই মিলে দু'চারদিন মথুরায় থেকে আবার ফিরে আসবো। তুমি অনর্থক চিন্তা করে মন খারাপ কর না।

—দু-চারদিনের কথা কি বলছ? আমি একদিনও গোপালকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। গোপাল গোচারণে গেলে আমি সারাদিন তার আসা পথ চেয়ে বসে থাকি।

—যশোদা, তোমার ব্যথা আমি বুঝি। কিন্তু কী করবো বল, আমি নিরুপায়। রাজাদেশ লঙ্ঘন করার শক্তি আমার নেই। রাজা রথ পাঠিয়েছেন কানাই বলাইকে নিতে, এখন আমি কী করে বলি যে ওরা যাবে না।

—তুমি কী বলবে না বলবে তা আমি জানি না, আমি গোপালকে কিছুতেই মথুরায় পাঠাবো না-না-না।

—পাগলামি কর না, কংসকে তো জান, সে কিরকম নৃশংস! তাঁর আদেশ অবহেলা করলে আমাকেও সাজা পেতে হবে। ভগ্নী, ভগ্নীপতিকে (দেবকী বসুদেব) যে বিনা দোষে কারাগারে বন্দী করে রাখে, নিজের পিতাকে (উগ্রসেন) কারারুদ্ধ করে যে দুরাচার রাজ সিংহাসনে বসে রাজ্য ভোগ করছে তার আদেশ লঙ্ঘন করলে সে কি আমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছ? সে যেরকম নিষ্ঠুর স্বভাবের, তাতে তাঁর পক্ষে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াও অসম্ভব নয়।

—'আমি কি করে গোপালকে ছেড়ে থাকবো? ওই তো আমার একমাত্র আধার। ও নয়নের আড়ালে চলে গেলে আমি কি নিয়ে বাঁচব বল? আমি খাইয়ে না দিলে যে নিজে খেতে পারে না, খাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে না দিলে যে নিজে ধুতে পারে না সেই নীলমণিকে আমার মথুরায় কে দেখবে বল? সেখানে কে তাঁকে ঘুম-পাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে?'

—গোপালের খাওয়া-শোয়া নিয়ে তুমি ভেব না। মথুরায় গিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। সন্ধ্যা হয়ে এল, তুমি অক্রূরের জন্য ভোজনের আয়োজন কর। আমিও হাত-পা ধুয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা সেরে নিই।

নন্দ মহারাজ সন্ধ্যা বন্দনার জন্য হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন।

রাত্রিতে ভোজনপর্ব সমাধা হলে, অক্রূরের শয়নের ব্যবস্থা করে নন্দ মহারাজ-যশোদা গোপালকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। রোহিণীমাও আপন কক্ষে পুত্র বলরামকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। যশোদা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম নেই গোপাল জননীর চোখে। তিনি গোপালকে ঘুম পাড়িয়ে—বাইরের প্রাঙ্গণে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সবাই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলেও—যিনি অহোরাত্র নিদ্রাহীন হয়ে পিপীলিকার পদ শব্দটি পর্যন্ত শুনতে পান—তাঁর কাছে যশোদার মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির বিলাপ তরঙ্গ পৌঁছাতে দেরী হল না। সহসা কপট ঘুম ভেঙ্গে গেল গোপালের। করুণায় ছলছল পদ্ম আঁখি দুটি মেলে দেখলেন—মা বিছানায় নেই। ক্রন্দন ধ্বনি লক্ষ্য করে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মায়ের পাশটিতে গিয়ে বসল। যুক্ত কর কমলের নিবিড় আবেষ্টনে মায়ের কণ্ঠ নিজের গণ্ডদেশে স্থাপন করে বলল,—''মা তুমি কাঁদছ কেন?' কিশলয় করপল্লবের মৃদুল স্পর্শ দিয়ে মুছে দিল মায়ের অশ্রু। অনন্তর মায়ের নাকে নিজের নাক ঘর্ষণ করতে করতে বলল,—'মা তুমি কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি যে দুঃখ পাই, স্থির থাকতে পারি না।''

অশ্রু সংবরণ করে গোপালকে বুকে চেপে ধরে যশোদা বললেন, 'তোর বাবার কাছে শুনলাম, তুই কাল মথুরা যাবি। কাল থেকে আমাকে মা বলে কে ডাকবে রে গোপাল? কে পান করবে আমার বুকের দুধ! (গোপাল বড় বয়স পর্যন্ত যশোদার বুকের দুধ পান করতেন) ননী খেয়ে ভাঁড় ভেঙে কে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবে। রাতে কে আমার কাছে শুয়ে গায়ে পা চাপিয়ে গলা ধরে বলবে—''মা, গল্পো বলো''....কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মা যশোদা।

মায়ের চোখের জল মুছতে মুছতে গোপাল বলল, 'তুমি যদি কষ্ট পাও, তাহলে আমি যাব না মা।'

—না বাবা, যেতে তোকে হবে। রাজা তোদের নিতে রথ পাঠিয়েছেন, না গেলে তোদের পিতাকে হয়তো কঠোর দণ্ড দেবেন।

—তুমি চিন্তা কর না মা, বরং বাবাকে বলে দাও, বাবা যেন আমাকে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। আমি অবশ্যই ফিরে আসবো তোমার কাছে। তুমি একদম মন খারাপ কর না।

গোপাল কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলল না, কবে ফিরে আসবে। গোপালের আশ্বাসন পেয়ে মা যশোদাও নির্দিষ্ট দিনের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন। পুত্র ফিরে আসবে শুনেই যশোদার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাই তিনি পুত্রকে বললেন,—'চল বাবা অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়বি চল। মাতা ও পুত্র উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে এক শয্যায় শুয়ে পড়লেন। গোপাল যশোদার বুকের উপর শুয়ে শুয়ে দুধপান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। যশোদা ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখলেন,—বসুদেব-দেবকী কংসের কারাকক্ষে বসে বসে এগার বৎসর ধরে তপস্যা করছেন। এখন গোপাল যদি ওখানে না যায়—তাহলে উভয়ের (বসুদেব-দেবকী) প্রাণ বিয়োগ হবে। ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হয়। প্রাতঃকালীন মঙ্গলাস্নান সমাপনান্তে মা যশোদা গোপালকে নিয়ে সাজাতে বসলেন। মনোহর বেশে লীলা-নটবরকে সজ্জিত করে জননী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রাণ গোপাল, বাপ আমার, তোর মোহন রূপ আবার কবে দেখব রে!' যশোদার মন আজ উথাল-পাথাল করছে। তীব্র বেদনা বুকে চেপে গোপালের জন্য নিজ হাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে গোপালকে খাইয়ে দিলেন। প্রাঙ্গণে রথ নিয়ে অক্রূর প্রস্তুত। রাধিকা সহ সমস্ত ব্রজগোপী ও গোপগণ নন্দ মহারাজের গৃহপ্রাঙ্গণে বেদনাতুর হৃদয় নিয়ে সমবেত হয়েছেন। শ্রীরাধিকাজী সাধারণ সাজে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন। বৃন্দাবনে শ্যাম এর সঙ্গে তাঁর ছিল নিত্য সংযোগ। আজ বিয়োগ পরিস্থিতির উদয় হতেই তিনি লোকলজ্জা পরিত্যাগ করে সর্বসমক্ষে আত্মবিস্মৃতা হয়ে শ্যামসুন্দরকে বললেন—'হে প্রিয়তম, প্রাণবল্লভ, রাধিকার হৃদস্পন্দন, নয়নের আলো—আমাকে ত্যাগ করে ব্রজ ছেড়ে যেও না। তুমি চলে গেলে বৃন্দাবনে চির-অমাবস্যার আবির্ভাব হবে।' ললিতা, বিশাখাদি ও অন্যান্য গোপীরা অক্রূরকে ঘিরে ধরলেন।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাঁকে বললেন,—'কেন এসেছ রথ নিয়ে বৃন্দাবনে? তোমার নাম কে অক্রূর রেখেছে—তুমি ক্রূর ভী-ষ-ণ ক্রূর। তোমার হৃদয়ে এতটুকু দয়া-মমতা নেই আমাদের সবাইকে চিরতরে কান্নার সাগরে ডুবিয়ে মেরে ফেলার জন্য তুমি কি শ্যামকে নিতে এসেছে? যদি তোমার ঘরের কাজের জন্য কোন দাসীর প্রয়োজন হয়, তবে আজ্ঞা কর, আমরা সব গোপীরা তোমার ঘরে গিয়ে কাজ করে দেব—কিন্তু শ্যামকে নিয়ে গিয়ে তুমি আমাদের প্রাণ কেড়ে নিও না। অক্রূরজী, তুমি জান না শ্যাম বিহনে বৃন্দাবন শ্মশান হয়ে যাবে। যদি দরকার হয় বলরামকে নিয়ে যাও, শ্যামকে রেখে যাও। মথুরায় পড়ালেখা নারীদের সেবা পেলে শ্যাম আমাদের ভুলে যাবে। শুনেছি মথুরার রমণীরা খুব চতুর। আমরা মূর্খ গোপকন্যা। ওখানে গেলে শ্যাম কি আমাদের মতো লেখাপড়া না জানা রমণীদের মনে রাখবে?'

অক্রূরজী ভেবে পান না, গোপীদের কী বলে সান্ত্বনা দেবেন। রাধিকাজি প্রায় অচৈতন্য হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন—তাঁর নয়ন স্থির পলকহীন। শ্রী রাধাকে ঐ অবস্থায় দেখে কৃষ্ণ তাঁর কাছে গিয়ে কানে মুখ রেখে নীচু স্বরে বলল, 'প্রাণময়ী প্রিয়ে, তুমি ভুলে যেও না—তুমি কে? তুমি-আমি অভিন্ন। আমিই তুমি, তুমিই আমি। আমিই আমাকে আস্বাদন করবো বলে তুমি হয়েছি। অষ্ট সখী হয়েছি। গোঠের সখা হয়েছি। বৃন্দাবনের সবই আমি-তুমি মিলে মিশে হয়েছি। আমারাই লীলার জন্য জগৎ হয়েছি—জীব হয়েছি। আমি-তুমি এক ও অভিন্ন ছাড়া কোথাও দ্বিতীয় বলে কিছু নেই। তোমাকে ছেড়ে যাব কোথা? তুমি যে আমার আনন্দ স্বরূপ আত্মা। যে কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি, সেই কাজ সম্পন্ন করতে মথুরায় যাচ্ছি। এতদিন তোমার সঙ্গে প্রেমে নৃত্য করেছি—খেলা করেছি, এবার জগতকে নৃত্য করাতে চললাম। তুমি আমার সচ্চিদানন্দ রূপিণী পরমাপ্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তি, তুমি আমি দুজনে মিলে এই লীলাজগৎ রচনা করেছি। আমার লীলা শ্রবণে, কীর্ত্তনে সাধক জীব আমাকে প্রাপ্ত হয়ে পরমধামে উপনীত হবে—তাই আমার এ লীলা অভিনয়। উঠ প্রিয়ে, শোক পরিহার কর।' রাধিকাজী শ্যামসুন্দরের শ্রীকর ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—''হে প্রিয়তম, তোমরা বিরহে কী করে থাকবো?''

—রাধে, তোমার বিরহ বেদনা, অনেক বিরহীর বিরহ জ্বালা উপশম করবে।

—বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে আর কি কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

—প্রিয়তমা, প্রকাশ্য ব্রজলীলার এখানেই অবসান। তবে অপ্রকাশ ব্রজলীলা নিত্য চলছে, চলবেও। কুরুক্ষেত্রে একবার দেখা হবে। প্রভাসের কাছে সরস্বতী নদীর তীরে সিদ্ধপুর আশ্রমে একবার সাক্ষাত হবে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় আরও একবার তুমি আসবে—আমার হৃদয়ে থেকে গীতা অমৃত বলার জন্য। একদিকে আমার হৃদয়ে থেকে আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তুমি যখন গীতা বলবে, তখন অন্যদিকে সবার অন্তরালে থেকে তোমার সখীদের নিয়ে সেই গীতা তুমি কর্ণপথে পান করবে। তারপর নরলীলার অবসানে দেখা হবে গোলকে।''

রাধারাণী শ্যামসুন্দরের শ্রীপদে মাথা রেখে বললেন—''তোমার অসীম অমৃত লীলাসিন্ধু বুকে অনন্ত আনন্দ হিল্লোল আমি, তোমাকে আনন্দ দিতে প্রসন্ন চিত্তে বেদনার ভার বয়ে যাব স্বামী।''

শ্রীরাধিকাজী শান্ত হলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ললিতা-বিশাখাদির দিকে চেয়ে বলল,—'হে আমার প্রিয় সহচরীগণ, আমি মথুরায় যাচ্ছি, কিন্তু আমার প্রাণ রেখে যাচ্ছি তোমাদের হৃদয়ের সুরক্ষিত প্রহরায়। আমার যাত্রাপথ তোমরা এইভাবে কান্নায় ভিজিয়ে দিও না। জগত কল্যাণকারী আমার এই যাত্রাপথ তোমাদের কান্নার জলে সিক্ত হলে নানা অশুভ-বাধা-বিঘ্ন দেখা দেবে। কাজ শেষ হলে আমি আবার তোমাদের মাঝে ফিরে আসবো। আমার বাঁশী রাধার কাছে রেখে গেলাম। সে যখনই বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে আমাকে ডাকবে—আমি তখনই হাজির হব।''

কৃষ্ণের কথায় গোপীদের ক্রন্দন বন্ধ হল। অনন্তর কৃষ্ণ অক্রূরজীকে বলল,—'আমার ব্রজবাসীরা বড়ই সাধাসিধে—সরলপ্রাণ। এরা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ রথে আরোহণ করা সম্ভব হবে না। বলতে বলতে কৃষ্ণ-বলরাম নন্দবাবার সঙ্গে রথে উঠে বসল। রথ চলতে থাকে। গোপ গোপীরাও রথের পিছু পিছু চলতে

থাকেন। রথ একটু দ্রুতগামী হতেই যশোদা রথের পিছু পিছু ছুটতে আরম্ভ করলেন। গোপাল মাকে রথের পিছু পিছু ছুটতে দেখে রথ থামাতে বলল। রথ থামতে যশোদা গোপালকে অপলক নেত্রে দর্শন করতে করতে আরতি করলেন। বললেন 'বাবা, যেখানেই থাকিস, সুখে থাকিস। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিস। আর শোন, যাওয়ার আগে তোকে একটা কথা বলি।'

'কি কথা মা?' গোপাল জিজ্ঞাসা করল।

—'তুই আমাকে মা বলিস, আমিও তোকে বেটা বলি, কিন্তু আমি জানি তুই আমার পুত্র নোস। তুই দেবকীর পুত্র। আমি তোর পালক মাতা। তোর লালন পালনের জন্য এক সামান্য দাসীমাত্র।'

—'মা! তুমি একি বলছ। লোকে যা বলছে বলুক, আমি সারা জগৎকে বলে যাবো, আমি যশোদার বেটা —আদরের দুলাল।'

—উদুখলের সঙ্গে আমি তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলাম, মথুরায় গিয়ে একথা যেন ভুলে যাস, বাবা।

—মা, আমি সব ভুলতে পারি, কিন্তু তোমার স্নেহ রজ্জুর বন্ধনের কথা কখনও ভুলবো না। যে বাঁধনে তুমি আমাকে বেঁধেছিলে মা, ওটা আমার অলংকার। তা-কি কখনও ভুলতে পারি?'

—আমাকে মনে রাখবি তো? আবার মা বলে কাছে আসবি তো বাবা?

—অবশ্যই আসবো মা, তুমি, তোমার শরীরের দিকে নজর রেখ। আর আমার গাভীদের যত্ন নিও।

—যেখানেই থাকিস, সুখে থাকিস, বেটা—এই আমার আশীর্ব্বাদ।

ধীরে ধীরে রথ চলতে শুরু করল। নির্নিমেষ নয়নে ব্রজবাসী চেয়ে থাকে রথপানে। রথ ধীরে ধীরে ব্রজবাসীদের নয়নের সম্মুখে ধূলিময় মেঘমণ্ডল রচনা করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সকলের হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়—শ্যাম ফিরে এসো—ফিরে এসো শ্যাম!

বিচিত্র বরদান

নীল যমুনার তটস্থিত প্রান্তরে নব তৃণ দেখে গাভীর দল মনের সুখে বিচরণ করতে থাকে। গাভীদের মনের সুখে বিচরণ করতে দেখে সখারা কানাইকে বলল, 'কানু, আজ আমরা তোকে নিয়ে পূজা পূজা খেলা করব।' কানু বলল,—'সেটা আবার কী খেলা রে?'

—'আমরা সবাই মিলে আজ তোকে কদম গাছের নীচে মাটির বেদিতে বসিয়ে ফুলপাতা মালা দিয়ে সাজাব—তারপর বন থেকে ফল এনে পাতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে তোকে ভোগ অর্পণ করব। শিঙ্গা বাজিয়ে শঙ্খধ্বনি করে তোকে আরতি করব। আমাদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তুই আমাদের বর দিবি। খুব মজা হবে। তাই না?''

—'সে তোদের যা ইচ্ছা হয় কর। তবে পূজার মন্ত্রগুলো যেন ঠিক ঠাক উচ্চারণ করিস।'

—'ও নিয়ে তুই ভাবিস না কানু, শাণ্ডিল্য মুনির মুখে পূজার মন্ত্র শুনে শুনে, আমাদের সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন চল তুই কদমতলার বেদিটায় গিয়ে বসবি চল।'

সখাদের অনুরোধে কানু কদমতলার নীচে মাটির বেদিতে বসল। বন থেকে ফল-ফুল-পাতা চয়ন করে আনে সখারা। দোনায় করে যমুনা থেকে জলও নিয়ে এল। (পাতার তৈরি ঠোঙাকে দোনা বলে।)। তারপর ফুল দিয়ে মালা তৈরি করে কানুর গলায়-হাতে পায়ে পরিয়ে দেওয়া হল। পাতার তৈরি মুকুটও কানাইয়ের মাথায় পরিয়ে দিয়ে বনফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে বলরামকে প্রধান পৌরহিত্য পদে বরণ করে সকলে পূজায় বসল।

বনফুলের মালা, পাতার তৈরি মুকুট পরিধান করে কানু চুপটি করে বসে আছে বেদিতে। বলরামের পৌরহিত্যে সমবেত কণ্ঠে পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হয়—''ওম এতে গন্ধে পুষ্পে রাখাল দেবায় নমঃ। ওম ইদং আচমনীয়, যমুনোদকং গোপালায় স্বাহাঃ। ওম এতৎ ফলং নৈবেদ্যং—গোপকুমারায় গোপালায় স্বাহাঃ।'' অতঃপর শিঙ্গা বাজিয়ে ভগ্ন তরু শাখাকে চামরের ন্যায় দোলাতে দোলাতে আরতি শুরু হয়। আরতির শেষে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম করল সকলে।

কানু খুশী হয়ে বলল, ''বৎস গোপবালকগণ, তোমাদের পূজায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তোমরা বর প্রার্থনা কর।'' সখারা পড়লো মুশকিলে কী বর যে নেবে তা ভেবে পায় না। বলরামও কিছু বলে না। সবাইকে চুপ দেখে মধুমঙ্গল বলল—'হে বিশ্বরাখাল কুলাধিপতি, তস্কর শিরোমণি, নাবালক চপল দেব, আপনি আমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে মোদক ও পাক্কান্নের ব্যবস্থা করুন। আমরা পূজাজনিত শ্রমে ক্ষুধায় বড়ই কাতর। বড়ই খুশী হব যদি ভোজনান্তে এই ব্রাহ্মণকুল গৌরব, আপনার প্রিয় বয়স্য মধুমঙ্গলকে, কিঞ্চিৎ সুস্বাদু সুপক্ক অখণ্ড-অভঙ্গ বনফল দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন।'

মধুমঙ্গলের বলার ভঙ্গীতে সখাগণ সহ কানাই হাসিতে ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মধুমঙ্গল পুনরায় বলে ওঠল, 'পূজা বিগ্রহ-এর হাসতে মানা।'

—'বিগ্রহ, পূজায় প্রসন্ন হয়ে জাগ্রত হলে, হাসিতে দোষ হয় না।' কানাইও উত্তর দেয়। ইতিমধ্যে যশোদা মাতা, সেবিকা নন্দিনী ও মুখরাকে দিয়ে প্রচুর পাক্কান্ন ও মোদক মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য গোচারণ ভূমিতে প্রেরণ করেন। তাকে আসতে দেখে মধুমঙ্গল সহাস্যে বলল,—'মনে হচ্ছে জাগ্রত বিগ্রহ, ভক্ত মনোবাসনা পূরণে কালক্ষেপ করেননি। আসুন, কালবিলম্ব না করে আমরা সকলে দেবতার বর প্রসাদ গ্রহণে সযত্ন মনোনিবেশ করি।'

যমুনার তটে ভোজনে বসল সখাগণ সহ নন্দনন্দন। ভোজন প্রায় শেষ হব হব এমন সময় বৃন্দাবনের গভীর অরণ্য থেকে দলে দলে সাধু-সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন—নন্দনন্দন শেষ গ্রাসটি হাতে নিয়ে সবে মুখের কাছে এনেছেন অমনি তাঁরা (সাধু-সন্ন্যাসীরা) সমস্বরে বলে উঠলেন—''আমরা কি প্রসাদ পাব না?' শেষ গ্রাসটি গ্রহণ না করে হাতে নিয়ে আসন ছেড়ে উঠে এসে সমবেত সাধু-সন্ন্যাসীদের তিলতিল পরিমাণে বিতরণ করলেন শ্রীগোপাল সুন্দর। গোপালকৃষ্ণের কাছে তিল পরিমাণ প্রসাদ পেয়ে সকলেই তৃপ্ত ও খুশী হলেন। নন্দকিশোরকে বনফুলের মালা ও পত্রমুকুটে অপরূপ দেখাচ্ছিল। সেরূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলেন আগত সাধুসন্ন্যাসীর দল। শ্যামসুন্দর তাঁদের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে বলল, 'আপনাদের কি কোন প্রার্থনা আছে?'

—তারা বললেন, 'হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করালে যে দক্ষিণা দিতে হয়, তা কি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন?

—'হে আমার আত্মস্বরূপ ভক্তগণ ভোজনান্তে সাধু-সন্ন্যাসীদের যে দক্ষিণা দিতে হয় তা আমি জানি, কিন্তু বনপ্রদেশে আমি কপর্দক শূন্য অবস্থায় গোচারণ করি—এখানে আমি আপনাদের অভিলাষ পূরণ করব কেমন করে?'

—হে আপ্তকাম, আপনার সংকল্পমাত্রেই সকল ইচ্ছারপূরণ হয়। আমরা জানি আপনার অমিত প্রভাব। গোপবালকের বেশে কপর্দক শূন্য অবস্থায় বনে বিচরণ করলেও—আপনার সর্ব সামর্থ্য শক্তি সদা বিদ্যমান। আপনার অদেয় কিছু নেই। তাছাড়া আমাদের কাম্য দক্ষিণাও বিশেষ মূল্যবান নয়।

—'বেশ, তাহলে বলুন, কী দক্ষিণা আপনারা আমার কাছে প্রত্যাশা করেন?'

—'আপনি আমাদের দক্ষিণা স্বরূপ এই বর প্রদান করুন—'আমরা যেন আপনার পাদস্পর্শ ও লীলাধন্য বৃন্দাবনে তরুলতায় পরিণত হই।' কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করল,—'আপনারা দুর্লভ মনুষ্য শরীর পেয়ে তা ত্যাগ করে তরু-লতা হতে চাইছেন কেন?'

—'মনুষ্য শরীরে থেকে যাতে পদব্রজে কখনও বৃন্দাবনের বাইরে যেতে না পারি, সেজন্য আমরা তরু-লতা হয়ে আপনার লীলাস্থলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে চাইছি। আমরা ব্রজভূমির বাইরে যাব এই অজ্ঞান যেন আমাদের কখনও না হয়—আমরা তরু-লতা হয়ে এখানেই থাকতে চাই। বৃন্দাবনের তরুলতা হয়ে থাকলে আপনার বিরহ কখনও আমাদের সহ্য করতে হবে না। আপনি ক্রীড়া করতে করতে বা গোচারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেবেন। আমরা আপনাকে পূজার জন্য ফল-ফুল অর্পণ করি বা না করি—আপনি নিজ হাতে আমাদের শাখা থেকে ফল-ফুল চয়ন করে নেবেন। এতেই আমাদের সুখ ও শান্তি। তরুলতা হয়ে থাকলে আমাদের কোন নরকের ভয় থাকবে না—দুঃখ-মোহও হবে না। আপনি আমাদের দক্ষিণা স্বরূপ এই বর প্রদানে স্বীকৃত হন।'

নন্দনন্দন বললেন,—তথাস্তু।'

—